# শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা

সাবিনা ইয়াসমিন
পিএইচ. ডি. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

GIFT

521561

Dhaka University Library
521561

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
সেপ্টেম্বর ২০২০

# শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা

সাবিনা ইয়াসমিন
পিএইচ. ডি. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

.. 521561

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

**গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক**
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

## প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া যাচ্ছে যে, 'শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণার ফল। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ আমি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো উপাধিলাভ বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করিনি।

২৫.০২.২০২০

(সাবিনা ইয়াসমিন)
পিএইচ. ডি. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
নিবন্ধন নম্বর : ০৩/২০১৬-১৭

521561

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

## প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া যাচ্ছে যে, সাবিনা ইয়াসমিন রচিত 'শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে গবেষক এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো উপাধিলাভ বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করেননি।

(বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ২৪.০২.২০২০
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

# শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা

**সূচিপত্র**

ভূমিকা ॥

অবতরণিকা ॥ ৮

প্রথম অধ্যায় : বাংলা কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা ॥ ৯-৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : শামসুর রাহমানের মানসগঠন ও জীবনদর্শন ॥ ৪০-৬৮

তৃতীয় অধ্যায় : শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা ॥ ৬৯-১৪৮

চতুর্থ অধ্যায় : শামসুর রাহমানের কবিতায় পুরাণচেতনা ॥ ১৪৯-২৩২

উপসংহার ॥ ২৩৩-২৩৬

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ২৩৭-২৪১

# ভূমিকা

*শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা এবং পুরাণচেতনা* শীর্ষক রচনাটি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ। গবেষণাকর্মটির তত্ত্বাবধান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যলয়-কর্তৃপক্ষের প্রদানকৃত শিক্ষাছুটির পরিপ্রেক্ষিতে আমি ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস মোট তিন বছরে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হই।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার পেছনে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। তিনি গবেষণা-অভিসন্দর্ভটির রূপরেখা-প্রণয়ন, বিষয় মূল্যায়ন ও সংশোধন থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন, সেইসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বই ব্যবহার করতে দিয়ে তিনি আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার পেছনে প্রয়োজনীয় সাহায্য, পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. শহীদ ইকবাল এবং প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান খান। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কর্মরত আমার সহকর্মীবৃন্দের প্রত্যেকে নানা সময়ে নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যকলা বিভাগের কামালউদ্দিন কবির স্যারের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, তিনি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হাসান মফিজুর রহমান, তানভীর আহমেদ, সাঈদা নাসরিন আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে, ব্যক্তিগত বই-পুস্তক ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. সাইফুজ্জামানের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান এবং দেশ ও দেশের বাইরে থেকে বই সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানোর জন্য তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া আরও অনেক বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সহযোগিতায় আমার অভিসন্দর্ভটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেছে, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গণ-গ্রন্থাগার এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি গবেষণার প্রয়োজনে। এ সূত্রে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার সময় আমি বেশির ভাগ বই ব্যহার করেছি ড. কাজল রশীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে, ফলে বাইরের গ্রন্থাগার থেকে বই সংগ্রহের কষ্ট কমে গেছে, এজন্য তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

একদিকে গবেষণা, অন্যদিকে সংসার, দুহাতে দুই অসি নিয়ে চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে ভারসাম্য হারিয়েছি, শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থার মধ্যে পড়ে বিপন্ন বোধ করেছি, তৈরি হয়েছে হতাশা ও অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার প্রভাব কিছুটা হলেও গবেষণাকর্মের ওপর পড়েছে। সবশেষে বলতে চাই আমার শিশুকন্যার কথা—সিন্ধু অপ্রতিম, গবেষণাকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাকে সময় দিতে পারিনি, প্রাপ্য স্নেহ থেকে বঞ্চিত করার জন্য আমি তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

**সাবিনা ইয়াসমিন**

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

# অবতরণিকা

দেশবিভাগ-পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যধারায় শামসুর রাহমান নির্মাণকালের কবি। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের অস্থির কালপর্বের ভেতরে তাঁর কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ। রোমান্টিকতা থেকে বাস্তবতায় উত্তীর্ণ হয়ে সমকাল ও স্বদেশের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন এমন এক কাব্যজগৎ, যার পরিধি ব্যাপক। তাঁর কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিক নির্মাণে ক্রিয়াশীল থেকেছে স্বদেশ ও পুরাণের নানা অনুষঙ্গ। বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রবহমান স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনার স্বরূপ অন্বেষণ।

*শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 'বাংলা কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা' শিরোনামের অধ্যায়টিতে বাংলা কাব্যধারায় স্বদেশ ও পুরাণচর্চার ধারাবাহিকতা আলোচনাপূর্বক এ ধারায় শামসুর রাহমানের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'শামসুর রাহমানের মানসগঠন ও জীবনদর্শন'। এ অধ্যায়ে শামসুর রাহমানের জন্ম ও বেড়ে ওঠার কালে যেসব উদ্দীপক তাঁর কবিমানস গঠনে ভূমিকা রেখেছে তার আলোচনা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। তাঁর কবিচৈতন্যকে শাণিতকরণের ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে, সে-বিষয়ে আলোচনাও এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে শামসুর রাহমানের মূল কবিতার আলোচনা দিয়ে, অধ্যায়টির শিরোনাম 'শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা'। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক ঘটনাধারা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শামসুর রাহমানের বস্তুবাদী চেতনার আত্মপ্রকাশ এবং সেই সূত্রে কবিতায় স্বদেশভাবনার সঙ্গে সন্নিবদ্ধ হওয়ার যে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা, এ অধ্যায়ে সে-বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'শামসুর রাহমানের কবিতায় পুরাণচেতনা'। শামসুর রাহমানের পৌরাণিক অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি, কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকগত সৌন্দর্যবর্ধনে কীভাবে পুরাণ নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে, এ অধ্যায়ের কবিতা-বিশ্লেষণে সে-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শামসুর রাহমানের কবিপ্রতিভার সার্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা থেকে রচিত হয়েছে 'উপসংহার'।

## প্রথম অধ্যায়

# বাংলা কবিতায় স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা

স্বদেশ ও পুরাণ—বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত দু'টি প্রত্যয়, তুলনামূলক বিচারে স্বদেশ প্রত্যয়টি নতুন। বহুপূর্ব থেকে প্রবহমান পুরাণস্রোত বাংলা সাহিত্যের শরীরে মিশে গিয়েছিল নিবিড় আন্তরিকতায়। সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা কাব্যের প্রতি পর্বের অন্তরাত্মায় পুরাণ সম্পৃক্ত হয়েছে নানা মাত্রায়; অন্যদিকে চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা কাব্যে স্বদেশচেতনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের পরিসীমায়, সেই ভৌগোলিক বৃত্তের পারিপার্শ্বিকতায় লালিত হয় তার চৈতন্য; স্বদেশ নামক প্রত্যয়টির বস্তুগত ভিত্তি এবং সাকার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও স্বদেশকে সচেতনভাবে মাতৃভূমি হিসেবে স্বীকার করে নেবার প্রবণতা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে ছিল না, সে-সময়ের গণমানুষের চেতনাতেও এ ধারণার বিকাশ ঘটেনি, কাব্যে স্বদেশভাবনার বিকাশ আধুনিক যুগের ঘটনা। প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার, স্বদেশভাবনা-তাড়িত কবি আসলে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন? স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ভাষা-সংস্কৃতি, ভূ-প্রকৃতি এবং জাতিগত ঐক্যচেতনার ওপর নির্ভর করে স্বদেশভাবনার বিনির্মাণ। রাষ্ট্রের চারিত্র্য পরাধীন হলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে স্বদেশভাবনামূলক কবিতার মৌল অংশ, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি দলিত-দমিত হলে তারও প্রতিকার প্রত্যাশা করে ভাষা-সংস্কৃতি সচেতন কবির কলম। কবি সয়ম্ভূ নন, কোন একটি বিশেষ ভূগোল-প্রেক্ষাপটে, কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পারিপার্শ্বিকতায় লালিত হয় কবির সত্তা, সেই ভূখণ্ডের ভূ-প্রকৃতি এবং জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন, সামাজিক আচার-প্রথা কবির মানসগঠনে রাখে প্রভাবসঞ্চারী ভূমিকা, ফলে কবি মনোজাগতিকভাবে তাঁর পারিপার্শ্বিকের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন নানা সূত্রে, কবিতায় ঘটে তার প্রতিফলন। স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে তাত্ত্বিক অপরিচয় থাকা সত্ত্বেও কবির চেতনায় স্বদেশভাবনার কোন-না-কোন মৌল বৈশিষ্ট্য কবিতাকারে প্রকাশ পেতে পারে সহজাত প্রবণতার বশে। অন্যদিকে মানুষের স্মৃতি-সত্তা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিজড়িত পুরাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবেশ করে কবিচৈতন্যে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে পুরাণ-ব্যবহারের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পুরাণ তখন ছিল তত্ত্ব ও আদর্শের বাণীবাহক মাত্র, আধুনিক যুগের কবির হাতে পুরাণের নতুন করে উদবোধন ঘটেছিল, যেখানে পুরাণ তার অর্থ ও তাৎপর্যের

সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবন ও মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতার উন্মেষপর্বে স্বদেশ এবং পুরাণ ছিল একে অপরের পরিপূরক, যাঁর হাতে এই অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়, তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের পুরোধা-পুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বদেশ নামক প্রত্যয়টিকে কবিতায় সচেতন ও প্রত্যক্ষভাবে প্রথম উপস্থাপনের কৃতিত্ব তাঁর। 'জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে'—এমন প্রত্যক্ষ দেশপ্রেমের উচ্চারণের অস্তিত্ব বাংলা কবিতার পূর্ব-ধারায় কোথাও ছিল না, তাঁর উচ্চারণের পটভূমিটি ছিল একান্তভাবে পৌরাণিক। স্বদেশভাবনা যেহেতু মানুষের সহজাত প্রবণতার অংশ, এ কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতার ভেতরে স্বদেশভাবনার লক্ষণ খণ্ডিত আকারে হলেও প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত *চর্যাপদ* বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের সাধনকথা, যেখানে সহজাত প্রবণতার সূত্রে উঠে আসে তৎকালীন সমাজ, সময় এবং ভূ-প্রকৃতির খণ্ডচিত্র। কিন্তু চর্যাপদের এই প্রবণতা পদকর্তাদের সচেতন কোন ভাবনার প্রতিফলন নয়, রূপক-সংকেত-আশ্রিত চর্যার পদগুলো ধর্মীয় আদর্শ, অনুশাসন এবং সাধনতত্ত্বের মূলাধার, পদগুলোকে যথার্থ রূপদানের নিমিত্তে এখানে চিত্রিত হয়েছে নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, জনজীবন, পেশা-প্রবৃত্তির নানা রূপ, যা স্বদেশভাবনার লক্ষণাক্রান্ত।

সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতির প্রভাবে আর্যসংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের কাব্যভাণ্ডার। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের বিষয় নির্মাণে ছিল পুরাণ-নির্ভরতা, এ কাব্যটি একাধারে মধ্যযুগের আদি রচনা এবং রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বাংলা কাব্যের প্রথম নিদর্শন। *ভাগবত* পুরাণ, জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* এবং লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানের প্রভাব—এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* নির্মাণ, এর মধ্যে লোকসমাজে প্রচলিত আখ্যানের প্রভাব বড়ু চণ্ডীদাসের ওপরে ছিল সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। পুরাণের লক্ষ্মী ও তার স্বামী বিষ্ণু পৃথিবীতে যথাক্রমে রাধা এবং কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্যান্য আখ্যানের মতো পৃথিবীতে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জন্ম না নিয়ে কৃষ্ণ হলেন রাখাল বালক আর রাধা হলেন পরস্ত্রী, তাদের প্রেমে পৌরাণিক ভক্তি-ব্যাকুলতার পরিবর্তে মানবীয় প্রেমের পার্থিব বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হতে দেখা যায়। বড়ু চণ্ডীদাস এবং তাঁর *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্য নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের সমন্বয়ে নির্মিত এ কাব্যের ঐতিহাসিক এবং কাব্যিক মূল্য অপরিসীম। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারা কীর্তন, পাঁচালি, অনুবাদ, প্রণয়োপাখ্যান অবলম্বনে সুবিশাল সময়-পরিসরে বিকশিত। এ যুগের কাব্যপ্রবণতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার অস্তিত্ব ছিল না, তবে ধর্মীয় অর্থে জাতিগত ঐক্যচেতনার অস্তিত্ব ছিল, মঙ্গল কাব্যগুলো সেই প্রেক্ষাপটে আর্য-অনার্য ধর্মীয় আদর্শবাদের বিমিশ্রণে নির্মিত।

দেশবিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায় যে ভাষা-বিতর্ক তৈরি হয় তার পরিণতি অভূতপূর্ব হলেও মাতৃভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে। আবদুল হাকিমের কবিতায় প্রকাশিত স্বভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আত্মিক টান অনেকটা আকস্মিক এবং খণ্ডিত, মধ্যযুগের অনগ্রসর কালপর্বে বসবাস করেও তাঁর কবিচৈতন্যে সঞ্চিত এই সচেতনতা বিস্ময় জাগায়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ বহুভাষা-অধ্যুষিত একটি রাষ্ট্র, এরকম একটি রাষ্ট্রের মাতৃভাষা কী হবে সেই প্রশ্নে রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষায় শিল্প-সাহিত্য চর্চার অনুকূলে স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে, আবদুল হাকিমের 'বঙ্গভাষা' কবিতায় পাওয়া যায় সেই সংবাদ। মাতৃভাষাকে অস্বীকার করলে মূলত ব্যক্তিমানুষের আত্মপরিচয় সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে, এজন্যই কবি মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এবং বিপক্ষে অবস্থানকারীদের জন্মকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাঁর এই ভাবনা *চর্যাপদের* পদকর্তাদের ভাবনার মতো নিষ্ক্রিয় নয়, বরং ভাষা-সংস্কৃতির স্বকীয়তা রক্ষায় অনেকটাই সক্রিয় এবং সংক্ষুব্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতায় প্রতিফলিত এসব বিচ্ছিন্ন ভাবনার ভেতরেই প্রস্তুত হয়েছিল আধুনিক কালের স্বদেশভাবনার প্রত্নবীজ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতায় স্বদেশভাবনার লক্ষণসমূহের প্রকাশ বিচ্ছিন্ন এবং আকস্মিক হলেও পুরাণ নিরবিচ্ছিন্নরূপে বাংলা কবিতার সঙ্গে হাজার বছরের পথ অতিক্রম করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কালপরিসরে বাসরত মানুষের জীবন ছিল ধর্মনির্ভর, ফলে তাদের কাব্যসাধনার ভেতরে অনায়াসে প্রবেশ করে পৌরাণিক ঘটনাধারা। এ সময় *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* ছাড়াও রাধা-কৃষ্ণকে উপজীব্য করে বাংলা কাব্যধারায় বিকশিত হয়েছিল পদাবলী সাহিত্য; *ভাগবত* পুরাণ ও জয়দেবের *গীতগোবিন্দের* প্রভাব এ কাব্যধারার ওপরেও ক্রিয়াশীল ছিল। মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি এবং বাঙালি কবি চণ্ডীদাস মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্যের দুই মানিকজোড়। এছাড়া মধ্যযুগে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক অনুবাদ-কর্ম সম্পন্ন হয় যার অধিকাংশ ছিল ধর্মগ্রন্থ, এর ভেতর দিয়ে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য যাত্রা শুরু করে। এ সময় পৌরাণিক গ্রন্থ অনুবাদের প্রবণতা বেশি দেখা যায়, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *ভাগবতের* অনুবাদ করেন মধ্যযুগের একাধিক কবি। মুসলিম কবিদের হাতে পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যঘেষা নানা আখ্যানও এসময় অনূদিত হতে দেখা যায়, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লি-মজনুকে কেন্দ্র করে রচিত এসব রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যানের ওপর ছিল সুফিবাদের গভীর প্রভাব।

মধ্যযুগের কাব্যভাণ্ডারে এক বিপুল সংযোজন মঙ্গলকাব্য, যে কাব্যধারাটির মূল উৎস ছিল লৌকিক পুরাণ। পরবর্তীকালে লৌকিক পুরাণের সাথে সংস্কৃত পুরাণের সমন্বয়ের ভিত্তিতে মঙ্গলকাব্যের

কাহিনি গড়ে উঠতে দেখা যায় : 'আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্য ব্যাধ জাতির দেবী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি শিবের গৃহিণী পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। সাপের দেবী ভয়ঙ্করী মনসা যে আর্যমণ্ডল-বহির্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমন্বয়ের যুগে তাঁকে শিবের মানসকন্যা বলে প্রচার করা হল' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬ : ৫১)। তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা থেকে এ সমন্বয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাপের দেবী মনসা মূলত লৌকিক দেবী, বন-জঙ্গল ঘেরা লোকালয় থেকে সাপের উৎপাত বন্ধের প্রয়োজনে এ দেবীর বন্দনা শুরু হয়। মনসার উল্লেখ পাওয়া যায় *পদ্মাপুরাণ*, *দেবী ভাগবত* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণে, মধ্যযুগের *মনসামঙ্গলের* দেবী মনসা নিতান্তই লোকমানস থেকে উদ্ভূত, পুরাণের প্রভাব সেখানে ক্ষীণ। *মার্কণ্ডেয়* পুরাণে দেবী চণ্ডীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, সেখানে তাকে শিকারী সম্প্রদায়ের রক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; সংস্কৃত *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণে তাকে নারী সমাজের দেবী রূপে দেখানো হয়েছে, চণ্ডী দেবীকে কেন্দ্র করে বাংলায় নানা প্রকার মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা, গীতের সৃষ্টি হয়েছিল, যেগুলো বাংলা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগে বাংলা কবিতার আরেকটি ধারা বিকশিত হয়েছে নাথসাহিত্যকে কেন্দ্র করে, নাথ ধর্ম-সাধনাকে কেন্দ্রে রেখে নানা আখ্যান প্রচলিত হয় তৎকালীন সমাজে। এ ধর্মে আদিনাথ হিসেবে স্বীকার করা হয় শিবকে, শিব এবং পার্বতীর উল্লেখ থাকলেও এ সাহিত্য ধারায় তাদের পৌরাণিক মহিমার তুলনায় মীননাথ ও তার শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। গোরক্ষনাথকে অবশ্য সংস্কৃত পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করে নাথসাহিত্যেও সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়— 'পরবর্তীকালে শিব-মৎস্যেন্দ্রনাথের পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে তাঁর কাহিনী জুড়ে গিয়ে তিনি পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬ : ১৬০)।

মধ্যযুগের কাব্য মূলত পুরাণ-নির্ভর, আধুনিক বাংলা কবিতাও মাইকেল মধুসূদনদত্তের হাত ধরে পুরাণ-নির্ভরতার ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু যুগের প্রভাবে এই নির্ভরতার ধরন বদলে গিয়েছিল, পুরাণকে রূপান্তর করে তার শরীর থেকে প্রাচীন আদর্শকে মুছে দিয়ে নতুন অর্থ-তাৎপর্য সংযোজন করেন মধুসূদন, ফলে বাংলা কবিতার অবয়ব থেকে মধ্যযুগীয় প্রবণতাসমূহ দূর হয়ে যায়, নতুন যুগের নতুন প্রত্যয় নিয়ে পৌরাণিক কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় এমন এক কালে আবির্ভূত হন, যখন 'মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা হতমান হয়ে পড়েছেন, রামায়ণ-মহাভারতের পাঁচালীর মন্থর সুর শেষ হয়ে গেছে, বৈষ্ণব পদাবলীর কীর্তনরসও স্তিমিত হয়ে পড়েছে—আর সেখানে প্রচণ্ড কলরবে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ উচ্চৈঃশ্রবার তীব্র-গতিবেগে, চিরাচরিত সংস্কারের ধূলিশয্যা ত্যাগ করে নতুন কাব্যরূপ ও জীবনপ্রত্যয় নেমে এসেছে' (বন্দ্যোপাধ্যায়,

১৯৯৬৬ : ৩৬৮)। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত মধুসূদন মূলত ভারতীয় পুরাণের সাধক, শৈশব-কৈশোরে তাঁর মানসচৈতন্যে সঞ্চিত ভারতীয় পুরাণকে তিনি কাব্য-বিষয় নির্মাণে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের* কাহিনি সংগৃহীত হয়েছে *মহাভারত* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণ থেকে এবং তিনি *রামায়ণের* 'লঙ্কাকাণ্ড' থেকে *মেঘনাদবধ কাব্যের* আখ্যান সংগ্রহ করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিতাদর্শের সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ কাব্যটি। *ব্রজাঙ্গনা* কাব্যটি তিনি নির্মাণ করেছেন রাধা-কৃষ্ণের পুরাণ অবলম্বনে, বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদের পরিবর্তে এখানে তিনি রাধার মানবীয় বোধের রূপায়ণে অধিক মনোযোগী। রোমান কবি ওভিদের কাব্য-পরিকল্পনা অনুসরণ করে *ব্রজাঙ্গনা* কাব্য নির্মাণ করেন, কলাপ্রকৌশলের দিকে থেকে তিনি পাশ্চাত্যের অনুগামী হলেও বিষয় সংগ্রহ করেছেন ভারতীয় পুরাণ থেকে, ভারতীয় পুরাণের নারীদের মনোভূমির বিচিত্র প্রান্ত উদ্ভাসিত হয়েছে মধুসূদনের কবিকল্পনার শক্তিতে।

পৌরাণিক পটভূমিতে নির্মিত মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্যের* ভেতরে অঙ্কুরিত হয় স্বদেশচিন্তা। তিনি পুরাণের এক বিশাল ভুবন নির্মাণ করেন মহাকাব্যের কাঠামোয়, বক্তব্যের অন্তরালে সংযুক্ত করেন স্বদেশভাবনার এক প্রতীকায়িত ভাষ্য। চিন্তাশীল পাঠক রাবণ এবং রামের রূপান্তরিত ভূমিকাকে মিলিয়ে নিতে সক্ষম হন পরাধীন ভারত এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের প্রতিরূপকে। মধুসূদনের পূর্বে বৈঠকী গান এবং ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাতেও ভাষাপ্রেম ও সাজাত্যবোধের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। বৈঠকী সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তিনি বাংলা টপ্পা গানের প্রচলন করেন, ভক্তিরসে স্নাত হয়ে মাতৃভাষার প্রতি নাড়ির টান গানে রূপ নেয় নিধু বাবুর কণ্ঠে : 'নানান দেশের নানান ভাষা/ বিনে স্বদেশী ভাষা/ পুরে কি আশা?' গানের ধারায় পরবর্তীকালে দেশাত্মবোধ জাগিয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো গুণী গীতিকার। মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝামাঝি কালপর্বে, যে পর্বটিকে সাহিত্যের পরিভাষায় বলা হয় যুগসন্ধিক্ষণ, সেই যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে বাংলা কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের আত্মপ্রকাশ। বাংলা কাব্যধারায় তাঁর কৃতিত্ব ব্যঙ্গ-রসাত্মক এবং মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি বিষয়ক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে; 'ভারতভূমির দুর্দশা', 'স্বদেশ', 'ভারত সন্তানের প্রতি', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব' কবিতাসমূহে সমকালীন বৃটিশশাসিত ভারত এবং 'ভাষা' ও 'মাতৃভাষা' কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি কবিহৃদয়ের মমতা-সঘন অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। 'কি রূপেতে বিজাতীয় রাজা রাহু আসি।/ সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি'—এ পঙ্‌ক্তিদ্বয় ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ এবং সমকাল সচেতনতার পরিচয়বাহী, পৌরাণিক 'রাহু' শব্দটিকে উপমা-অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করে তিনি বৃটিশ উপনিবেশবাদের চারিত্র্য যেমন শনাক্ত

করেছেন, তেমনি এ শব্দের ব্যবহার তাঁর পুরাণ অনুরাগী কবি-মনের পরিচয়ও উন্মোচন করেছে। সমকালের পরাধীন ভারতভূমির দুর্দশা কবিকে কাতর করেছে : 'দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,/ চিন্তায় চঞ্চল হয় মন' ('ভারতের ভাগ্যবিপ্লব')। আবার স্বদেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের সংবাদে তাঁর চেতনা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে : 'সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণাক্ষুধা,/ স্বদেশের শুভ সমাচার'('স্বদেশ')।[১] ঈশ্বর গুপ্তের 'ভাষা' কবিতায় বাংলা ভাষার দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে চিত্রকল্প সহযোগে : নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।/ বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা।।' এছাড়া মায়ের মুখনিঃসৃত মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি লিখেছে : 'মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,/ তুমি তার সেবা কর সুখে' ('মাতৃভাষা')। ঈশ্বর গুপ্তের নির্মাণকৃত এই পথে পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সাজাত্যবোধে পূর্ণ ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা *পদ্মিনী উপাখ্যান* বাংলা কাব্যে সংযোজন করেন তিনি, ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশভাবনাকে আরও সম্প্রসারিত রূপ দিয়ে যুগোপযোগী করে তোলেন 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' উচ্চারণের ভেতর দিয়ে। উপনিবেশবাদ ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির মহামন্ত্ররূপে স্বীকৃতি পায় তাঁর এ নির্মাণ, বৃটিশ-ভারতে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষকালের এ উচ্চারণ নিঃসন্দেহে সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। *পদ্মিনী উপাখ্যানের* মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও আঙ্গিকগত দুর্বলতার কারণে এটি মহাকাব্য না হয়ে পরিণত হয়েছিল আখ্যায়িকায়, কিন্তু রঙ্গলালের সাফল্য ছিল অন্যখানে, বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ যখন তার পরাধীন সত্তা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর স্বদেশভাবনামূলক 'এ গান সমর-সঙ্গীতের কাজ করেছিল' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬ : ৩৬৫)। রঙ্গলাল আরও একটি কারণে স্মরণীয়, তাঁর আখ্যায়িকা মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার পথকে সহজতর করে দিয়েছিল।

রঙ্গলালের কবিতায় স্বদেশচিন্তার যে অনুরণন প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর বীজ ছিল সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভেতর, সে-সময়কে চিহ্নিত করা যায় বাঙালি জনজীবনে জাতীয়তাবাদী চেতনা-বিকাশের উষালগ্ন হিসেবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে সিরাজদ্দৌলার গুরুত্ব, জাতীয় নায়ক হিসেবে তাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং বৃটিশদের বিদেশি শাসক হিসেবে শনাক্ত করে তাদের 'পরদেশলোভী' ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে মাইকেলের মহাকাব্য রেখেছিল যুগান্তকারী ভূমিকা। তিনি পুরাণ-প্রতীকাশ্রয়ী *মেঘনাদবধ* কাব্যে সাজাত্যবোধের উদ্বোধন করেন নতুন মাত্রায়, শিল্পের মহাচাতুর্যে। ফলে, বাংলা কবিতার একটি নতুন এবং সফলতম ধারা যেমন তৈরি হয়, তেমনি পরাধীন বাঙালি মধুসূদনের কাব্যে খুঁজে পায় জাতীয়তাবাদী চেতনার

পাথেয়। পুরাণের চিরায়ত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ পাল্টে দিয়েও মাইকেল অর্জন করেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাকবির আসন। এ সময়ের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাতেও স্বদেশভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মধুসূদন এবং ঈশ্বর গুপ্ত উভয় কবির প্রভাবে তাঁর মানসগঠন সম্পন্ন হয়, ফলে তাঁর কবিতায় মহাকাব্যসুলভ গাম্ভীর্য যেমন ছিল তেমনি ছিল ব্যঙ্গের কষাঘাত। বৃটিশ শাসনের অধীন বাঙালি জাতির অন্তঃসারশূন্যতাকে কটাক্ষ করে তিনি লিখেছিলেন : 'পরের অধীন দাসের জাতি 'নেশন' আবার তারা/ তাদের আবার 'এজিটেশন' নরুণ উঁচু করা' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬ : ৩৮৮)। তাঁর এই লঘু উচ্চারণেরও একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কাব্যমূল্য আছে, 'এ সমস্ত রঙ্গব্যঙ্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন স্বদেশানুরাগ আছে বলে এর দাম এখনও কম নয়' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬ : ৩৮৮)। হেমচন্দ্রের ধারাবাহিকতায় বাংলা কাব্যে পরবর্তীকালে পাওয়া যায় নবীনচন্দ্র সেনের নাম, তিনি স্বদেশভাবনা-তাড়িত হয়ে রচনা করেন *পলাশীর যুদ্ধ* কাব্য। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণমূলক আচরণের শিকার বাঙালি জাতির কাছে পলাশীর যুদ্ধ ছিল পরাধীনতার স্মারক। এছাড়া কায়কোবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যে স্বদেশভাবনা বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে।

মহাকাব্য বাংলা কবিতার ধারায় দীর্ঘজীবী হতে পারেনি, এ-সময় বাংলা কাব্যধারায় নতুন কাব্য-আঙ্গিক হিসেবে গীতিকবিতার জন্ম হয়, আখ্যানধর্মী মহাকাব্যের ব্যাপক পরিসরের বিপরীতে খণ্ড-চারিত্র্য নিয়ে গীতিকবিতার বিকাশ। বাংলা গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যে অসীম ও অরূপের সাধনার নেপথ্যে পৌরাণিক অভিজ্ঞান গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, বিশেষ করে তাঁর *সারদামঙ্গল* কাব্যে পাওয়া যায় দেবী সরস্বতীর 'বিশ্ববিমোহিনী' রূপ। তবে তাঁর কাব্যে স্বদেশ-সংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশ নেই বললেই চলে।[২] বিহারীলালের উদ্ভাবনকৃত রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারাতেই পাওয়া যায় সব্যসাচী শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। রোমান্টিক বলেই তাঁর কাব্যসাধনার সঙ্গে বস্তুজগতের পরিপূর্ণ সংযোগ ঘটেনি, ফলে তাঁর সৃষ্টি বিচিত্রগামী হলেও কবিতার সঙ্গে স্বদেশভাবনার প্রত্যক্ষ যোগ তুলনামূলকভাবে কম। রবীন্দ্রনাথ সমকালের পরিবর্তে নিত্যকালের চিরায়ত রূপটিকে কাব্যবন্দি করতে চেয়েছিলেন, এ কারণে সমকালের উত্তাল ঘটনাধারা থেকে তাঁর কাব্য মুক্ত এবং এটি তাঁর সচেতন প্রয়াস : 'রবীন্দ্রনাথ যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধটি দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন তার স্বরূপ আর ফলাফল, পান করেছিলেন মানব-সভ্যতার অমঙ্গল-চেতনার বিষ এবং নিজের প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে রেখেছিলেন ক্লান্ত ও সংশয়ী মনের নৈরাজ্যের চিহ্ন—তবু কবিতায় তিনি প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তার অভিঘাত' (চক্রবর্তী, ১৯৯৬ : ১৭৫)। সমকালীন ভারতবর্ষের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ নয়, বরং তিনি মুগ্ধ হয়েছেন প্রাচীন ও নতুন ভারতের নির্মল রূপ, ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে;

ভারতভূমিকে কেন্দ্রে রেখে তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মী' (*কল্পনা*), 'ভারতলক্ষ্মী' (*কল্পনা*), 'বঙ্গমাতা' (*চৈতালি*) কবিতার জন্ম দিয়েছেন। তবে এর ভেতরেই অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ও রাজনীতিসচেতন কবিসত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে :

তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।
('বঙ্গলক্ষ্মী', *কল্পনা*)

উপনিবেশের অধীন এই দেশ ছিল লুণ্ঠন আর মুনাফা তৈরির কারখানা, ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এ দেশ বরাবর চক্রান্তের শিকার, এ দেশের ধন-ঐশ্বর্যে প্রতিপালিত হয়েছে বিদেশী রাষ্ট্র, তাই 'ভারতলক্ষ্মী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,/ দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন' (*কল্পনা*)। রবীন্দ্রনাথের সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সময় সমকাল তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, পরাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার অভিসম্পাতে আক্রান্ত দেশের বাণীরূপ মূর্ত হয়েছে *নৈবেদ্যের* কবিতাসমূহে : 'ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে/ বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।'—এসব উচ্চারণের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সচেতন কবিসত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে। মহামানবের তীর্থভূমি ভারতকে তিনি দেখেছিলেন সব কালের সব শ্রেণি-ধর্মের মানুষের সম্প্রীতির মহামিলনক্ষেত্র হিসেবে, তাই তাঁর কবিতায় উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল :

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃস্টান।
(*গীতাঞ্জলি*)

*গীতাঞ্জলিতে* উচ্চারণ করেন : 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,/ সেথা হতে সবে আনে উপহার'...তাঁর এ ধারণা পরবর্তীকালে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। একসময় তিনি উপলব্ধি করেছেন, পশ্চিম যতটা বহন করে এনেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে শোষণ। *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থে পশ্চিমা শাসন-শোষণ এবং

ভারতবর্ষের দাসত্বকে কঠোর সমালোচনা করে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন পরাধীনতার অন্ধকার ও দাসত্বমোচনের অমিয় বাণী : '...আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ' অথবা 'হে ভারত, সর্বদুঃখে রহো তুমি জাগি/...সকল বন্ধনে/ আত্মারে স্বাধীন রাখি।' *গীতাঞ্জলি* কাব্যে 'ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' দাঁড়িয়ে আর্য, অনার্য, শক-হুন, পাঠান-মোগলের সঙ্গে এক সারিতে রেখে পশ্চিমের 'উপহার' গ্রহণ করে লেন-দেনের যে উদাত্ত আহ্বান শুনিয়েছিলেন, *নৈবেদ্য* কাব্যে সেই প্রত্যয় আর অবশিষ্ট ছিল না, কারণ 'বণিকের মানদণ্ড' ততদিনে দেখা দিয়েছে 'রাজদণ্ড রূপে'। ব্যক্তিগত জীবন এবং গদ্য রচনায় তিনি স্বদেশসংলগ্ন ছিলেন নিবিড়ভাবে, 'নাইট' উপাধি বর্জনের ভেতর দিয়ে প্রতিবাদ, *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের আখ্যান এবং তাঁর প্রবন্ধসমূহের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর সুগভীর স্বদেশ-প্রত্যয়। কবিতায় তিনি মূলত গীতিমুখর, আত্মকেন্দ্রিক, অধ্যাত্মবাদী, প্রেম ও সৌন্দর্য-অনুসন্ধানী, এ কারণে স্বদেশভাবনার প্রতিফলন কবিতায় ততটা নেই, যতটা তাঁর ব্যক্তিচৈতন্যে তিনি ধারণ করেছিলেন।

বহুবিচিত্র প্রতিভা নিয়ে বিকশিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পিসত্তা কবিতার ক্ষেত্রে পেয়েছিল স্বদেশ ও বিশ্বের স্বীকৃতি। স্বদেশভাবনার প্রকাশ যেমন তাঁর কাব্যে অবাধ-উদ্দাম নয়, তেমনি পুরাণের ব্যাপক-উচ্ছ্বসিত ব্যবহারও তাঁর কাব্যে নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার নিবিড়তর পাঠে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর কবিতার ক্ষেত্রভূমিটির অনুশাসক পুরাণাশ্রিত চৈতন্য, যে চৈতন্যকে সহজে চিহ্নিত করা যায় না, যা অন্তঃশীলা, একে কেবল উপলব্ধি দিয়ে শনাক্ত করা সম্ভব। তাঁর পৌরাণিক-চৈতন্য তৈরি হয়েছিল পারিবারিক আবহে, উপনিষদমুগ্ধ পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচর্যায় রবীন্দ্র-মানসে অল্প বয়সে সঞ্চিত হয়েছিল পৌরাণিক অভিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগার তখন তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছিলেন, *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে সে-সময়ের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : 'সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন' (ঠাকুর, ২০১১ : ৪৪৫)। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে প্রাচ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্য প্রজ্ঞার সংমিশ্রণও ঘটেছে, ফলে সমন্বয়ের একটা চিত্র তাঁর কাব্যে অনুভূত হয় : '...শেলির প্যানথিইজম বা বিশ্বব্যাপী ঐশীশক্তির অনুভূতি তিনি বেদ ও উপনিষদের ঐতিহ্যের সাহায্যে আরও স্ফুটমান করে তুললেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের অতি দার্শনিকতা কালিদাস ও বৈষ্ণবপদকর্তাদের সৌন্দর্যদৃষ্টি দিয়ে মানবিক ক'রে নিলেন' (ত্রিপাঠী, ১৯৫৮ : ১৯)। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ কবির কাব্যরসে উর্বর হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকালের কবিমানস, বৈষ্ণব কবিতার প্রতি তাঁর যে আবাল্য অনুরাগ,

সেই অনুরক্ত মনের নিবেদন 'বৈষ্ণবকবিতা' : 'সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/ কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি' (*সোনার তরী*)। এই ভাবমুগ্ধতার কারণে তাঁর প্রথম কাব্য-নিদর্শনের নামকরণ করেন *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*; নামকরণ থেকে শুরু করে বিষয়, ভাষা ও উপস্থাপনরীতি —সার্বিকভাবে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যের কাছে ঋণী এ কাব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে। পদাবলী গোত্রের এ কাব্যে ব্রজবুলি ধরণের মিশ্র ভাষায় তিনি নির্মাণ করেছেন রাধা-কৃষ্ণের পুরাণ :

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহু চাহিয়া
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।

(*ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*)

কাব্যচর্চার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৌরাণিক প্রেরণা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায়। *কল্পনা* কাব্যের 'মদনভস্মের পূর্বে', *চিত্রা* কাব্যের 'উর্বশী' ও 'প্রেমের অভিষেক', *সোনার তরী* কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতাবলি পুরাণের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রচিত। এছাড়া তাঁর অসীমের যে উপলব্ধি তারও কেন্দ্রে সক্রিয় ছিল পৌরাণিক অভিজ্ঞান, অরূপ অসীমের প্রতি তাঁর উচ্চারণ : 'তোমারও অসীমে প্রাণমন লয়ে/ যত দূরে আমি যাই/ কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু/ কোথা বিচ্ছেদ নাই' (*নৈবেদ্য*)। *সোনার তরী*র কিছু কবিতায় তিনি রূপকথার আশ্রয় নিয়েছিলেন, 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাসমূহে রূপকথার কল্পজগৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ঐশ্বর্যময় জগতে পরিভ্রমণ করেছিলেন ভক্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদে সমর্পিত হয়ে, মধুসূদন বা তিরিশের আধুনিক কবিতার মতো তিনি পুরাণের ব্যবহার করেননি, বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণকে কবিতায় সরাসরি ব্যবহারের অনাগ্রহে তাঁর কবিতায় স্বদেশ ও সমকালের রূপটিও থেকে যায় অধরা। এই অপূর্ণতাকে দূর করেছিলেন পরবর্তীকালের আধুনিক কবিরা, তাঁদের প্রযত্নে অধ্যাত্মবাদ, ভক্তিবাদ, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, মঙ্গল ও কল্যাণের নিশ্ছিদ্র দুর্গ থেকে সমকালের সংকটপূর্ণ সময়ের ভেতরে নোঙর করে রবীন্দ্রত্তোর কালের আধুনিক কবিতা।

তিরিশের আধুনিকতা শুরুর পূর্বে বাংলা কবিতায় আবির্ভূত হন নজরুল, যখন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা রীতিমতো সাধনার ব্যাপার, সে-সময় রবীন্দ্রবলয়ের ভেতরে বাস করেও শুধু বিদ্রোহের শক্তিতে

তিনি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতাকে। নজরুল বাংলা কবিতায় নতুন সুর সংযোজন করেন, এই সংযোজনা নানামাত্রিক।[৩] জাতিগত পশ্চাদপদতাকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে বেরিয়ে তিনি কাব্যচর্চা করেন, তাঁর স্বাতন্ত্র্য তিরিশি কবিদের মতো সতর্ক প্রয়াস নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্ত। এই স্বতঃস্ফূর্ততার গুণে তাঁর কবিতায় সংযুক্ত হয় সাম্যবাদী আদর্শ, এক্ষেত্রে তিনি যেমন পথিকৃৎ, তেমনি পুরাণের সমন্বয়ী প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি পালন করেছেন যুগস্রষ্টার ভূমিকা। মধুসূদনের কাব্যের পুরাণ-প্রবাহ পাশ্চাত্য প্রভাবজাত হলেও সরাসরি পাশ্চাত্য পুরাণের ব্যবহার তাঁর কবিতায় নেই, নজরুল স্বল্প পরিসরে হলেও প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামী ঐতিহ্যকে কেন্দ্রে রেখে কবিতা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর কবিসত্তা বিদ্রোহী, বিপ্লবী। ফলে, তাঁর কবিতায় ভারতীয় পুরাণের শিব সৃষ্টি ও ধ্বংসের যৌগপত্য নিয়ে আবির্ভূত, শিব যেন তাঁর কবিসত্তার প্রতিমূর্তি, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে নতুন জীবনের উদ্বোধনে শিবের নটরাজ মূর্তি কবিকে দিয়েছিল তাঁর অন্তর্গত অনুভূতি রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি। কাব্যচর্চার শুরু থেকেই তিনি পুরাণকে কাব্যকৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে পুরোনো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজ-রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা সহজ ছিল না, এজন্য তাঁর সময়-সচেতন কবিসত্তা বেছে নিয়েছিল পুরাণের আড়াল। যদিও শেষ পর্যন্ত সে আড়াল ভেদ করে তাঁর কবিতার তেজোশক্তি পৌঁছে গিয়েছিল বৃটিশ শাসকদের কাছে, কবিতার খড়্গাঘাতে ভীত শাসকেরা বাজেয়াপ্ত করে নজরুলের অনেক কবিতা। *অগ্নি-বীণায়* ঝংকৃত তাঁর বিদ্রোহী বাণী পুরাণ-প্রকল্পকে কেন্দ্র করে শাণিত রূপ পেয়েছিল, এ কাব্যের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় তিনি শিবের দ্বৈত-সত্তার আরাধনা করেন : 'তাই সে এমন কেশে-বেশে/ প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—/ ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!' ('প্রলয়োল্লাস', *অগ্নি-বীণা*) ধ্বংস তাঁর চোখে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত : 'এই সর্বব্যাপী প্রলয়ের ধ্বংস-স্তূপ থেকেই আবার আবির্ভূত হবে নব-সৃষ্টি। এ জন্যেই নটরাজ শিব কাজী নজরুল ইসলামের অন্তর্গূঢ় অভীপ্সার যথাযথ প্রতিরূপক (allegory) হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ তিনি শুধু ধ্বংসই চাননি, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও তাঁকে আলোড়িত করেছে' (সাদিক, ১৯৯৩ : ৪)। বাংলা কবিতার পুরোনো ধারা ও পুরোনো কাব্যসুরের মূলে আঘাত করে নজরুলের আবির্ভাব *অগ্নি-বীণা* নিয়ে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবেই শুধু নয়, বাংলা কবিতার ইতিহাসে এ কাব্যের আরও নানাবিধ ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে : 'ইংরেজি কবিতার বিবর্তনের ধারায় এলিয়টের যে ভূমিকা, বাংলা কবিতার পটভূমিতে নজরুল ইসলামের অবদান তদপেক্ষা তাৎপর্যবহ।...*অগ্নি-বীণা*-য় নজরুল ইসলাম যে কাব্যোপকরণ ও জীবনোপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করলেন, রবীন্দ্রপ্রভাবিত বাংলা কবিতার ধারায় তা কেবল নতুনত্বই সম্পাদন করলো না, পরবর্তী সম্ভাবনার পথকেও করলো দ্বিধামুক্ত' (খান, ২০০২ : ১)।

নজরুলের কাব্যে ভারতীয় পুরাণের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়, সে তুলনায় পাশ্চাত্য পুরাণের নিদর্শন কম, 'বিদ্রোহী' (*অগ্নি-বীণা*) কবিতায় অর্ফিয়ুস এবং 'নারী' (*সাম্যবাদী*) কবিতায় প্লুটোর উল্লেখ করেছেন তিনি, গ্রিক পুরাণের হেডিস এবং রোমান পুরাণের প্লুটো দু'জনেই পাতালপুরীর দেবতা। রোমান পুরাণের পাতালপুরীর দেবতা প্লুটোর রূপকল্পে নারীর পরাধীন সত্তার রূপায়ণ করেছেন কবি : 'কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজ নিশীথ পাখায় উড়ে/ ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।' ইসলামী ঐতিহ্য প্রয়োগের নিদর্শন তাঁর কাব্যে অপ্রতুল নয়, 'হাইদরী হাঁক হাঁকি, দুলদুল আসওয়ার/ শমশের চমকায় দুশমনে ত্রাসবার' ('মোহররম', *অগ্নি-বীণা*) অথবা, 'জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত 'মিকাইলে'র আতশী-পাখায়' ('ঝড়', *বিষের বাঁশী*)—কবিতাসমূহের ভাষ্য ইসলামী ঐতিহ্যের ব্যবহারে সমৃদ্ধ।

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নজরুল এবং মধুসূদন উভয় কবি পুরাণের পুনঃনির্মাণে, পুরাণের ঋণ গ্রহণে অক্লান্ত, তবে স্বদেশভাবনার ক্ষেত্রে নজরুল এবং মাইকেল দুই স্বতন্ত্র মেরুর বাসিন্দা। নজরুল যখন বাংলা কাব্যে পদচারণা শুরু করেন, ততদিনে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি হয়ে গেছে, বৃটিশবিরোধী নানারকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও আন্দোলনে বাঙালি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে, নজরুলের কবিতার বাণী আগুনঝরা সে-সময়ের ভেতরে বারুদের মতো জ্বলে উঠেছিল, তাঁর কবিতা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা হয়ে উঠেছিল একে-অপরের পরিপূরক, এটি যুগপতভাবে নজরুলের গুণ এবং দোষ : 'কবিতাত্রাণের চেয়ে সমাজ ও স্বজাতিত্রাণের ঝোঁক ছিল তাঁর অধিক' (আজাদ, ১৯৮৩ : ৮)। এই প্রথম বৃটিশ ভারতে একজন কবি কবিতা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত হলেন, স্বদেশের জন্য কবিতা লিখে রাজ-রোষানলে পড়ে কারাদণ্ড ভোগ করা প্রথম বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম।[৪]

নজরুলের বিদ্রোহী শক্তি তিরিশের কবিদের রবীন্দ্র-বিদ্রোহের প্রেরণা যোগাতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গল—রবীন্দ্র-কাব্যের এই তিন আদর্শকে প্রত্যাখ্যান, প্রেমকে অরূপ-অশরীরী- অতিলৌকিকতা থেকে শরীরী প্রেমের আদর্শে উন্নীত করে পার্থিবতায় প্রতিষ্ঠা, নিত্যকালের পরিবর্তে সমকালকে প্রেক্ষাপট হিসেবে গ্রহণ, মানবজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-শ্রেণিব্যবধান, যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়কে অবলম্বন করে ভক্তি, মায়া ও হৃদয়াবেগের পরিবর্তে যুক্তি ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতা নির্মাণে প্রয়াসী হন তিরিশের কবিকুল। আধুনিক মন ও মননের উপযোগী ভাষা-প্রকরণও তাঁরা তৈরি করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে ভাঙার সংকল্প ছিল গঠনমূলক, অর্থাৎ ভেঙে আবার নতুন করে নির্মাণ, এটি তাঁরা করেছিলেন

আত্মপ্রতিষ্ঠার পথানুসন্ধান এবং কালের মোচন-প্রক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে। রবীন্দ্রানুকরণের ভয়াবহ পরিণতি তাঁরা দেখেছিলেন যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধন, সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, তাঁদের এ বিলয় তিরিশি আধুনিক কবিদের কাছে ছিল অশনিসংকেত : 'রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক করে গেছেন' (বসু, ১৯৮২ : ৬৭)। সেই সতর্কতা থেকে রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শকে তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন। এলিয়টের ঐতিহ্য-ঋণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কবিতার বিষয়-নির্মাণে অভিনবত্ব আমদানি করেন তাঁরা, এই সূত্রে পুরাণ থেকে তাঁরা অবাধে গ্রহণ করেছিলেন ঐতিহ্য-ঋণ। কবিতার বিষয় ও কলাকে শাণিতকরণের প্রয়োজনে তিরিশের কবিরা পুরাণবিহারী, তাঁদের পুরাণ-পরিক্রমা ব্যাপক পরিসরজুড়ে, ফলে প্রাচ্য পুরাণের পাশাপাশি প্রাশ্চাত্য পুরাণের নানাবিধ ব্যবহারে তাঁদের কবিতাবলি উজ্জ্বল। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় পুরাণের ব্যবহার দেখা যায়, তবে সবচেয়ে বেশি পুরাণ ব্যবহার করেছেন বিষ্ণু দে। মাইকেল মধুসূদন পাশ্চাত্য প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় পুরাণের নতুনতর রূপ নির্মাণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ একনিষ্ঠভাবে ভারতীয় পুরাণের বন্দনা করেছেন, নজরুল তাঁর কবিতায় প্রথম পুরাণের সমন্বিত ব্যবহার করেন—ভারতীয় পুরাণ, পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য এবং স্বল্প পরিসরে পাশ্চাত্য পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। সমন্বয়ের সংকল্প নিয়ে তিরিশের কবিতায় পুরাণ ভৌগোলিক সীমা ভেঙ্গে বিশ্ববিস্তারী রূপ নিয়ে বিকশিত হয়েছিল, ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পুরাণের অবাধ ব্যবহারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বাংলা কবিতাধারা।

রাবীন্দ্রিক প্রেম ও সৌন্দর্যময় বিশ্ব ভেঙে বিচূর্ণ করে বেরিয়ে আসার প্রত্যয়ে দীক্ষিত তিরিশের কবিকুল বৈশ্বিক চিন্তাধারা এবং বিশ্বমানবের বিপর্যয়ে চেতনাগতভাবে হয়ে ওঠেন যন্ত্রণাসংকুল, বিশ্বচৈতন্য তাঁদের কবিসত্তাকে ব্যাকুল করেছিল, ফলে সমকালীন সংক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁদের মানসপটে ব্যাপক আলোড়ন তৈরির সুযোগ পায়নি। তিরিশি আধুনিকতার কবি জীবনানন্দ দাশ ইতিহাস ও সমাজচেতন। সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িক ভেদ, পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। শুরুতে তিনি নারী ও নিসর্গের কবি ছিলেন, শেষ পর্বের কবিতায় তাঁকে কাল-সচেতন এবং স্বদেশ-সচেতন কবি হিসেবে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্র তাঁর 'বিভিন্ন কোরাস' শিরোনামের কবিতায় পাওয়া যায়, জীবনানন্দের কবিতায় কোনকিছুই উচ্চকিত নয়, বরং ধীর-নরম-অস্ফুট উচ্চারণে তিনি জানিয়ে দেন জীবনের গভীরতর শোক ও সংকটের সংবাদ : 'নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে;/ একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে...' (*সাতটি তারার তিমির*)। সমকালের ভেতরে তিনি জন্মাতে দেখেছিলেন 'কলরব', 'কাড়াকাড়ি',

'অপমৃত্যু', 'ভ্রাতৃবিরোধ'। সামাজিক শ্রেণির অসম বিন্যাসের ধরন দেখে নারী ও নিসর্গ-শাসিত জীবনানন্দ সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠেন, 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতায় রয়েছে তাঁর শ্রেণিসচেতনতার ছাপ, মানুষের জন্য যে শুভবাদী সমাজ-রাষ্ট্র প্রত্যাশিত, সেই সমাজ-রাষ্ট্রের প্রকৃত চারিত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কলমের আঘাতে :

> কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
> মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;
> যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
> (*শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

পরবর্তীকালে দাঙ্গা, মন্বন্তর, বঞ্চনার ইতিহাস থেকে বেরিয়ে জীবনানন্দ আবার নিসর্গের ভেতরে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করেছিলেন। *রূপসী বাংলার* কবিতাগুলো গ্রামবাংলার প্রকৃতির নিবিড়তম প্রকাশ, যদিও জীবনানন্দ দাশের জীবনের একটি বড় পর্ব কলকাতা নগরে অতিবাহিত হয়েছে, তবু তিনি নিজেকে পাড়াগাঁর লোক বলে চিহ্নিত করতে যেন স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন : 'আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর' ('পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত', *রূপসী বাংলা*)। *রূপসী বাংলার* নিসর্গচেতনার ভেতরে তাঁর স্বদেশপ্রেমী কবিসত্তার আত্মপ্রকাশ, 'তোমার যেখানে সাধ চ'লে যাও—আমি এই বাংলার পারে/ র'য়ে যাব' ('তোমার যেখানে সাধ'), 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/ খুঁজিতে যাই না আর' ('বাংলার মুখ আমি')—রূপসী বাংলার এসব উচ্চারণ কোমল ও বর্ণিল, স্বদেশবোধে দৃপ্ত। বাংলার নাড়ির টানে বাঁধা কবি জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে নতুন কোন ভূখণ্ড নয়, এই বাংলাকেই ফিরে পেতে চান : 'আবার আসিব ফিরে এই ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়' ('আবার আসিব ফিরে')। স্বদেশের রূপমুগ্ধ বন্দনা বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ ছাড়া আর কোন কবির লেখায় পাওয়া যায় না। কাব্যচর্চার শুরু থেকেই তিনি দেশ-কাল সচেতন, নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 'ঝরা পালকে'র কবি গেয়েছিলেন সম্প্রীতির গান : 'এ ভারতভূমি নহেকো তোমার, নহেকো আমার একা,/ হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ – মুসলমানের রেখা' ('হিন্দু-মুসলমান', *ঝরা পালক*)। তিনি নিবিড় উচ্চারণে কবিতায় সজীব করে তুলেছেন স্বদেশকে, পুরাণও তাঁর কবিতায় পেয়েছে নতুন প্রাণঃস্ফূর্তি। তিনি কবিতায় পুরাণ প্রয়োগের চেয়ে পুরাণ সৃষ্টিতে বেশি মনোযোগী, তাঁর কবিতাসমূহ পৌরাণিক প্রতীতিতে উজ্জ্বল, বক্তব্যের মৌল তাৎপর্যের সঙ্গে গভীর মিথস্ক্রিয়ার কারণে তাঁর কাব্যে স্বতন্ত্রভাবে পুরাণ আবিষ্কার করা কঠিন। জীবনানন্দের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু কবিতা :

ক. বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চ'লে যেতে দেখে—তবু—অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা ক'রে
এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি;
('তবু', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

খ. সতীর শীতল শব্দ বহুদিন কোলে লয়ে যেন অকপট
উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে,— চন্দ্রশেখরের মত তার জট
উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদ আজ পুনরাগমনে;
('অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া', *রূপসী বাংলা*)

গ. ...একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো কেঁদেছিলো পায়।
('বাংলার মুখ আমি', *রূপসী বাংলা*)

জীবনানন্দ দাশ কাব্যচর্চার শুরু থেকেই পুরাণ-আশ্রিত কবিতা নির্মাণ করেছেন, পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যে পুরাণ ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে, তাঁর *রূপসী বাংলা* কাব্যে পুরাণের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁর কাব্যেও রয়েছে লোকজ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে শিকড়ের সঙ্গে গভীর সংযোগ-রক্ষার প্রবণতা, সেই সূত্রে তাঁর কবিতায় উঠে আসে লোক-ঐতিহ্যের নায়িকারা : 'যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার/ কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর' ('যতদিন বেঁচে আছি', *রূপসী বাংলা*)। শঙ্খমালা তাঁর কবিতায় পুনরাবৃত্ত এক রূপকথার চরিত্র, *রূপসী বাংলা* কাব্যের 'জীবন অথবা মৃত্যু', 'কোথাও মাঠের কাছে', 'তবু তাহা ভুল জানি' এবং *বনলতা সেনের* 'শঙ্খমালা' কবিতায় লোকজীবনের প্রতিমা হিসেবে শঙ্খমালার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া মানিকমালা ('ঘুমায়ে পড়িব আমি', *রূপসী বাংলা*), কাঞ্চনমালা ('যে শালিখ মরে যায়', *রূপসী বাংলা*) চরিত্রদ্বয় রূপকথার জগৎ থেকে পুনঃনির্মিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। ভারতীয় লোকপুরাণের আলোচিত নারী বেহুলাকে কেন্দ্রে রেখে তিনি নির্মাণ করেছেন *রূপসী বাংলা* কাব্যের 'বাংলার মুখ আমি', 'একদিন জলসিড়ি', 'হায় পাখি, একদিন', 'যেদিন সরিয়া যাব' কবিতাসমূহ। তাঁর কবিতায় গ্রিক পুরাণের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম, *অগ্রন্থিত কবিতা*'র 'বৈতরণী' কবিতায় ল্যাজারস, *বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যের 'পটভূমি' কবিতায় ওডিসিউস প্রসঙ্গ রয়েছে। কাব্যচর্চার শুরুতে রূপকথা এবং বৌদ্ধ পুরাণের প্রতি তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন, তিনি বৌদ্ধ পুরাণ অবলম্বনে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন : *বনলতা সেন* কাব্যের 'শ্যামলী', 'অনুপম ত্রিবেদী',

'সুচেতনা', 'এইখানে সূর্যের', 'মানুষের মৃত্যু হলে' কবিতাসমূহে বৌদ্ধ পুরাণের দার্শনিক প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া গান্ধীবাদী আদর্শকে ব্যাখ্যা করার সূত্রে তিনি পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন ঈশা নবী এবং তার পুনরুজ্জীবন প্রাপ্তির আখ্যান : 'কেমন সফল এই পর্বতের সানুদেশ থেকে,/ ঈশা এসে কথা ব'লে চ'লে গেল—' ('মহাত্মা গান্ধী', *বেলা অবেলা কালবেলা*)। জীবনানন্দ দাশ সংগোপনে তাঁর কবিসত্তায় লালন করেছিলেন পৌরাণিক অভিজ্ঞান, 'নির্জনতার কবি' বলেই হয়তো কবিতার অবয়ব সংগঠনে নিভৃতে কাজ করেছে তাঁর পৌরাণিক চেতনা। তবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে যূথবদ্ধ হয়ে পড়ায় তাঁর কবিতায় স্বতন্ত্রভাবে পুরাণ নির্দেশ করা সুকঠিন ব্যাপার : 'জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঐতিহ্য, ইতিহাসচেতনা এবং পুরাণ প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। খুব ধীরে ধীরে তিনি লোকজীবন, রূপকথা, লোকপুরাণ ও ইতিহাসচেতনার ধারাক্রমের মধ্য দিয়ে মিথবলয়ে প্রবেশ করেন' (সাদিক, ১৯৯৩ : ১৮)।

জীবনানন্দ যে পঞ্চপাণ্ডবের বলয়ভুক্ত ছিলেন, সে-বলয়ের আরেকজন পাণ্ডব সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তিনি যুগ-সচেতন কবি ছিলেন বলে যুগের নানা আর্তি তাঁর কবিতায় ভাষা পেয়েছে। তিনি চৈতন্যগতভাবে বিশ্বরাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতে আলোড়িত হয়েছেন : 'ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বর্বরতা, আনবিক বোমার আঘাতে জর্জরিত হিরোশিমা নাগাসাকি, সানফ্রান্সিসকোর সম্মেলন—সবই তাঁর মানসে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই যুগ যে ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন এবং প্রলয় যে আসন্ন 'অর্কেস্ট্রা' থেকে 'সংবর্ত' পর্যন্ত বারংবার তিনি তা বলে এসেছেন' (ত্রিপাঠি, ১৯৫৮ : ১৯৮)। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার যুগভাবনা দার্শনিকতা-মথিত, ফলে সমকালীন স্বদেশ তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়নি। ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক সংকট এবং ক্ষণবাদ ও নাস্তিক্যবাদ দিয়ে তৈরি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রুক্ষ-কঠিন মানসজগৎ। তিনি অনেক সময় কবিতার পরিচর্যায় পুরাণের শরণ নিয়েছেন, পুরাণকে বহমান কালের সঙ্গে সংলগ্ন করেছেন। তাঁর দুর্গম কবিতার প্রান্তরে পুরাণের অভিযোজন কবিতাকে দিয়েছিল নতুন মাত্রা : 'সমকালীন জীবন ও বৈশ্বিক সংকটের শিল্পরূপ তিনি নির্মাণ করেন পুরাণ ব্যবহার করেই' (সাদিক, ১৯৯৩ : ৭৮)। তিনি মূলত ভারতীয় পুরাণের শরণাগত হয়েছেন ব্যক্তিগত এবং কালের সংকট ব্যাখ্যায়, পাশ্চাত্য পুরাণের ব্যবহার তিনি তুলনামূলকভাবে কম করেছেন। তাঁর 'প্রলাপ' কবিতায় মৃত্যুর পৌরাণিক আলাপ :

> আসে মৃত্যু নীলকণ্ঠ, আসে মৃত্যু রুদ্র মহাকাল,
> নিষ্পেষিত মানুষের শোণিতে গুলাল
> চরণে অলক্তরেখা আঁকি।

হানো, হে পিনাকী,
হানো তবে তব বিষবাণ;

(*অর্কেস্ট্রা*)

বুদ্ধদেব বসু কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার ধ্রুপদী চারিত্র্য এবং দুর্বোধ্যতার বিতর্কে যোগ দিয়ে তাঁকে খাঁটি রোমান্টিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, প্রেম অথবা ভগবানে অবিশ্বাস উভয় দিক থেকে : 'সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক।'[৫] সুধীন্দ্রনাথ রোমান্টিক প্রেমিকসত্তা সৃষ্টিতে ভারতীয় পুরাণের মদনের শরণাপন্ন হয়েছেন। মদন প্রেম ও কামের দেবতা, শিবের তৃতীয় নয়নের আগুনে ভস্মীভূত বলে অনঙ্গ, অতনু; তার প্রধান কাজ পুষ্পধনুক থেকে তীর ছুঁড়ে হৃদয়ে হৃদয়ে সেতুবন্ধ তৈরি করে দেয়া। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মদনের পুরাণ প্রসঙ্গ বারবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, বিশেষ করে *অর্কেস্ট্রা* কাব্যে : 'অনন্তের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি?' ('অপচয়'), 'মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব;' ('ভবিতব্য'), 'কম্প্র কুসুমাস্ত্র যেন,' ('বিকলতা'), 'শুধু যেন রহে অন্তঃশীলা/ তোমার অতনুলীলা/ মোর ব্যর্থ প্রতীক্ষার অবাধ প্রান্তরে' ('প্রলাপ')।[৬] মদনকে কবি 'অনঙ্গ', 'অতনু' নামে অভিহিত করেছেন, তার হাতের তীরধনুককে চিহ্নিত করেছেন 'কুসুমাস্ত্র', 'ফুলশায়ক', 'কুসুমধনু', 'কুসুমকার্মুক' শব্দে। অশরীরী মদন এবং তার ফুলশায়কের যৌগপত্যে যে প্রেমের জন্ম, সে প্রেমকে মানবজীবনের ভেতরে টেনে আনতে অভিলাষী কবি, সময়ের ক্ষত নিরাময়ে। ভারতীয় পুরাণের পাশাপাশি প্রতীচ্য পুরাণের ব্যবহার সীমিত আকারে দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে, 'বর্ষপঞ্চক' কবিতায় রয়েছে পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির উল্লেখ, ফিনিক্সকে তিনি 'চিরায়ু অক্ষয়' বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ পুনর্জন্মের ভেতর দিয়ে পুরাণের এই পাখি পেয়েছে মৃত্যুকে অতিক্রমের স্পর্ধা। *উত্তরফাল্গুনী* কাব্যের 'প্রশ্ন' এবং *সংবর্ত* কাব্যের 'জেসন' কবিতাদ্বয়ে গ্রিক পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিসত্তায় বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রভাবও ক্রিয়াশীল ছিল।[৭]

তিরিশের কবিতাধারায় বুদ্ধদেব বসু প্রেম ও রোমান্টিক চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হন, এই চেতনাকে রূপদানের প্রয়োজনে তিনি পুরাণের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন, কাব্যচর্চার ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পৌরাণিক বোধও শাণিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু কাব্যের শিরোনাম, কবিতার শিরোনাম এবং কাব্যবিষয়ের ভেতরে নানা ভঙ্গিতে পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। *কঙ্কাবতী*, *দময়ন্তী*, *দ্রৌপদীর শাড়ি* কাব্যের শিরোনামে নির্বাচন করেছেন তিনি পুরাণ থেকে। 'কঙ্কাবতী' নামটি লোকজ ঐতিহ্যের

অংশ : 'কঙ্কাবতী নামটির মধ্যেই রয়েছে রূপকথার স্পর্শ, এভাবে দেশজ লোকসাহিত্যের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে তার নিবিড় যোগ' (ত্রিপাঠী, ১৯৫৮ : ৭৯)। 'প্রেমিক', সেরেনাদ', 'কঙ্কাবতী' এবং 'রূপকথা' কবিতায় কঙ্কা অর্থাৎ কঙ্কাবতীর নাম পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হতে দেখা যায়, কঙ্কাবতী নামের পুনরাবৃত্তি-প্রবণতার ভেতর দিয়ে কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে বৈষ্ণব কবিতার নাম-জপের বৈশিষ্ট্য। দময়ন্তী এবং দ্রৌপদী—এ দুটি নারী চরিত্র ভারতীয় পুরাণ থেকে সংগৃহীত। তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে দময়ন্তী, পরাশর মুনি এবং অর্জুনের পুরাণকল্প। তিনি মানবীয় যৌবনের পুনরাবর্তন এবং প্রেমের জয় চিত্রিত করেছেন *দময়ন্তী* কাব্যের 'দময়ন্তী' এবং 'দময়ন্তী ও নল' কবিতায়। পরাশর মুনি ও ধীবর-কন্যা সত্যবতীর পুরাণ চিত্রায়িত হয়েছে 'উদ্বাস্তু' (*দ্রৌপদীর শাড়ি*) এবং 'আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১' (*যে আঁধার আলোর অধিক*) কবিতাদ্বয়ে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ভারতীয় পুরাণের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব হিসেবে স্বীকৃত অর্জুন নতুন প্রত্যয়দীপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ অর্জুনের স্বভাবধর্ম রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* অথবা বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি' কবিতার অর্জুনের চেয়ে স্বতন্ত্র; অর্জুন কবিসত্তার প্রতীক হিসেবে রূপ লাভ করেছে বুদ্ধদেবের হাতে : 'প্রাচীন পৌরাণিক গ্রীক বীর অডিসিয়াস যেমন ফিরে এসেছে আধুনিক জেমস জয়েসের উপন্যাসে—মধ্যবিত্ত নায়কের প্রতিরূপকে, অর্জুনও তেমনি মধ্যবিত্ত কবির প্রতিরূপকে উপস্থিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়' (সাদিক, ১৯৯৩ : ৯২)। মধ্যবিত্ত কবির দ্বিধাকে অর্জুনের সত্তায় উদ্ভাসিত করেন বুদ্ধদেব বসু :

> ...আমার
> পৌঁছবার তৃপ্তি নেই, আছে নিত্য-আরব্ধ যাত্রার
> আবর্তন; তাই আমি বনবাসে, নির্বাসনে, ছদ্মবেশে
> ঘুরেছি দ্বাদশ দ্বীপ ইন্দ্র, হর, বরুণের দেশে;
> করেছি অবগাহন সব তীর্থে;
>
> ('শিল্পীর উত্তর', *যে আঁধার আলোর অধিক*)

'বহুমুখী প্রতিভা' ও 'অর্জুনের প্রতি-কোনো নামহীনা' (*যে আঁধার আলোর অধিক*), 'অসম্ভবের গান' (*শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*) এবং 'রোদনরূপসী' (*মরচে-পড়া পেরেকের গান*) কবিতাসমূহে অর্জুনের পৌরাণিক প্রসঙ্গকে উপজীব্য করেছেন কবি। এছাড়া অর্ফিয়ুস ('অমিতার প্রেম', *বন্দীর বন্দনা*), আফ্রোদিতি ('নতুন পাতা', *নতুন পাতা*), হেলেন ('কবিতা', *কঙ্কাবতী*), ইকারুস ('ইকারুস', *মরচে-পড়া পেরেকের গান*) চরিত্রসমূহকে সংগ্রহ করেছেন গ্রিক পুরাণ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের মতোই চেতনাগতভাবে বুদ্ধদেব বসু যতটা স্বদেশমুখী ছিলেন, কবিতার সঙ্গে তার সহযোগ ততটা ছিল না। তিনি কবিতায় সমকালের সমাজবাস্তবতা ও রাজনৈতিক চালচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে ছিলেন সতর্ক। কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো স্বতন্ত্র আদর্শ অনুসরণ করতেন, সে আদর্শানুযায়ী তিনি কবি এবং সমাজ-পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে ভেদরেখা টেনে দিয়েছিলেন। তিনি সচেতনভাবেই কবিতার শিল্প-আঙ্গিক থেকে বস্তুবিশ্বকে আলাদা করে রেখেছিলেন, এজন্য তাঁকে 'পলায়নপর' বলে অভিযুক্ত করা হয়, স্বদেশের সুসময় এবং সমাজ-পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, কিন্তু কবিতাকে সেই দায় বহনের বাহন করতে চাননি তিনি।[৮] এতকিছুর পরও তিনি চল্লিশের মন্বন্তরের মতো সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাত থেকে কবিতাকে মুক্ত রাখতে পারেননি, তারই রেখাপাত দেখা যায় *দময়ন্তী* কাব্যের 'বিরহ' শিরোনামের কবিতায়, বুদ্ধদেব বসু উপলব্ধি করেছিলেন তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ মৃত্যুমুখী সভ্যতারই কারসাজি।

তিরিশের আধুনিকতাকে চেতনায় লালন করা কবি বিষ্ণু দে তিরিশের অন্যান্য কবির তুলনায় স্বতন্ত্র। বুদ্ধদেব বসু কলাকৈবল্যবাদকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং সমাজ-পরিবর্তনের দায় চাপিয়েছিলেন রাজনৈতিকদের কাঁধে, অন্যদিকে বিষ্ণু দে'র কবিতার ভেতরে উজ্জ্বল প্রেরণা হিসেবে সবসময় সক্রিয় থেকেছে রাজনীতি। স্বদেশকে তিনি দেখেছেন আদর্শগত এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁর কবিতার ভেতরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বিপ্লবী চেতনা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্বসংকট, নগরজীবন ও যন্ত্রশাসিত সভ্যতা, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, দাঙ্গা এবং মন্বন্তর। তবে, এতসব বিষয়ের ভেতর তাঁর প্রধানতম কাব্যপ্রেরণা ছিল বিপ্লবী চেতনা। সাম্রাজ্যবাদী অপচক্রের প্রভাবে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দুর্ভিক্ষ তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে, তিনি তাঁর চৈতন্যের প্রবল প্রতিরোধশক্তিকে কবিতায় রূপান্তর করেছেন, সেই সূত্রে তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে স্বদেশ ও সমকাল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ সম্পন্ন হলে মুক্তির আনন্দ তাঁর কবিচৈতন্যে সঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই তিনি স্বদেশের নানা অনাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চারণ করেন : 'এ নরকে,/ মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই' ('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত', *স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত*)। উপনিবেশ-পরবর্তী বিশৃঙ্খলাকে নির্দেশ করে বলেছেন : 'গ্রাম কি বোঝে না আজও, মনে প্রাণে মেরে দিয়ে ভাতে/ উধাও ইংরেজি ঘোড়া রেখে গেছে হাজার সহিস' ('অভিন্ন স্বস্তিতে', *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত*)।

বিষ্ণু দে বাংলা কবিতাকে কালগত এবং ভৌগোলিকভাবে বহুদূর প্রসারিত করেছিলেন, তাঁর সেই সম্প্রসারিত কাব্যচিন্তার ভেতরে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের নানা প্রসঙ্গ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তিরিশের

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তাঁর কবিতাতেই পুরাণের সবচেয়ে ব্যাপক ও বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়। তিনি প্রাচ্য, প্রতীচ্য, লোকপুরাণ ও লোক-ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন আধুনিক জীবন-জটিলতার গভীরে। পুরাণ ও লোক-ঐতিহ্যের ব্যবহার তিনি করেছিলেন সচেতনভাবে—শিকড়শূন্য সভ্যতাকে শিকড়-সন্নিবদ্ধ করার আন্তরিক প্রত্যাশায়। বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম এবং কবিতার শিরোনামে যুগপৎভাবে ব্যবহার করেছেন পৌরাণিক অনুষঙ্গ। *উর্বশী ও আর্টেমিস* কবিতার শিরোনামে ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণের মিথস্ক্রিয়া লক্ষণীয়, *সাত ভাই চম্পা* কাব্যের শিরোনামটি তিনি সংগ্রহ করেছেন বাংলার লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রূপকথা থেকে। বিষ্ণু দে'র কবিতায় পুরাণের নানামাত্রিক ব্যবহার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বক্তব্যকে আরও গভীরতর ব্যঞ্জনা দানের অভিপ্রায়ে :

ক. পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল, ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য তার!
('পদধ্বনি', *পূর্বলেখ*)

খ. রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেডিসের মতো
হৃদয় ধরেছে চেপে।
('ওফেলিয়া', *চোরাবালি*)

গ. নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে,
তৈরি হাতে নিদ্রহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, উষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?
('মৌভোগ', *সন্দ্বীপের চর*)

প্রাচ্য, প্রতীচ্য এবং লোকপুরাণের সমন্বয়ে বিষ্ণু দে'র কাব্য ধারণ করেছে আধুনিক যুগ ও ব্যক্তির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-নৈরাশ্য, অস্থিরতা ও বিকারকে যা শেষাবধি সমষ্টির চৈতন্যে সমাহিত, সমাজ-পরিবর্তনে সংকল্পবদ্ধ : 'পৌরাণিক কাহিনীর প্রতীকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ আধুনিক কাব্যের, বিশেষত বিষ্ণু দে-র কাব্যের, একটি রীতি' (ত্রিপাঠী, ১৯৫৮ : ২৫৯)। আর্টেমিস, হিপোলিটাস, স্যার্সি, এথেনা, টাইরেসিয়াস এবং উর্বশী, যযাতি, অর্জুন, সুভদ্রা, বজ্রপাণি প্রমুখ চরিত্রের সংমিশ্রণে বিষ্ণু দে'র পৌরাণিক চৈতন্য হয়ে উঠেছে বিশ্ববিস্তারী। অন্যদিকে লালকমল, নীলকমল, সাত ভাই চম্পা এবং বারমাস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা তাঁর ঐতিহ্য-সন্ধানী উদার কবিমানসের

পরিচায়ক। বিষ্ণু দে'র কবিচৈতন্যে স্বদেশ স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে উদ্ভাসিত, তাঁর স্বদেশভাবনা সমাজ-পরিবর্তনেরই নামান্তর, এ কারণে তাঁর কবিতা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সারশূন্যতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষের ভেতরে ছড়িয়েছে বিপ্লবের স্বপ্নবীজ এবং নির্মাণ করেছে বিপ্লবোত্তর সমাজ তথা স্বদেশের রূপকল্প।

অমিয় চক্রবর্তী তিরিশের আরেক আধুনিক কবি, বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ প্রবণতা। স্বদেশে অবস্থানকালে দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং মানবতার বিপর্যয় সম্পর্কে তিনি যেমন অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালের প্রবাসজীবনে ইউরোপের সমাজ-পটভূমিতে ছিন্নমূল মানুষের আর্তনাদ তাঁর চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিরিশের অন্যান্য আধুনিক কবির মতো অমিয় চক্রবর্তী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এ কারণে তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অন্নহীন মানুষের আর্তনাদ : 'রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘুরে ওঠে/ অন্ন দাও' ('অন্ন দাও', *পারাপার*)। এই মন্বন্তর সাম্রাজ্যবাদের কালো শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট, সে বিষয়টি উপলব্ধি করে তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কসবাদের সমালোচনা করেছেন, গান্ধীবাদে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আস্থাশীল হতে দেখা যায়, অহিংস চেতনার রসায়ন থেকে বলেছিলেন : 'পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা-শোক/ মাথা নিচু করব না কোটি লোক' ('সত্যাগ্রহ', *পারাপার*)। অমিয় চক্রবর্তীর ভেতর দিয়ে তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবদের যাত্রা শেষ হয়। তিরিশের শেষ ভাগে সমর সেন আবির্ভূত হন বাংলা কবিতায়; মার্কসবাদ, মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা এবং কলকাতার নাগরিক জীবন তাঁর কাব্যসৃষ্টির মৌল প্রেরণা, এই প্রেরণাকে রূপদানের উপকরণ হিসেবে কবিতায় এসেছে ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং পুরাণ-প্রসঙ্গ। তিনি কাব্যাদর্শের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে নজরুলের প্রতি অধিক আকর্ষণ বোধ করেছেন : 'রাজনীতিতে তখন গরম হাওয়া রবীন্দ্রনাথকে মনে হতো জোলো। ফৌজি কবি যিনি জেল খেটেছেন, যাঁর কয়েকটি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে—অর্থাৎ নজরুল—আমাদের বিপ্লবী নায়ক ছিলেন' (সেন, ১৯৭৮ : ১২৭)।[৯] সমর সেনের রবীন্দ্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির পেছনে তাঁর পারিবারিক পরিবেশও প্রভাব বিস্তার করেছে। পারিবারিক গণ্ডিতে তিনি মার্কসবাদী চেতনার সঙ্গে পরিচিত হন, ফলে পরিণত বয়সে ভারতবর্ষের পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো বিষয়গুলোকে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাধান করতে চেয়েছেন। স্বদেশমুক্তির লড়াইকে পুঁজিবাদের দাপট থেকে মুক্তির লড়াইয়ের সঙ্গে একীকরণ করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মন্ত্র তিনি তুলে দেন কৃষক-শ্রমিকের কণ্ঠে :

যদি চায় হিন্দুস্থান লোলুপ জাপান
তবে জবাব তাদের হাতে, এদেশ যাদের,
যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়,
...কারখানার কলে যারা দধিচীর হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে।

('খোলা চিঠি', *সমর সেনের কবিতা*)

ভারতবর্ষের যে ইতহাসচিত্র সমর সেনের কবিতায় চিত্রিত হতে দেখা যায় তা শ্রেণিচেতনা-শাসিত, বঞ্চনা-বিক্ষুব্ধ : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস সমর সেনের কাছে খুব গৌরবময় কিছু ছিল না। সেই ইতিহাস যুগ যুগ ধরে অগণিত খেটে খাওয়া মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় শোষকের অত্যাচারের কাহিনী' (বাগচী, ১৯৮৮ : ৪২)। শ্রেণিসচেতনতার পাশাপাশি তাঁর কবিতায় তেতাল্লিশের মন্বন্তর-শাসিত দুঃসময়ের স্বদেশ এবং ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিক্ষুব্ধ চিত্র রূপায়িত হয়েছে : 'আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ/ লঙরের সামনে অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে ব'সে' ('ক্রান্তি', *সমর সেনের কবিতা*)। বৃটিশ রাজত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের ভূমিকাকে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ভয়াবহ দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির চেষ্টা দূরাগত হওয়ায় মৃত্যুর ভেতর দিয়ে তিনি দেখেছেন মানবসত্তার অভেদ রূপ : 'ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—/ বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান' ('জন্মদিনে', *সমর সেনের কবিতা*)।

সমর সেনের কবিতায় পুরাণ স্বতন্ত্র কোন চারিত্র্য নিয়ে বিকশিত হয়নি, বণিকসভ্যতা, পুঁজিবাদের দাপট, মধ্যবিত্তের দ্বিচারী স্বভাব এবং শোষিত মানুষের অধিকার-রক্ষার লড়াইয়ের ভেতরে পুঞ্জীভূত হয়েছে তাঁর পৌরাণিক চেতনা। ভারতীয় পুরাণে উর্বশীর প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরে বারবার এসেছে, ধনিকতন্ত্রে পুঁজিসর্বস্ব জীবনভাবনা, ভোগবাদ এবং বণিকসভ্যতার প্রতীকায়নে তিনি উর্বশী চরিত্রটিকে ব্যবহার করেছেন। অন্ধ সময়কে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের রূপকল্পে দেখেছেন :

তাই ঘরে ব'সে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন

সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।

('একটি বুদ্ধিজীবী', *সমর সেনের কবিতা*)

সমকালের মার্কসবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত 'নানা কথা' শিরোনামের দীর্ঘ কবিতায় ধনতন্ত্রকে তিনি আক্রমণ করেন এবং ইতিহাসচেতনার সংমিশ্রণের উচ্চারণ করেন : 'জানি ওরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,/ গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ।' বঞ্চনা এবং শোষণের ইতিহাস একা বেনিয়া ইংরেজ তৈরি করেনি, বিভীষণরূপী পুঁজিবাদীদের সমর্থনে সে ইতিহাস পূর্ণতা পেয়েছে : 'স্বদেশে বিভীষণ ধরে গুপ্তঘাতী হাতিয়ার,/ ক্ষাত্রবীর্যের আত্মম্ভরিতায়,/ বিদেশী বর্বর সাজে সভ্যতার বান্দাপরওয়ার' ('বসন্ত', *সমর সেনের কবিতায়*)। স্বদেশকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয় শোষণের চক্রান্ত, বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাঁকে বাঁকে শোষণ, সুবিধাবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতায় মদদ যুগিয়েছে যেসব চরিত্র, তারা ঘুরেফিরে আসে সমর সেনের কবিতায় : 'মীর জাফরী বদরক্ত আবার অন্তঃশীলা' অথবা 'দেখেছি দেশের দুর্যোগে/ কি উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ু দত্ত করে' ('গৃহস্থবিলাপ', *সমর সেনের কবিতা*)। বিপ্লবী চেতনার ভেতরে সবসময় অঙ্কুরিত হয় আশাবাদের বীজ, মার্কসবাদী কবি হিসেবে সমর সেনের ক্ষেত্রেও ব্যত্যয় ঘটেনি, দুঃসময় উত্তরণের প্রত্যাশা তিনি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন পুরাণ-অনুষঙ্গ অবলম্বনে : 'শেষ পর্যন্ত ইতিহাস আমাদের দিকে;/ সেই ঐশী ইতিহাসশক্তির মায়ায়/ লেজের জটিল জাল দেখি রাবণের গলায়' ('আত্মসমালোচনা', *সমর সেনের কবিতা*)। 'আত্মসমালোচনা' কবিতাটির ভাব *রামায়ণের* 'লঙ্কাকাণ্ড'কে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত; এছাড়া প্রতীচ্য পুরাণ থেকে ফিনিক্স পাখির পুরাণকল্প ব্যবহার করেছেন আশাবাদে উদ্দীপিত হয়ে : 'এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব/ যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে,/ প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে' ('বসন্ত', *সমর সেনের কবিতা*)। তিরিশের দশকের শেষ ভাগে সমাজবাদী সাহিত্যের ধারায় আরও দু'জন মার্কসবাদী কবির আবির্ভাব ঘটে—সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। সমর সেন আদর্শগতভাবে মার্কসবাদে আস্থাশীল থেকেছেন, অন্যদিকে সুভাষ ও সুকান্ত কবিতাচর্চার পাশাপাশি রাজনীতিতেও ছিলেন সক্রিয়।

তিরিশের দশকের কাব্য-অঙ্গীকার সঙ্গী করে চল্লিশের দশকের যাত্রা শুরু। আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা, যুগসংকট, মার্কসবাদী চেতনা এবং যুদ্ধ-দাঙ্গা ও মহামারী তিরিশের কবিতায় এক নেতিবাচক জীবনবোধের জন্ম দেয়, চল্লিশের কবিতায় তিরিশের কাব্যাদর্শের বিমিশ্রণ ঘটেছে। আধুনিক জীবনবোধে পরিস্নাত হয়ে কবিতাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এ দশকে পশ্চাদপদ মুসলিম কবিসমাজ,

তাঁরা কবিসত্তায় বহন করেছিলেন মূলত তিরিশি উত্তরাধিকার : 'বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী কাব্যচর্চার সমান্তরালে চল্লিশের নবোদ্ভূত কবিবৃন্দ আধুনিক জীবনচেতনার মর্মমূলস্পর্শী কাব্যধারার জন্ম দিলেন—যা বাংলা কবিতার মূল ধারার সঙ্গে সংলগ্ন। তিরিশের পাশ্চাত্য পন্থার সাথে চল্লিশের প্রগতিবাদী নবধারার অঙ্গীকার এঁদের মধ্যে একটা সমন্বয়ী বিষয় ও আঙ্গিকচেতনার জন্ম দিয়েছিল' (খান, ২০০২ : ৯)। সমন্বয়ের এই ধারাতে চল্লিশের কবিতায় ফররুখ আহমদের আবির্ভাব, ঐতিহ্যানুসরণ এবং প্রগতিশীল চেতনার সম্মিলনে তাঁর *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যগ্রন্থের বিষয় বিন্যস্ত : 'দূরপ্রাচ্যের ঐতিহ্যলোক থেকে ভবিষ্যতের স্বপ্নসম্ভাবনা আহরণ করেছেন কবি। মরু-পুরাণের উদ্দাম গতিরেখা বাংলা কবিতার বিষয়বিন্যাসে যে বৈচিত্র্য এনেছে, তা যেমন অতুলনীয়, তেমনি স্বাতন্ত্র্যসূচক তাঁর ইতিহাসমনস্কতা' (খান, ২০০২ : ৮৫)।

বৃটিশবিরোধী আন্দোলন যখন হিন্দু-মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র এবং ভারত-ভাগের পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়-প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতায় ফররুখ আহমদ এবং আহসান হাবীব আত্মপ্রকাশ করেন। ফররুখ আহমদ অতীত ঐতিহ্য থেকে কাব্যবিষয় সংগ্রহ করে বর্তমান কালের ভেতরে তার পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন করেছেন, ইতিহাস, ঐতিহ্যচেতনা এবং সমকাল সচেতনতা তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত মানুষের অসহায় আর্তনাদ তাঁর *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যে উঠে এসেছে, এ কাব্যে তাঁর সমাজ-সচেতন কবিসত্তাটিও আত্মপ্রকাশ করেছে : 'ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,/ মানুষের হার দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলাঘর;' ('লাশ', *সাত সাগরের মাঝি*)—এ উচ্চারণের ভেতর মানবতাবিরোধী সভ্যতাকে চিহ্নিত করেছেন, সমকালীন দুর্ভিক্ষ এই মানবসভ্যতারই এক পরিকল্পিত আয়োজন। 'লাশ' এবং 'আউলাদ' কবিতাদ্বয় নির্মিত হয়েছে একই ধরনের বক্তব্য দিয়ে, সভ্যতার নগ্ন রূপ উন্মোচন করে বঞ্চিত মানুষের পক্ষে তাঁর কবিতা কথা বলেছে : 'দল বেঁধে চলিছে শিশুরা মড়কের পথে,/ কুৎসিত কুটিল প্রান্তে অন্ধকার শড়কে বিপথে/ যেখানে প্রত্যেক প্রান্তে আজাজিল পাতিয়াছে ফাঁদ/ তারি পানে, দুর্নিবার টানে চলে আজ মানুষের/ দুর্বল, বিশীর্ণ আউলাদ।' পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যে আজাজিল তার ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ শয়তানে পরিণত হয়, তারই প্ররোচনায় ঘটে পৃথিবীর সব অন্যায়-অপকর্ম, সমকালের বিরূপ পরিস্থিতিকে আজাজিলের পরিকল্পিত ফাঁদ হিসেবে চিহ্নিত করেন কবি। সংকটময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্যে এবং সময়ের ভেতর গতি সঞ্চারের প্রয়োজনে তিনি রূপকথার জগৎ থেকে সংগ্রহ করেছেন কাব্যনায়ক নাবিক সিন্দবাদকে, ঝঞ্ঝার মুখে টিকে থাকাই যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন নেতৃত্বের দায়। তিনি কবিতার বিষয় সংগ্রহ করতে গিয়ে

অতীত ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, তবে অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত করার দক্ষতা তাঁকে এনে দিয়েছিল সার্থক কবির স্বীকৃতি। তাঁর কবিতার অতীত-মুকুরে সমকালীন নানা বিষয় বিম্বিত হয়েছে : 'প্রতিমুহূর্তে তাঁর কবিতার পটভূমি বিস্তৃত হতে হতে স্বদেশ, সমাজ, ব্যক্তি প্রত্যাশার টানাপোড়েন—প্রভৃতি আত্মস্থ বা অতিক্রম করে একটা চিরায়তিক উপলব্ধির মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছে' (খান, ২০০২ : ৮৪)।

চল্লিশের দশকে বাংলা কাব্যাঙ্গনে আরেকটি নাম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তিনি ইতিহাস ও সময়-সচেতন কবি আহসান হাবীব। চল্লিশের দশকের সময়ের চারিত্র্য এমন ছিল যে, সেই সময় পরিধিতে বাস করে কবিকে কাল সচেতন হয়ে উঠতে হয় অনিবার্যভাবে; এ সময় ভাঙাগড়ার এক চূড়ান্ত পর্বের মহড়ার ভেতরে আহসান হাবীবের কবিজীবনের প্রতিষ্ঠা। তাঁর কবিতায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে এক সুগভীর জীবনবোধ, যে জীবনবোধ তিরিশি নঞর্থক জীবনবোধকে অস্বীকার করে শুনিয়েছিল প্রবল আশাবাদের সুর, কবির প্রত্যয় ছিল দুঃসময়ের ভেতরে সুসময়ের উদ্বোধন : 'প্রতিজ্ঞা আমার/ মুমূর্ষু মানুষে ডেকে জীবনের নতুন আহ্বান জানাবার' ('সাক্ষর', *রাত্রিশেষ*)। *রাত্রিশেষ* কাব্যে যে প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেন, *ছায়াহরিণ* কাব্যে সেই চেতনা পায় পরিণত রূপ। বৈরী সময়ের ভেতরে তাঁর 'আশায় বসতি', এ কারণে দুঃসময়ের ভেতরে বসেও তাঁর বিমুগ্ধ উচ্চারণ : 'মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই/ দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের/ আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে' ('তোমাতে অমর আমি', *ছায়া হরিণ*)। আহসান হাবীবের প্রখর ইতিহাসচেতনার সঙ্গে প্রবল বিমিশ্রণ ঘটেছিল স্বদেশ ও সমকাল ভাবনার, তাঁর কাব্যের প্রতীকী নামকরণের অর্থব্যঞ্জনার ভেতরে সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর অন্বিষ্ট কাব্যসাধনার : 'আহসান হাবীবের স্বদেশব্রত রূপটি, বাংলা কাব্যধারার দিকস্পর্শী রূপটি অনিবার্যরূপে যুক্ত হয় তাঁর পঙক্তিমালায়। *ছায়াহরিণ* আসলে স্বপ্নের ছায়া, অনুষঙ্গী-অনুগামী মনন আর পরিশুদ্ধ চেতনার ছায়া;...পূর্ব-বাংলার রূপটিও এর মধ্যে দৃশ্যমান, আমাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘরও এ হরিণ' (ইকবাল, ২০০৮ : ১২০)। দেশবিভাগ-পরবর্তী কালে ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যবৃত্তে স্থানু হয়ে পড়েন, যুগমানসের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয় তাঁর কবিতা; আহসান হাবীব বিভাগোত্তরকালেও তাঁর কাব্যসাধনায় সচল ছিলেন, অপরিবর্তিত ছিল তাঁর কাব্যের আদর্শ ও গতি। স্বদেশভাবনায় অবিচল কবি 'স্বাধীনতা'কে কলমের মুখে ধরতে গিয়ে উপলব্ধি করেন—স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে এক ব্যাপক প্রত্যয়, জনজীবন ও ভূ-প্রকৃতিতে এবং মানুষের চেতনাজুড়ে এর বিস্তার : 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে/ আমরা সোচ্চার হয়ে আকাশকে সচকিত করে তুলি/ আর হাওয়ায় ছড়াই কিছু নতুন গোলাপ'

('স্বাধীনতা', *মেঘ বলে চৈত্রে যাব*)। তিরিশ ও চল্লিশের অন্যান্য কবির মতো আহসান হাবীবের কাব্য-চারিত্র্যে সমকালের অভিঘাত দানা বেঁধেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ভিন্ন আঙ্গিক ও ভাষার গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত কবিতা 'ছহি জঙ্গেনামা'য় : 'দেখেছি কেমন করে বাঁচাতে ইজ্জত/ ঝি-বৌ নিয়েছে বেছে মওতের পথ' (*ছায়াহরিণ*)। হুজ্জত সরদারের জবানীতে, আরবি-ফারসি শব্দের সংমিশ্রণে নির্মিত কবিতাটিতে দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়ায় সম্বলহীন মানুষের আহাজারি ফুটে উঠেছে। এছাড়া ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব নিয়ে তাঁর 'ইতিহাস বিন্যাসের পথে' এবং সত্তরের জলোচ্ছ্বাস নিয়ে 'ক্ষমাই প্রার্থনা' কবিতাদ্বয় নির্মিত।

আহসান হাবীবের কবিতায় পাওয়া যায় আশাবাদ, প্রকৃতিচেতনা, কালিক সংকট, স্বদেশের প্রতি শর্তহীন অনুরাগ এবং স্বদেশের বঞ্চনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি, সেইসঙ্গে তিনি পুরাণ-সচেতন। ভারতীয় পুরাণ, গ্রিক পুরাণ এবং রূপকথার অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় প্রভাব বিস্তার করেছে। *সারা দুপুর* কাব্যের অন্তর্গত 'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা' কবিতাটি গ্রিক মিথের রাজা মিডাসকে উপজীব্য করে রচিত, স্বর্ণালী স্পর্শ দিয়ে রাজা মিডাস সবকিছু সোনায় পরিণত করতে পারতেন। এ কবিতায় তিনি দেবতা দিউনিসাসের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন, যিনি 'বাক্‌কাস্' নামেও পরিচিত ছিলেন :

> কৈশোরের আরাধনা কখন যৌবনে
> বিলিয়ে নিঃশেষে কবে সুচতুর বরদাতা বাক্‌কাস্-এর পায়ে
> প্রমত্ত মিডাস আমি দেহের প্রাণের
> সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
> কুড়াই সোনা দিন রাত্রি।
>
> ('প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা', *সারা দুপুর*)

পৌরাণিক চৈতন্যের আলোকে বর্তমান জীবন-ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন কবি। আহসান হাবীবের *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যগ্রন্থের নামকরণের ভেতরে রয়েছে পৌরাণিক উপলব্ধি : 'যে আদিম বস্তুখণ্ডের সম্মিলন বা সংঘাতে অন্ধকার অকর্ষিত পৃথিবী প্রথম আলোকোজ্জল ও উৎপাদনশীল হলো, যার মধ্যে দিয়ে সূচিত হলো সভ্যতার প্রথম সূর্যোদয়—পরিণত কবি সেই উৎলোক থেকে কবিতার নবতর বিষয় আহরণ করেছেন। ইতিহাসের ধাবমানতার মধ্যে পৌরাণিক উৎসের অনুপুঙ্খ অন্তর্বয়নে কবিচৈতন্য এক সমগ্রতার বেলাভূমিতে উপনীত হয়েছে' (খান, ২০০২ : ৮২)। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের 'গন্তব্য ইথাকা' কবিতায় কবির অন্তর্গত উপলব্ধির স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়, ত্রস্ত সমকাল ও স্বদেশ রেখে কবির গন্তব্য হয় পৌরাণিক ইথাকা, যে ইথাকা একসময় ভুগেছে স্বাধীনতা

সংকটে : 'সারারাত স্মৃতির ভেতরে থাকে ভাসমান মাস্তুল এবং/ সারারাত বুকের ভেতরে তবু, স্মৃতির ভেতরে/ পেনিলোপি পেনিলোপি, ইথাকা ইথাকা!'

আহসান হাবীব তাঁর কাব্যযাত্রার শুরুতেই সমকালের ভেতরে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মুখ আবিষ্কার করেন, তিনি ভারতীয় পুরাণের 'শকুনির' রূপকল্পে সতর্ক করে দিয়ে বলেন : 'বাস করে শত চানক্যশিশু শকুনির বহু বংশধর/ এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না এখানে বেঁধো না বিরাম ঘর' ('আজকের কবিতা', *রাত্রিশেষ*)। বিপ্লবী চেতনায় স্নাত হয়ে কবি 'বাঁশরী'কে 'অসি' হওয়ার আহ্বান জানান, অহিংসার পরিবর্তে সশস্ত্র প্রতিরোধ কামনা করেন, কেননা সমকালের আপাত নির্বিরোধ চারিত্রের অন্তরালে পদ্মের ভেতর লুকিয়ে থাকা কেউটের মতোই ষড়যন্ত্রের বাস, তাই '...গৃহে দ্বারে অহিংস বৌদ্ধের তরবারি/ মৃত্তিকার পিপাসায় জ্বলে' ('হে বাঁশরী অসি হও', *রাত্রিশেষ*)। আহসান হাবীবের কবিতায় লোকজ ঐতিহ্যের প্রয়োগও লক্ষণীয়, *রাত্রিশেষ* কাব্যের 'বিয়ে' কবিতার সমাপ্তি তিনি টেনেছেন রূপকথার ঢঙ্গে : মুড়োলো নটের গাছ/ কথাটি ফুরোলো।' এছাড়া 'হে আকাশ হে অরণ্য' (*রাত্রিশেষ*), *সারা দুপুর* কাব্যের 'উত্তীর্ণ প্রহরের গান', 'তারা দুজন', অভ্যাগত', তোমাকে মৃত জেনে' কবিতাসমূহে পুরাণ ও রূপকথার নানা অনুষঙ্গ সহযোগে বক্তব্য নির্মাণ করেছেন কবি।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলা কাব্যধারা উভয়েই দেশবিভাগের প্রবল আলোড়নে উত্তাল ছিল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর স্বতন্ত্র কাব্যধারার রূপরেখা প্রনয়ণ হয়ে পড়ে অনিবার্য, কবিতার মানচিত্র তৈরি করতে গিয়ে পূর্ব বাংলার কবিতা যাত্রা শুরুর কালে হয়ে পড়ে ত্রিধাবিভক্ত : তিরিশের আধুনিক কবিতার অনুশাসনে বিকশিত ধারা, সমাজ-সচেতন কবিতার ধারা এবং পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ-প্রভাবিত ধারা। শাসকদের দ্বিচারিতায়, উপনিবেশ পত্তনের লালসামাখা রাজনীতির কারণে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ-তাড়িত কবিতার ধারাটি পূর্ব বাংলার মূল কবিতাধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি, কারণ পাকিস্তান নামক শোষণমূলক রাষ্ট্রকাঠামোটি পূর্ব বাংলার গণমানুষ ও প্রগতিশীল কবি-শিল্পীর কাছে প্রহসনমূলক চারিত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তিরিশের আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি করে পূর্ব বাংলার কবিতার মুক্তি ঘটেছিল, এই ধারাতেই বিকশিত হয়েছিল স্বদেশভাবনামূলক কবিতা। বাংলা কবিতার মূল ধারাটি বিকাশের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল *নতুন কবিতা* এবং *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলন, এ দু'টি কাব্য সংকলন পূর্ব বাংলার আধুনিক কবিতার উন্মেষে রেখেছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা। এখানে যে কবিতাগুলো ছাপা হয়েছিল তার ভেতর থেকে উঠে আসে উজ্জ্বল কিছু মুখ, পঞ্চাশের দশকে কবিতার উন্মেষকালে তাঁদের প্রতিনিধিত্বশীল

ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের কবিতা যেহেতু নির্মিতব্য কালের কবিতা, এ কারণে এসব কবিতা এবং কবির মূল্যায়ন সেই কালের প্রেক্ষাপটে হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। পঞ্চাশের কবিতার মূলধারায় যাঁরা আবির্ভূত হন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসান হাফিজুর রহমান এবং শামসুর রাহমান।

হাসান হাফিজুর রহমান এবং শামসুর রাহমান এমন এক ক্রান্তিলগ্নে বাংলা কবিতার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন, যখন কবিতা রচনার পাশাপাশি কবিতার জন্য নতুন পথ নির্মাণের দায়ও তাঁদের কাঁধে ছিল। ভাষা-আন্দোলনের উত্তেজনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান, সর্বোপরি স্বাধীন স্বদেশ-লাভের আকাঙ্ক্ষার ভেতরে পঞ্চাশ ও ষাটের কবিতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, পরাধীনতার ছদ্ম-প্রতাপ মুক্ত হয়ে স্বপ্নের স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রত্যাশা অধিকাংশ কবির কলমকে সচল রেখেছিল প্রবল উদ্দীপনায়। হাসান হাফিজুর রহমান শুরুতেই তাঁর কাব্যাদর্শ নির্ধারণ করেছিলেন—স্বদেশপ্রেমের সাধনা ছিল তাঁর কবিজীবনের প্রধান প্রত্যয়, তাঁর হাতেই একুশের সংকলন প্রকাশিত হয়। *বিমুখ প্রান্তর* কাব্যের 'অমর একুশে' কবিতায় তিনি ভাষা-শহীদদের প্রতি প্রগাঢ় মমতায়-শ্রদ্ধায় নিবেদন করেছিলেন এই পঙক্তিমালা : 'আম্মা তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?' দেশবিভাগোত্তর স্বদেশের ভেতরের রাজনীতি তাঁর উপলব্ধিতে জন্ম দিল স্বদেশ নামক এমন একটি ধারণার যেখানে প্রান্তর হয়ে আছে 'বিমুখ', বিপরীত সময়ের ভেতরে বসে তাঁর কাব্যসাধনা। যদিও দুঃশাসনে আক্রান্ত স্বদেশ, তবু বারবার এ দেশ জিতে নিয়েছে বিজয়ীর শিরোপা, স্বদেশের সেই রূপ স্মরণ করে কবি বলেন : 'বিপদে বিপন্ন নয় দেখি মুখ অজেয় অপার/ বরাভয়ে শত্রুজয়ী অকাতর স্বদেশ আমার' ('বিপদে বিপন্ন নও', *অন্তিম শরের মতো*)। হাসান হাফিজুর রহমান কাব্যচর্চার শুরু থেকেই স্বদেশ-সমকাল সচেতন, বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সম্পৃক্তি, কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গও তিনি ব্যবহার করেছেন নিপূণ হাতে। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় রয়েছে ভারতীয় পুরাণ, গ্রিক পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের ব্যবহার। ভারতীয় পুরাণ থেকে অর্জুন, ধৃতরাষ্ট্র, দধিচি, গ্রিক পুরাণ থেকে থেসিউস, ওডেসিউস এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য থেকে ফেরাউন এবং নূহ নবীর প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যবিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এছাড় ভারতীয় পুরাণের সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক অনুষঙ্গও তিনি ব্যবহার করেছেন কবিতায়।

হাসান হাফিজুর রহমান প্রবলভাবে স্বদেশ ও সমাজসচেতন কবি বলেই তাঁর সমকালে স্বদেশের প্রান্তরে ঘটে যাওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন তাঁর কবিসত্তাকে আলোড়িত করেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, আন্দোলন পরবর্তীকালে লেখা 'অমর একুশে'

কবিতায় ভাষা শহীদদের হারানোর বেদনা প্রকাশ করেছেন এবং কালের স্বরূপ বোঝাতে ইসলামী ঐতিহ্যের স্বৈরতন্ত্রী শাসক ফেরাউনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন : 'এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ ক'টি বছরের/ ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি' (*বিমুখ প্রান্তর*)। *বিমুখ প্রান্তর* কাব্যের 'স্তব্ধ মুখ' কবিতায় কবিতায় উপমা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করেছেন নূহের প্রসঙ্গ : 'আমার দুই হাত কেবলই নূহের কাসেদ কবুতরের মতো/ আকাশকে ডাকে।' এ কাব্যের 'গোলক ধাঁ ধাঁ' কবিতাটি গ্রিক বীর থেসিউস, মিনোটর এবং গোলক ধাঁধাঁর কাহিনিকে কেন্দ্রে রেখে নির্মিত হয়েছে। গ্রিক কারিগর ডেডেলাস নির্মিত জটিল গোলক ধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল থেসিউসের হাতে ধরা সুতো, স্বদেশের দুঃসময়ে পথ হারিয়ে ফেলা কবি নিরাবলম্ব যেন সুতোহারা থেসিউস: 'হারিয়ে সুতো থেসিউসের/ দুর্ভাবনার মতো/ জানব না ফেরার পথ'। হাসান হাফিজুর রহমান পৌরাণিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে বর্তমানের গভীর সংযোগ সাধনে সক্ষম হয়েছেন, বক্তব্যকে শাণিত করেছেন পৌরাণিক অনুষঙ্গ-সহযোগে : 'একজন আধুনিক কবিকে বিশ্বমিথের উত্তরাধিকার বহন করেই হয়ে উঠতে হয় সৃষ্টিশীল ও বৈচিত্র্যসন্ধানী। হাসান হাফিজুর রহমান বক্তব্যকে অনিবার্যতা দানের প্রয়োজনে মিথ ব্যবহার করেছেন' (খান, ১৯৯৩ : ৯৬)। *ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী* কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি নির্মিত হয়েছে সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে, হলাহল ধারণের জন্য প্রতিটি যুগে শিবের আবির্ভাব প্রয়োজন : 'এবার সমুদ্রমন্থনের আগেই সমস্ত কালকূট উঠেছে ভেসে/ নীলকণ্ঠ চাই, নীলকণ্ঠ চাই, নীলকণ্ঠ চাই/ সন্তানেরা ছাড়া হননের শেষ অস্ত্র আকণ্ঠ গিলবে কে আর!' এছাড়া এ কাব্যের 'তোমার অসুখ', *অন্তিম শরের* মতো কাব্যের 'জীবনের ঘণ্টারোল', *বিমুখ প্রান্তর* কাব্যের 'রক্তিম হৃদয় ফুল' কবিতায় ভারতীয় পুরাণের অর্জুন, ধৃতরাষ্ট্র এবং দধিচি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। *আর্ত শব্দাবলী* কাব্যের 'ওডেসিউসের চোখে ন্যসিকা : আমার মনে' কবিতাটির নির্মাণ গ্রিক পুরাণ অবলম্বনে।

পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতার ইতিহাসে পাওয়া যায় আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম : আবদুল গণি হাজারী, আজীজুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ। হাসান হাফিজুর রহমান শামসুর রাহমানের সমসাময়িক কবি, পঞ্চাশের দশকে দু'জনের আত্মপ্রকাশ, সুহৃদ হলেও উভয়ের কাব্যপ্রবণতা স্বতন্ত্র। শামসুর রাহমান স্বদেশভাবনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিলম্বিত কবি। রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট এবং তিরিশের কবিতাধারার মিশ্র প্রভাবে সৃষ্ট তাঁর কবিচৈতন্য, নিজস্বতায় উত্তরণের পূর্বে অনুকরণের দ্বিধার ভেতরে থমকে গিয়েছিল তাঁর কবিকর্তব্যবোধ, কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাস করে যে কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন, কালের আঘাতে ভেঙ্গে গেল সেই বিষয়পট, নতুন করে তিনি কাব্যবিষয় নিয়ে ভাবলেন, কবিতার উন্মুল রোমান্টিকতা থেকে

মুখ ফেরালেন স্বদেশের উন্মুখ প্রান্তরের দিকে। তিনি স্বদেশভাবনামূলক যে কবিতাগুলো লিখেছিলেন স্বাধীনতাপূর্ব কালে, সেখানে কোথাও পূর্ব বাংলাকে স্বদেশের মর্যাদা দেননি। কারণ, স্বদেশ হতে হলে একটি ভূখণ্ডের যে মৌলিক শর্তাবলি থাকতে হয়, পাকিস্তানি শাসকেরা সেই মৌল শর্তাবলি লঙ্ঘন করে পূর্ব বাংলাকে পরাধীন রাষ্টের প্রচ্ছদ দিয়ে আবৃত করে রেখেছিল। শামসুর রাহমান এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, ফলে পূর্ব বাংলা তাঁর জন্মভূমি হলেও স্বদেশের মর্যাদায় উন্নীত হতে তার সময় লেগেছে একাত্তর সাল পর্যন্ত। একাত্তরের ডিসেম্বরে অনেক কিছু হারানোর বেদনায় আপ্লুত কবি ভোলেননি যে 'এতদিনে আমাদের মাতৃভূমি হয়েছে স্বদেশ' ('রক্তাক্ত প্রান্তর', *বন্দি শিবির থেকে*)। শামসুর রাহমান কাব্যচর্চা শুরুর পর অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে স্বদেশ ও সমকাল সচেতন হয়ে ওঠেন, 'নিজ বাসভূমে' কাব্য থেকে শুরু জীবনের সর্বশেষ কবিতা পর্যন্ত স্বদেশ ও সমকালভাবনা থেকে তিনি আর বিচ্যুত হননি।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতায় শামসুর রাহমান আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানাবিধ উত্তরাধিকার নিয়ে, তিনি তিরিশের আধুনিক কবিদের কাব্যাদর্শ এবং এলিয়ট ও বোদলেয়ার দ্বারা সমানভাবে অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁর রোমান্টিক চেতনা নির্মাণে, অন্যদিকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি এবং নাগরিক জীবনবোধ রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি বোদলেয়ারের ও আহসান হাবীবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিরিশ ও বিশ্বকবিতার সংযোগসূত্রে শামসুর রাহমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণের অভিজ্ঞানকে দু'হাতে ব্যবহার করেছিলেন কবিতায়। পুরাণের নানা প্রান্ত ঘুরে তিনি কাব্যবিষয় সংগ্রহ করেছেন, ফলে গ্রিক পুরাণের প্রাধান্য থাকলেও তাঁর কবিতায় ভারতীয় পুরাণ, পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য, বৌদ্ধ পুরাণও বক্তব্য নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পুরাণ ব্যবহারের প্রবণতা বিচারে শামসুর রাহমান তিরিশের কবি বিষ্ণু দে'র উত্তরাধিকারী, বিষ্ণু দে'র মতো শামসুর রাহমানের পুরাণ-অভিজ্ঞান ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ নিয়ে কবিতায় মূর্তিত, সেইসঙ্গে বিষ্ণু দে'র সমন্বয়বাদী পৌরাণিক চেতনার অস্তিত্বও শামসুর রাহমানের কবিতায় পাওয়া যায়।

## টীকা

১. তাঁর 'স্বদেশ' শিরোনামের কবিতায় রয়েছে স্বদেশভাবনার শক্তিময় উপস্থিতি, এ কবিতায় মণিমুক্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে স্বদেশপ্রেমকে তিনি শ্রেষ্ঠ রত্নের বিজয়মালা পরিয়েছেন : 'মিছে মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,/ তার চেয়ে রত্ন নাই আর।'

২. 'সারদামঙ্গল' কাব্যের পঞ্চম সর্গে বিহারীলাল চক্রবর্তী হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার সূত্রে কলকাতাকে 'জন্মভূমি' হিসেবে নির্দেশ করেন এবং হিমালয় সৌন্দর্যপূর্ণ হলেও 'বিজন' গিরি-দেশ হিসেবে প্রতীয়মান হয় কবির উপলব্ধিতে। কলকাতাকে উপলক্ষ করে তিনি বলেছিলেন : 'সুদূর সে কলিকতা আনন্দ-নগরী।...প্রিয় জন্মভূমি তুমি কোথায় এখন!' (সারদামঙ্গল, ১৩৭৫ : ৬৫)

৩. *নজরুলের আবির্ভাব বাংলা কাব্যে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ*, রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র তাঁর কবিতার ভাব-ভাষা, যেখান থেকে তিরিশি কবিরা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রবিদ্রোহের প্রেরণা। তিনি প্রথম মুসলিম আধুনিক কবি যিনি স্বকীয়তা নিয়ে কাব্যে আবির্ভূত হন। তাঁর কবিতাতে অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও সমাজতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, জাতীয়তাবাদী চেতনা-গঠনে এবং পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ার মতো।

৪. 'স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের বিভিন্ন ফাইল ও আইন-সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, বহু লেখা বাজেয়াপ্ত হলেও মাত্র দু'টি ক্ষেত্রে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। প্রথমে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আগমনী' কবিতাটির জন্য। তারপর এই 'প্রলয় শিখা' পুস্তকটির জন্য' (কর, ১৯৮৩ : ৩১)।

৫. 'ভূমিকা', *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬২।

৬. এছাড়া 'অতনুর ফুলশায়ক বক্ষে পশিয়া' ('পুনরাবৃত্তি, প্রাক্তনী, *সংবর্ত*), মদনধনুর শেষ টংকার/ জীবনবীণায় দিল ঝংকার, ('বাৎসরিক', *তন্বী*), 'অতনুতরে করেনি রচনা সে/ ত্রিবলি সিঁড়ি কুটিল কটিতটে, সতত তবু ক্ষামার আশেপাশে/ টংকারিত কুসুমধনু রটে' ('সংশয়', *উত্তরফাল্গুনী*), 'কালের কাছে অতনু পরাজিত' (*উত্তরফাল্গুনী*), 'আসিবে দুরন্ত প্রেম, টংকারিত কুসুমকার্মুকে/ অলক্ষ্যসন্ধানী শর সংস্থাপিয়া চপল কৌতুকে/ হানিতে নিখিলব্যাপী দুরারোগ্য, দুর্বিচার ক্ষত?' ('বর্ষপঞ্চক', *ক্রন্দসী*), 'অচিরাত সে-আগুন কামেরে করেছে ভস্মশেষ' (*ক্রন্দসী*)—এসব উচ্চারণে মদন নানা রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত।

৭. 'সুধীন্দ্রনাথের ওপর বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রভাব গভীর' (ত্রিপাঠী, ১৯৫৮ : ২৩)।

৮. 'বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করেন—কাল থেকে কালান্তরে গিয়ে চিরন্তনতার মহিমাপ্রাপ্তিই যে-কোন মহৎ সাহিত্যকর্মের অন্যতম লক্ষণ। সাহিত্য-শিল্পকলা সমকালীন সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হলেও তার পরম অন্বিষ্ট চিরকালীন মহিমা লাভ। তাই উপযোগিতামূলক সাহিত্যকে বুদ্ধদেব কখনোই উঁচুমানের সাহিত্য হিসেবে মেনে নিতে পারেননি' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'ভূমিকা', *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*)।

৯. 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে—মনে হ'লো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী' (বসু, ১৯৮২ : ৭৭)।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# শামসুর রাহমানের মানসগঠন ও জীবনদর্শন

### শৈশব ও কৈশোর

কবিতার সঙ্গে কবির জীবনের যোগসূত্র গভীর, এ কারণে বলা হয়—'একজন প্রকৃত কবির জীবনও কবিতা' (শাহরিয়ার, ২০১১ : ৭৭)। কবির জীবনপ্রবাহের ভেতরে সম্পন্ন হয় তাঁর মানসগঠন, তৈরি হয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাঁর কবিতা নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে কবিকে স্পর্শ করে থাকা জীবন, পারিপার্শ্বিকতা, কালের ভাব ও প্রবণতাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। কাল-বিচারে শামসুর রাহমানের কবিতাচর্চা শুরু দেশবিভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলায় পঞ্চাশের দশকে।[১] তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরোনো ঢাকার ৪৬ নম্বর মাহুতটুলিতে। কবির নানা মুন্সি আফতাব উদ্দিন, তিনি নরসিংদী জেলার পাড়াতলী থেকে এসে নিবাস গড়েছিলেন পুরোনো ঢাকায়। নানা এবং দাদা সহোদর হওয়ার কারণে শামসুর রাহমানের পারিবারিক জীবনের মূলস্রোত দ্বিমুখী নয়, অভিন্ন কেন্দ্রে জড়ানো। বাবা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী[২] এবং মা আমিনা খাতুন। জন্মসূত্রে ঢাকার বাসিন্দা ছিলেন কবি, কিন্তু পৈতৃক সূত্রে পাড়াতলী গ্রামের সঙ্গে গ্রন্থি ছিল আজীবন। পুরোনো ঢাকার মাহুতটুলিতে শৈশব-কৈশোরের বেশিরভাগ সময় কেটেছে তাঁর, মাঝে মাঝে ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসের অভিজ্ঞতাও রয়েছে —বাবার সঙ্গে এক সময় তাঁদের পরিবার ইস্কাটন এলাকায় বাস করেছিল কয়েক বছর, পুরোনো ঢাকার ৩০ নম্বর আশেক লেনে থেকেছেন কিছুদিন, শেষ জীবনে নতুন ঢাকার শ্যামলীতে নিজস্ব বাসায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। নতুন ঢাকার চেয়ে পুরোনো ঢাকার প্রতি তাঁর আন্তরিক টান ছিল বেশি, কারণ এখানে কেটেছিল তাঁর শৈশবের রঙিন দিনগুলো, তিনি মনে করেন 'মানবজীবনে শৈশবই হচ্ছে বেহেস্ত' (শাহরিয়ার, ২০১১ : ১১০)। শৈশবের সেই স্বর্গীয় দিনগুলোকে তিনি উপভোগ করেছেন পুরোনো ঢাকার অলি-গলি, পথ-প্রান্তর আর কর্মময় জনজীবনের ভেতরে। নতুন এবং পুরোনো উভয় ঢাকার তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'কোন্ ঢাকা আমার কাছে অধিক আকর্ষণীয়? নতুন না পুরোনো ঢাকা? আমি বলব পুরোনো ঢাকা' (রাহমান, ২০০২ : ৩৩)। এ অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় জীবনের আকর্ষণে তিনি বাঁধা পড়েছিলেন। পুরোনো ঢাকার মাহুতটুলির এক কোঠাবাড়িতে কবির জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। মাহুতটুলি নামকরণটি হয়েছিল নবাবী আমলে মাহুতদের বসবাসসূত্রে, সেইসঙ্গে কবির অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে ছিল ভিস্তিওয়ালা, বাতিওয়ালার উজ্জ্বল স্মৃতি। আমৃত্যু ঢাকার জল-হাওয়ায় লালিত কবির প্রাণের শহর ছিল ঢাকা—'ঢাকা আমার স্মৃতির শহর, আমার ভালোবাসার শহর' (রাহমান, ২০০২ : ৩৩)। কবির পরিবার নানাদিক থেকে রক্ষণশীল ছিল,

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী কবিকে আজীবন অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর বাবার মধ্যে ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা। উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশেও দাঙ্গার ঘটনা বিরল নয়। কবির বাবা শুধু মৌখিকভাবে অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, কাজের ভেতর দিয়েও একাধিক সময় তাঁর এই চেতনাগত দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। পাড়াতলীতে নির্যাতিত, কোণঠাসা, অসহায় হিন্দুদের রক্ষার জন্য হাতে বন্দুক পর্যন্ত তুলে নিয়েছিলেন। প্রেস ম্যানেজারকে দাঙ্গার সময় দীর্ঘদিন নিজের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রেখেছেন।[৩] অথচ এই মোখলেসুর রহমান আবার বই পাঠ বা কবিতাচর্চার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, শামসুর রাহমান পরবর্তীকালে কবিতায় আদমজী পুরস্কার পাওয়ার ফলে তাঁর কবিজীবনের প্রতি বাবার আস্থা তৈরি হয়। বাবার মতো কবির মা আমিনা বেগমও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী ছিলেন, শামসুর রাহমানের মানবতার মহৎ শিক্ষা শৈশবে মায়ের কর্মকাণ্ড থেকে সম্পন্ন হয়েছে—'আমার মা শৈশবে আমাকে একবার বলেছিলেন, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলো না। মিথ্যা উক্তি যে অন্যায়, অপরাধ, এই শিক্ষা ধর্মে সমর্পিতা মায়ের কাছেই পেয়েছি' (রাহমান, ২০০৪ : ১৬৭)। আজীবন তিনি সত্য রক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের এই উক্তিটি স্মরণ করেছেন, বাবা এবং মায়ের আদর্শিক অবস্থান কবির চেতনা-গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[৪] তাঁদের পরিবারে সাহিত্যচর্চা বা বইপাঠের অনুকূল পরিবেশ ছিল না, শামসুর রাহমান নিজে সে সত্য স্বীকার করেছেন। মায়ের সংগ্রহে তিনি প্রথম দু'টি বইয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, যার একটি পড়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, অপরটি নিষিদ্ধ ছিল; প্রথমটি *বিষাদসিন্ধু*, তৎকালীন বাঙালি পরিবারে গ্রন্থটি ধর্মীয় গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল, এ কারণে এটি পাঠের বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি, নানিকে গ্রন্থটি পাঠ করে শোনানোর সুবাদে তাঁর পাঠ্যবই-বহির্ভূত পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্তি ঘটে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ছিল নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের *আনোয়ারা* উপন্যাস, উপন্যাস বলেই সেটি কবির নাগালের বাইরে রাখা হতো। তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে নভেল পাঠ বিশেষত করে বালক বয়সে, রীতিমতো নিষিদ্ধ কর্ম ছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, কবি বলেছেন : 'আমার মা-ই লুকিয়ে পড়তেন। তো আমার পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না' (সিদ্দিক, ২০১০ : ২৮৬)। কবির পরিবারে সাহিত্যের সঙ্গে এই ক্ষীণ যোগসূত্র ছাড়া আর একটি সূত্র ছিল—তিনি বাবার বন্ধু আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, কবির স্বচোখে দেখা প্রথম সাহিত্যিক।

## শিক্ষাজীবন

শামসুর রাহমান ১৯৩৬ সালে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হন, তাঁর জীবনের প্রথম স্কুল পুরোনো ঢাকার বেশ প্রাচীন স্কুল পোগজ। কবির বাবা এখানকার প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন, এ কারণে বাবার ইচ্ছাতে তিনি এখানেই ভর্তি হন। সে-সময় মুসলমানদের বাংলা শিক্ষার আনুপাতিক হার ছিল খুব কম, পোগজ স্কুলের মাত্র দশ জন মুসলমান ছাত্রের মধ্যে কবি ছিলেন একজন। তখনো এ স্কুলে কো-এডুকেশনের প্রচলন হয়নি, ফলে স্কুল জীবনে তিনি কোন ছাত্রীকে সহপাঠী হিসেবে পাননি। স্কুলের পরিবেশ সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল না,[৫] হিন্দু ছাত্রেরা অনেক সময় কবিকে 'নেড়ে' বলে উত্যক্ত করেছে, স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর উদারতায় কবি এসব বিষয়ে সুবিচার পেতেন। পোগজ স্কুলে তাঁর প্রিয় শিক্ষক ছিলেন চিন্তাহরণ সোম, তিনি ভাল শিক্ষক ছিলেন এবং আসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ ছিল তাঁর মন। শামসুর রাহমান শৈশবে আর একজন ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন অল্প সময়ের জন্য, তিনি ইয়াকুব আলি, ফুপাতো ভাই ইয়াকুব আলির সাহচর্যে শামসুর রাহমান পরিচিত হন রূপকথার জগতের সঙ্গে, পরবর্তীকালে অনেক কবিতাতে এইসব রূপকথার প্রত্নস্মৃতি কাজ করেছে। শামসুর রাহমান মনে করেন আজকের এই প্রযুক্তিশাসিত যুগেও রূপকথার প্রাসঙ্গিকতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি : 'রূপকথার প্রভাব এবং প্রয়োজনীয়তা কোনওটিকেই উপেক্ষা করা চলে না, বাদ দেয়া যাবেও না আমাদের জীবন থেকে, সায়েন্সফিকশনের আকর্ষণীয় আবির্ভাব সত্ত্বেও' (রাহমান, ২০০৪ : ২০৭)।

কবির স্কুল বাবার পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত হয়েছিল, কলেজ নির্বাচন করেছিলেন তিনি নিজে, ১৯৪৬ সালে তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা কলেজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঘেরা পরিবেশ ও সুনির্মিত ভবনকে ঘিরে কবি স্বপ্ন লালন করতেন—'ম্যাট্রিক পাশ করবার পর ভেবেছিলাম, কলেজে পড়ব এক উদ্দীপক, মনোমুগ্ধকর পরিবেশে। কখনও রমনার দিকে গেলে নজর কাড়ত ঢাকা কলেজের অমল ধবল সৌধটি' (রাহমান, ২০০৪ : ৩৬)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলেজটিকে সৈনিকদের ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করায় ঢাকা কলেজের ক্যাম্পাস স্থানান্তরিত হয়ে যায় পুরোনো ঢাকার সিদ্দিকবাজারের সংকীর্ণ গলিতে। ফলে 'সবুজিমা' ঘেরা ঢাকা কলেজে পড়ার স্বাদ তিনি নিতে পারেননি। প্রকৃতি তাঁকে বরাবরই টানত, ঢাকা কলেজের মূল আকর্ষণ ছিল তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কবি সে সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হন। পূর্বেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় কবির বাবা অপ্রসন্ন হন, বাবা ও ছেলের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। শামসুর রাহমান অবশ্য তাঁর এই ফলাফল বিপর্যয়কে ঘুরে দাঁড়ানোর কাল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখেছেন।

শামসুর রাহমানের চেতনা প্রথাবদ্ধতার শিকল ভেঙ্গে মুক্তবুদ্ধিতে উন্নীত হয়েছিল আরও আগে, তিনি তখন নবম শ্রেণিতে পড়েন। তাঁর এই চৈতন্যমুক্তির নেপথ্যে কাজ করেছিল গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়াল :

> চারপাশের লোকজনের কথার সঙ্গে আমার শিক্ষক আবদুল আউয়ালের গাঢ়, দীপ্ত কথার কোনও মিল ছিল না। তিনি আমার চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। ক্রমশ প্রশ্নাকুল হয়ে উঠেছিল আমার মন। অনেকের কাছে যা ছিল স্বতঃসিদ্ধ তা মেনে নেওয়ার প্রবণতা মন থেকে উধাও হয়ে গেল। অনেক কিছুকেই যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার এলাকাও অনেকখানি বিস্তৃত হলো। বাস্তব এবং স্বপ্ন পথ চলতে লাগল হাত ধরাধরি করে (রাহমান, ২০০৪ : ৬২)।

গৃহশিক্ষকের সংস্পর্শে কবির মনোভূমি উর্বর হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল নির্বিবাদিতার পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে যাচাই করার ক্ষমতা। আবদুল আউয়ালের কাছে তিনি অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষাও পেয়েছিলেন।

ঢাকা কলেজে শামসুর রাহমান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন *হারামণি* গ্রন্থের প্রণেতা মহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া স্নেহসিক্ত একটি রক্তগোলাপকে তিনি অনেক মূল্যবান পুরস্কারের চেয়ে বড় করে দেখেছেন। এই কলেজের সঙ্গে কবির বেদনাময় একটি অতীতস্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর পরিমল রায় এবং ইতিহাসের একজন শিক্ষক সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হন। বহুবছর পরও কবি সেই লজ্জাজনক স্মৃতি-অধ্যায়কে ভুলতে পারেননি—'ঢাকা কলেজের প্রাঙ্গণ দু'জন নিরীহ শিক্ষকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, এই কলঙ্কময় ঘটনা আজও আমাদের গলায় কোলরিজের কবিতার প্রাচীন নাবিকের আলবাট্রস পাখির মতো ঝুলে আছে' (রাহমান, ২০০৪ : ৪৮)।

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনকাল

শামসুর রাহমান পড়াশোনার আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি কখনো, এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বি.এ. পাশ করে তিনি আবার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন, প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট ভাল ছিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষায় অংশ নেননি। এসবের পেছনে তাঁর উদাস মনের বিচিত্র গতিবিধিকে দায়ী করেছেন : 'পরীক্ষা-লাজুক ছিলাম আমি। বেশ কিছুটা খামখেয়ালি করেছি এবং একাধিকবার পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছি

কী এক অজানার টানে' (রাহমান, ২০০৪ : ৫৪)। এছাড়া সিনেমা দেখার কারণেও অনেক সময় পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকতেন।[৬] কবি নিজেকে 'সিনেমা মাতাল' বলে চিহ্নিত করেছেন, গুলিস্তান সিনেমা হলের মর্নিং শো দেখা একসময় তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছাত্রজীবনে অনেক শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন কবি, যাঁরা কবির মূল্যবোধ গঠনে এবং চেতনাকে নতুন মাত্রায় শাণিতকরণে রেখেছেন ভূমিকা। এর মধ্যে তিনি স্মরণ করেছেন এম এন ঘোষের কথা, যাঁর মাত্র দু'টি ক্লাস পেয়েছিলেন কবি, সেই দু'টি ক্লাসই তাঁর স্মৃতিতে আজীবন জ্বলজ্বলে হয়ে থেকেছে। সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ীর নাম। তিনি বাংলা সাবসিডিয়ারি ক্লাস নিতেন, মুগ্ধ কবি ক্লাস শেষ হয়ে গেলেও একা বসে থাকতেন :

> ক্লাসের পাঠ্যবস্তুর বাইরে অনেক বইয়ের বিষয় সম্পর্কে জেনে নেয়ার আমার আগ্রহ দেখে তিনি সানন্দে ক্লাস শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে আমার কথা শুনতেন এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অল্পবয়সী ছাত্র বলে কখনও অবহেলা করতেন না। আজও কখনও কখনও আমার সেই প্রিয় অধ্যাপকের মুখ স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। (রাহমান, ২০০৪ : ৫৩)।

এছাড়া আর একজন শিক্ষক ছিলেন ক্লাসের বাইরেও যাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল শামসুর রাহমানের, তিনি অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ির ব্যক্তিগত পাঠাগার তিনি কবির জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তরুণ কবি হিসেবে তিনি এই শিক্ষকের যথেষ্ট সমীহ লাভ করেছেন।[৭] ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে অমিয়ভূষণ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান। খান সারওয়ার মুরশিদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মুনীর চৌধুরীর সঙ্গেও শামসুর রাহমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির একাডেমিক জীবন ছিল দীর্ঘ, সেইসূত্রে অনেকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সবার আগে স্মরণযোগ্য সহপাঠী জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নাম, তিনি কবির জীবনের মোড় পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর হাতেই প্রথম তিনি দেখেছিলেন জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', বইটি ধার নিয়ে পড়ার পর বদলে যায় কবিতা সম্পর্কে তাঁর প্রচলিত ধারণা : 'এরকম কবিতা আমি আগে কখনও পড়িনি। এরপর থেকেই আমি জীবনানন্দ দাশের অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়ি' (রাহমান, ২০০৪ : ৫৩)। নানা প্রান্তের নানা বয়সের মানুষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, কবি নিজেই সেই দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দীর্ঘায়িত ছিল কেন তা আগেই বলেছি। হ্যাঁ, এখানেই পেয়েছি কয়েকজন ভালো বন্ধুকে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ মোহম্মদ আলী, সাবের রেজা করিম, তরীকুল আলম, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, বদরুদ্দীন উমর, আবুল মাল আবদুল মুহিত, মোস্তফা কামাল, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, সৈয়দ আলী কবির, এবং আরও কারও কারও সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে (রাহমান, ২০০৪ : ৭৩)।

বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান ছিলেন উদার, যে কোনো ধর্ম, দর্শন বা রাজনৈতিক আদর্শের মানুষের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যেত তাঁর। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক আদর্শের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বন্ধুদের বেশির ভাগের রাজনীতি-সম্পৃক্ততা ছিল, এসব বিষয় বন্ধুত্বের ওপর কখনও ছায়া ফেলেনি।[৮] হাসান হাফিজুর রহমান ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শও শামসুর রাহমানকে প্রভাবিত করেনি। কর্মসূত্রে নানা মতাদর্শের মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছে, এমনকি কট্টর পাকিস্তানপন্থী, উর্দুভাষায় কবিতাচর্চাকারী অনেকের সঙ্গে কবির আন্তরিকতা ছিল, বিপরীত আদর্শের মানুষ বলে কারও সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ আচরণ করেননি, কেননা মানবধর্মই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্ম—'আমি সব মানুষকেই ভালোবাসব—তার কোনো গোত্রের জন্য নয়, তার কোনো ধর্মের জন্য নয়, তার কোনো বর্ণের জন্য নয়। এটাই আমার মূলমন্ত্র' (চৌধুরী, ২০১০ : ৩২২)। সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে তিনি স্বীকার করেছেন হাসান হাফিজুর রহমানকে। দু'জনের বন্ধুত্বের দৃঢ়তায় তাঁদের 'মানিকজোড়' নামে ডাকা হতো, তাঁরা শুধু বন্ধুই ছিলেন না *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় একসঙ্গে বেশ কিছুদিন চাকরিও করেছেন।

### প্রণয় ও পরিণয়

শামসুর রাহমানের জীবনে প্রেম ও পরিণয়ের ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টির মতো কোনো বৈচিত্র্য নেই, যদিও তাঁর প্রেমিক-সত্তাটি বাল্যাবস্থা থেকেই নিজেকে উন্মোচনের জন্য ব্যস্ত ছিল। ইস্কাটনে কবির পরিবার যেখানে বাস করতেন তার পাশের বাড়ির দিলারা নামের বালিকার প্রতি কবির মনে পক্ষপাত জন্মেছিল। একই মক্তবে পড়ার সূত্রে তাঁদের মধুর দৃষ্টিবিনিময়ও হয়েছে, নিতান্ত বালক বয়সের এ ভালোলাগাকে কবি ভালোবাসার মর্যাদা দিতে চাননি। তিনি প্রথম প্রেম হিসেবে স্বীকার করেন ছোট চাচার সংসারের গৃহকর্মীর কালো কন্যাটিকে, 'দ্রাবিড় কন্যার মতো তন্বী' সেই নারী সময়ের সাথে বিস্মৃতির অতল প্রান্তে হারিয়ে গেছে। শামসুর রাহমান নিজের প্রেমিক সত্তাটিকে কখনও কখনও সংবরণ করে রেখেছেন পারিপার্শ্বিকতার চাপে, প্রেম নিয়ে তাঁর জীবনে কোনো দুঃসাহসী উদ্যোগ

নেই। কারণ, তখনকার সময় ও সামাজিকতায় প্রেম বিষয়টিকে সহজ করে দেখা হতো না : 'আমি জন্মেছি এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে, নানা বিধি-নিষেধ দিয়ে ঘেরা ছিল আমাদের পারিবারিক গণ্ডি। গুরুজনেরা প্রেম ব্যাপারটিকে সহজ চোখে দেখেছেন কিংবা ভালো মনে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় নি কোনওদিন' (রাহমান ২০০৪ : ৩৮)। সে-সময় মুসলিম পরিবারের মেয়েদের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। এক বিয়ে বাড়িতে মুহূর্তের অবকাশে দূরের আত্মীয়া জোহরা জেগমের মুখ দর্শন করেন তিনি, তখন কবির বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পছন্দের নারী 'বন্যা'র সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে, চলছে বিরহ কাল, সেই বিচ্ছেদ-বেদনার ভেতরে আবার আনন্দের ফুল ফুটে ওঠে জোহরা বেগমকে কেন্দ্র করে। পরিবারের ক্ষীণ আপত্তিকে সম্মতিতে পরিণত করে তাঁরা পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানেই কবির প্রেমিক সত্তার মৃত্যু ঘটেনি, বিয়ে-বহির্ভূত জীবনে অনেক নারীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। একজন নারী বন্ধু ছিলেন কবির, যার নাম তিনি উচ্চারণ করা থেকে বিরত থেকেছেন তারই নিরাপত্তার জন্য, 'সুদূরতমা' সেই তরুণীকে তিনি *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।[৯] তাছাড়া গৌরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়, যার দর্শনে মিলনের আনন্দ, অদর্শনে বিরহের কাল ঘনিয়ে এসেছে কবির মনে।[১০] দিনপঞ্জিতেও গৌরীর বিবরণ রয়েছে, গৌরী তাঁর শেষ বয়সের প্রেম। তিনি অবশ্য প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো বয়সসীমা মানতে চাননি : 'নেমকহারামি করব না। প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি এ জীবনে, বারবার প্রেমে পড়েছি আমি। ...প্রশ্ন হলো কেউ কি এতবার, এতজনকে ভালোবাসতে পারে? ভালোবাসতে পারে প্রায় বুড়ো বয়সে?' (রাহমান, ২০০২ : ১১-১২) শামসুর রাহমান বারবার প্রেমে পড়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বলেই তাঁর হাত ধরে অনেক প্রগাঢ় প্রেমের কবিতার জন্ম হয়েছে, 'নিঃস্ব কৃষক যেমন' কবিতায় আকাঙ্ক্ষিতা নারীর জন্য তাঁর মিলনের অপেক্ষাকে দেখেছেন এভাবে : 'একটি ফসল থেকে অন্য ফসল অবধি নিঃস্ব/ কৃষক যেমন টিকে থাকে, একটি মিলন থেকে/ অন্য মিলনের ক্ষুব্ধ তৃষিত সীমায় তেমনি আমি' (*এক ধরনের অহংকার*)। নারীর প্রেরণা এবং প্রেমকে কবিতার একটি আবশ্যক উপাদান ভেবেছেন তিনি : 'প্রেম এবং নারী বাদ দিলে পৃথিবীর কাব্যচর্চা এত সংকুচিত হত যে, সব যুগের কবিতা এক করেও প্রেমের কবিতার মতো হত না' (চৌধুরী, ২০১০ : ২৯৩)।

### কর্মজীবন

কর্মজীবন নিয়ে শামসুর রাহমানের তেমন তাড়া ছিল না, কিন্তু সন্তানের দুধ কেনার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে পিতা হিসেবে বাধ্য হয়ে জড়াতে হয়েছিল চাকরির সঙ্গে। কবি নিজেকে ধরাবাঁধা কোনো নিয়মের অধীনে রাখতে চাননি, বাস্তবতার চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অনেক কাজ করতে হয়েছে।

সারাজীবন ধরে চাকরি করে যাওয়াটা কবির জীবনে স্ববিরোধী সিদ্ধান্তের একটি বড় উদাহরণ। চাকরি সম্পর্কে তিনি খুব উদার ধারণা পোষণ করতেন না : 'চাকরি ব্যাপারটা আগাগোড়াই আমার ঘোর অপছন্দের ব্যাপার। চাকরির শরীর থেকে অবিরত 'দাস', 'দাস' গন্ধ বেরোয়। আমরা যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাদের অনেককেই এই দাসত্বের শেকলটি সত্তায় সেঁটে রাখতেই হয়' (রাহমান, ২০০৪ : ১৩৬-১৩৭)। কবিতাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৃত্তাবদ্ধ চাকরি-জীবনের অনিবার্যতাকে নির্দেশ করে বলেছেন : 'এবং প্রভুর রক্তনেত্র সারাক্ষণ/ জেগে রয় ঘানিটানা জীবনের চৌহদ্দিতে; ফলে/ ঠাণ্ডা চোখে ঠুলি এঁটে দশটা-পাঁচটার জাঁতাকলে/ অস্তিত্বকে চেয়ে দেখি নিখুঁত গোলাম, নিশ্চেতন।/ আমিও নিজেকে দেখি করেছি ঢালাই মাঝারির স্পষ্ট ছাঁচে' ('তিনশো টাকার আমি', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। জীবনের প্রায় পুরোটা সময় শামসুর রাহমান সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মাঝে দু'বছর চার মাস রেডিও পাকিস্তানে প্রোগ্রাম প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম চাকরি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায়।[১১] ১৯৬৪ সালে *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় আসেন, পত্রিকাটি স্বাধীনতাত্তোর কালে *দৈনিক বাংলা* নামে প্রকাশিত হত, এই পত্রিকার সঙ্গে কবি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ চাকরি সাপ্তাহিক *মূলধারা* পত্রিকায়। তিনি আজীবন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও নিজেকে তুখোড় সাংবাদিকের তকমা দিতে চাননি, যদিও পেশা হিসেবে সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং সাংবাদিতকতার জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

**কবিজীবন**

অনেক প্রতিভাবান কবি-লেখকের মতো শামসুর রাহমানের কবিত্বশক্তির স্ফূরণ শৈশব বা কৈশোরে হয়নি। তবে একবারে শৈশব থেকে তাঁর যে গুণটি ছিল, সেটি হলো দেখার শক্তি। চারপাশের ভূ-প্রকৃতি, জনজীবনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেরিয়েছে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন, যা কিছু দেখেছেন তারই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতাভুবন। তিনি যে কবি হবেন এমন কোনো লক্ষণ ছোটবেলায় তাঁর মধ্যে ছিল না, বরং চিত্রকর হবার একটা প্রবল সম্ভাবনা এক সময় দেখা দিয়েছিল। স্কুলে যাবার পথে যেসব ছবির দোকান পড়ত সেখান থেকেই তিনি কিনেছিলেন 'দুলদুল' নামক শরবিদ্ধ একটি ঘোড়ার ছবি। তিনি চিত্রশিল্পের পাঠও নিতে গিয়েছিলেন স্থানীয় এক ছবি-আঁকিয়ের কাছে, পরবর্তীকালে সেই আঁকিয়ে গুরুমশায়ের অনীহাতে তাঁর চিত্রশিল্প চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়। শৈশব-কৈশোরে তিনি যেসব বই পড়েছিলেন সেগুলোর অধিকাংশই ছিল গদ্য রচনা। অবশ্য রামমোহন লাইব্রেরির সদস্য হবার আগ পর্যন্ত তাঁর নিয়মিত পাঠের অভ্যাস ছিল না। পরিবারের কেউ পাঠ বা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবির প্রেরণা হয়ে উঠতে পারেনি, ফলে শামসুর রাহমানের কবি হয়ে ওঠা

একান্তই নিজের তাগিদে, নিজের বোধ-তাড়িত হয়ে। সেই বোধি-চেতনার পরিণতি আসার জন্য কবিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত। মাঝে মাঝে তাঁর সৃজনশীলতার কিছু নিদর্শন মিললেও সেটি সুসংবদ্ধ সচেতন প্রয়াস নয়, যেমন বোন নেহারের মৃত্যুশোক নিয়ে লেখা বা স্কুলের পাঠ্যভুক্ত বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করে শিক্ষকদের প্রশংসা লাভ—এসব ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। চর্চার শুরুটা হয়েছিল গদ্য দিয়ে। অষ্টম অথবা নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ভেতরে চেতনাগত যে বিবর্তন শুরু হয়েছিল সেটি প্রথম উপলব্ধি করেন তাঁর গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়াল, পাঠ-বহির্ভূত জ্ঞানের নানা প্রান্তের আলোচনা করে এই শিক্ষক শামসুর রাহমানের মানসজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতিকে তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতোই ভেবেছেন, কবির ভেতরে জেগে উঠেছিল অন্য এক 'আমি', যে 'আমি' পরিণত বয়সে বাচ্চু থেকে শামসুর রাহমানে রূপান্তরিত হয়েছিল। কবি হবেন বলে খুব হিসেব কষে কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলেন ব্যাপারটি তেমন নয়, প্রথম কবিতা লেখার ক্ষণটি কবির স্মরণে আছে :

> আসলে আমি যে লেখক হবো, এটা আমি কোনোদিনই ভাবিই নি। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায়, এরকম মেঘলা ছিল, আমার যদ্দুর মনে পড়ে। আমার মনটা খারাপ ছিল—কোনো বিশেষ কারণে নয়। কোনো মেয়ের জন্য মন খারাপ কিংবা কোন আঘাত পেয়েছি তেমনও কিছু নয়। এমনি মন খারাপ হয়েছে। কেমন যেন মনে হলো কিছু একটা লিখতে। এটা কেনো মনে হয়েছিল সে রহস্য আজো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। আমি সেদিনই প্রথম লিখতে শুরু করি। তখন আমার বয়স বিশ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি (চৌধুরী, ২০১০ : ৩০০)।

প্রথম কবিতা জন্মের কালে কবি ছোট বোন নেহারের মৃত্যুর যে বেদনার কথা বলেছেন তা যেন সেই আদি কবিতার জন্মলগ্নের বেদনার সঙ্গে একই ঐতিহ্যিক সূত্রে গাথা।[১২] সেই কবিতাটি অবশ্য ছাপার অক্ষরে কোথাও আসেনি। তাঁর অনেক কবিতাই গ্রন্থভুক্ত হয়নি,[১৩] হয়নি অবহেলায়, উদ্যোগের অভাবে। ছাপার অক্ষরে কবির যে কবিতাটি প্রথম এসেছিল সেটি 'ঊনিশ শো ঊনপঞ্চাশ', ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কবিতাটির জন্ম। এই কবিতাটি প্রকাশের পর থেকে কবি ধারাবাহিক চর্চার মধ্যে থেকেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত সে চর্যায় কোন ছেদ পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে শামসুর রাহমান কবিতাবোদ্ধাদের নজরে আসেন *নতুন কবিতা* সংকলনের মাধ্যমে। কবিতা সংকলনটি প্রকাশের উদ্‌যোগে কবি সম্পৃক্ত ছিলেন, নামকরণও কবির প্রস্তাবনায় সম্পন্ন হয়েছিল।[১৪] আবু সয়ীদ আইয়ুব কলকাতা থেকে *পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা* সংকলন বের করেন, সেখানে বাংলাদেশের দু'জন

কবির কবিতা স্থান পেয়েছিল, একজন জসীম উদ্‌দীন অপরজন ছিলেন শামসুর রাহমান, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে শামসুর রাহমানের জন্য আনন্দদায়ক এবং প্রেরণাদায়ক ছিল। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং দেশের বাইরে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা ছাপা হতো। *কবিতা* পত্রিকায় কবিতা ছাপা হবার একটি বিরূপ পটভূমি রয়েছে। শামসুর রাহমান একসময় নিয়মিত লিখতেন *সংবাদ* পত্রিকায়, পত্রিকাটির সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন তখন আবদুল গনি হাজারী, 'রূপালী স্নান' শিরোনামের কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ নিয়ে তাঁর মতবিরোধ ঘটে সম্পাদক ও সাহিত্য সম্পাদকের সঙ্গে, পরবর্তীকালে সেই কবিতাটি সাগ্রহে *কবিতা* পত্রিকায় ছেপে দেন বুদ্ধদেব বসু। এছাড়া সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত *পূর্বাশা* পত্রিকাতেও কবিতা ছাপা হয়েছে। ১৯৫২ সালের জুন মাসের *কবিতা* পত্রিকা কবির দুটি কবিতাকে লিড দিয়ে ছাপে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর *পূর্বাশা*র একটি সংখ্যায় শামসুর রাহমানের 'অ্যাপোলোর জন্যে' কবিতাটিকে লিড দিয়ে ছেপেছিলেন (রাহমান, ২০০৪ : ১২৫)। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা 'আর যেন না দেখি' কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *পরিচয়*, ও ঢাকা কলেজের ম্যাগাজিনে কাছাকাছি সময়ে ছাপা হয়, কবিতাটি হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনে রেখেছিলেন। ১৯৬০ সালে আবুল হোসেন ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে শুরু করে ত্রৈমাসিক *সংলাপ* পত্রিকা। ক্ষণজীবী এই পত্রিকা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

> 'সংলাপ'-এর প্রতিটি সংখ্যায় আমার কবিতা গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হতো। সেকালের পক্ষে ভালো সম্মানী পেতাম প্রতিটি লেখার জন্য। 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', 'খেলনার দোকানের সামনের ভিখিরি' ইত্যাদি কবিতা ছাপা হয়েছির 'সংলাপ'-এ (রাহমান, ২০০৪ : ১৪০)।

এছাড়াও জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *কবি ও কবিতা*, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মাহবুবুল আলম সম্পাদিত *সীমান্ত*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *পূবালী*, আহমদ রফিক সম্পাদিত *নাগরিক*, ড.আলীম চৌধুরী সম্পাদিত *যাত্রিক*—এসব পত্রিকায় শামসুর রাহমানের কবিতা সমাদরের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। সম্পাদকদের অধিকাংশের সঙ্গে শামসুর রাহমানের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, তাঁরা নিজেরাও সাহিত্যের নানা শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি যে কোনো আদর্শের মানুষের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারতেন, এতে তাঁর আদর্শিক অবস্থান পরিবর্তনের ভয় ছিল না। এ কারণে নির্ভয়ে তিনি নানা প্রান্তের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁদের আবদার মেটাতে কবিতা তুলে দিয়েছেন হাতে। তিনি কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, তবে মতিউর রহমান সম্পাদিত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *একতা*

পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে। ১৯৭২ সালে আবুল হাসনাতের সম্পাদনায় বের হতো মাসিক সাহিত্যপত্র *গণসাহিত্য*, সেই পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যও নির্বাচিত হন কবি, তাঁর ভাষ্যে :

> 'গণসাহিত্যে' আমার একাধিক কবিতা প্রকাশিত তো হয়েইছিল, সম্পাদকের ঐকান্তিক অনুরোধ আমাকে দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়ে নিয়েছিল, মনে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মায়াকোভস্কি, জীবনানন্দ ও পিকাসো সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ 'গণসাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধাবলী আমার 'আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে (রাহমান, ২০০৪ : ২০২)।

কবিতার বাইরে তিনি প্রায়শ প্রবন্ধ এবং কলাম লিখেছেন বিভিন্ন পত্রিকায়। *পূবালী* পত্রিকায় 'খোলা জানালা' শিরোনামে কলাম লিখতেন একসময়, *একতা* পত্রিকাতেও তিনি কলাম লিখেছেন। তাঁর সাংবাদিক জীবনের সর্বশেষ কর্মক্ষেত্র *মূলধারা* পত্রিকায়, এই পত্রিকায় লেখা তাঁর সাপ্তাহিক কলাম পাঠকনন্দিত হয়েছিল। বাংলা ছাড়া সাবের হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত *নিউ পেপার* ইংরেজি পত্রিকায় 'ভয়েজ উইদিন' নামক কলাম লিখেছেন। *দৈনিক পাকিস্তানে* যারা সহকারী সম্পাদক ছিলেন তাদের প্রত্যেককে সপ্তাহে একটি করে কলাম লিখতে হতো, শামসুর রাহমান লিখতেন 'মৈনাক' ছদ্মনামে। তাঁকে আরও একবার ছদ্মনামের মুখোশ পড়তে হয়েছিল ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় শামসুর রাহমানকে কবিতাচর্চা করতে হয়েছিল গোপনে, সন্তর্পণে, দেশের পত্রিকায় তখন দেশাত্মবোধক কবিতা ছাপার ব্যাপারটি ছিল অকল্পনীয়। সে-সময় মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ চৌধুরীর উদ্যোগে গোপনে কয়েকটি কবিতা কলকাতায় আবু সয়ীদ আইয়ুবের হাতে পৌঁছে, কলকাতার *দেশ* পত্রিকায় সেগুলো ছাপা হয়েছিল। কবির নিরাপত্তার কথা ভেবে আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর নামকরণ করেন 'মজলুম আদিব', এই ছদ্মনামের অর্থ ছিল 'নির্যাতিত লেখক'। তবে শাসকের চোখ রাঙানি বা নির্যাতনকে ভয় পেতেন শামসুর রাহমান তেমনটি নয়। ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে কটাক্ষ করে লিখেছিলেন 'হাতির শুড়' নামক কবিতা, স্বনামেই সেটি প্রকাশ পেয়েছিল সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকায়, কবি তখন সরকার সমর্থিত পত্রিকা *মর্নিং নিউজে* কর্মরত।

স্বদেশকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসতেন বলেই স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের বেদনা ও বঞ্চনা প্রতিনিয়ত থেকে গিয়েছে তাঁর কবিতার কেন্দ্রে। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড় 'গোর্কি' আঘাত হেনেছিল বরিশালের ভোলায়, এ বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করে অসহায় মানুষদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে কাজ করে *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকা। এমনকি আক্রান্ত জনগণকে সাহায্যার্থে ঢাকায় 'ভুখমিছিল' বের করা হয়,

সেখানে *দৈনিক পাকিস্তানের* অন্যান্য কর্মীর সঙ্গে শামসুর রাহমানও অংশ নেন। সেটি ছিল সাংবাদিক শামসুর রাহমানের দায়িত্ব, কবি শামসুর রাহমানের সামনে রাতের অন্ধকারে দুঃস্বপ্নের মতো ভিড় জমিয়েছে সব-হারা মানুষেরা, গোর্কি বিষয়ক দুটি কবিতা লিখে কবির দায়ভার থেকে মুক্ত হন তিনি—'আসুন আমরা আজ' এবং 'সফেদ পাঞ্জাবি'। এর মধ্যে 'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতাটি ছিল মৌলানা ভাসানীকে নিয়ে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোর্কির ভয়াবহতাকে গুরুত্ব দিয়ে না দেখে চলে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, ভাসানী দেখেছিলেন বলেই আক্রান্ত মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : 'ওরা আসেনি।' এই না আসা পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকারের পতনের একটি বড় কারণ হয়ে ওঠে। শামসুর রাহমান আক্রান্ত মানুষদের পাশে ভাসানীর দাঁড়িয়ে যাবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কবিতাটিতে তাঁকে 'গণনায়ক' আখ্যা দিয়েছিলেন, অরক্ষিত, অসহায় মানুষগুলোর রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছিল ভাসানীর 'সফেদ পাঞ্জাবী':

জনসমাবেশে
সখেদ দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ।
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনও
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যক্ষেত।
... ... ... ... ... ... ... ...
বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার,
অতিদ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত, বে-আব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।

(*দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

শামসুর রাহমান অসহায়, দুর্গত মানুষের সহমর্মী হিসেবে লিখলেও কবিতাটি একটি ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ঘূর্ণিঝড়ের কারণেই পাকিস্তান সরকারের প্রতি জনগণ আস্থা হারায়, আওয়ামী লীগ ভোলায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পশ্চিম বাংলাকে সুরক্ষিত করা হয়, পূর্ব বাংলা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পাক-ভারত যুদ্ধ এবং গোর্কির আক্রমণে বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন নীতির ফাঁকি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, অঙ্কুরিত হতে থাকে প্রাপ্য আদায়ের যুদ্ধবীজ।

রাজনীতির পক্ষপাতদুষ্ট স্বার্থলোলুপতার পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে শামসুর রাহমান বড় করে দেখতেন। তাঁর বাবা একসময় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন, কিছু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি হেরে যান। রাজনীতির এই কূট-চারিত্র্য সম্পর্কে তিনি আগেই অবহিত ছিলেন, এজন্য ছাত্রজীবনে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকলেও তিনি রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ হননি। তবে পরিণত বয়সে, সময়ের দাবিকে সামনে রেখে তিনি রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠেন, সে-কথা তিনি স্বীকার করে বলেছেন :

> রাজনীতি-বিমুখ এই আমি ক্রমান্বয়ে রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠলাম। আমার কবিতায় তার ছায়াপাত শুরু হয়। কিন্তু কবিতা যেন শ্লোগানধর্মী হয়ে না ওঠে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল আমার গোড়া থেকেই। কোনও কোনও বিষয় আছে যেগুলোকে কবিতা করে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য। কোনও কষ্টসাধ্য ব্যাপারকে সফল করে তোলার মধ্যে এক ধরনের নান্দনিক আনন্দ লাভ হয় (রাহমান, ২০০৪ : ২২৩)।

সেই নান্দনিকতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কবিতায় বলেছেন : 'আমার ম্যানিফেস্টোর প্রথম লাইন হলো/ কাব্যগ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রচার পুস্তিকা হবে না' ('আমার আঙুল কামড়ে ধরে', *আমার কোনো তাড়া নেই*)। শামসুর রাহমানের রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠার ব্যাপারটি অনেকে সমর্থন করেননি; তাঁর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীরও মনে হয়েছে রাজনীতি, সভা, সমিতি, সংগঠন ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁর মতো কবির জন্য নয়।[১৫] অনেকে শামসুর রাহমানের রাজনীতি-সচেতনতাকে ত্রুটি হিসেবে না দেখে কবিত্বের নতুন মাত্রায় উত্তরণের চিহ্নক বলে মত দিয়েছেন :

> শামসুর রাহমানের রাজনীতিচেতনাকে তার কবিসত্তার ত্রুটি মনে করার কোনও কারণ দেখি না। বরং এ প্রত্যয়ই জন্ম নেয়–ঐ সচেতনতা দিয়েও পূর্বসাধক ও সমসাময়িকদের থেকে নিজেকে তিনি অনেকটা আলাদা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন–'কবিতা অনেকরকম।' আলাদা হওয়ার পথও এক নয়। (শাহরিয়ার, ২০১১ : ৩৭)

শামসুর রাহমান কোনো স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তাড়িত হয়ে রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠেননি, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন উদার এবং নির্লোভ, সেই পরিচয় নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সঙ্গে কবির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, সেই সূত্রে বঙ্গবন্ধু তাঁকে *দৈনিক বাংলার* সম্পাদক হবার প্রস্তাব দেন, শামসুর রাহমান সবিনয়ে সে প্রস্তাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।[১৬] পদের লোভে তিনি কখনো আক্রান্ত হননি। পরবর্তীকালে তাঁকে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে

*দৈনিক বাংলার* সম্পাদক হতে হয় : 'নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীকে তিনি সম্পাদক হিসেবে মান্য করেছেন। কর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধের কারণে তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন এবং এই কর্মচারীদের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে তাঁকে অনিচ্ছায় আসতে হয়েছিল সম্পাদকের উত্তপ্ত আসনে' (সিদ্দিকী, ২০১৪ : ২৩)। শামসুর রাহমান তিনবার *কবিতা পরিষদের* সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং কবিতা-উৎসব আয়োজন করে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ দেন। সারাদেশের কবিরা একসঙ্গে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে এরশাদের রোষানলে পড়েন তিনি, রাজনৈতিক কূটচালের মুখে তিনি স্বেচ্ছায় সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তাঁর নির্লোভ ব্যক্তিত্বকে আরও একবার উজ্জ্বল করে তোলেন। এসময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল, ১৯৮৭ সালে তিনি ডায়রিতে লিখেছেন : 'আজ রাতেই বাসা ছেড়ে অন্যত্র গা-ঢাকা দিলাম। আমি কোনও রাজনৈতিক কর্মী নই, তবু নানা কারণে পাকিস্তানি কায়দায় পরিচালিত এরশাদী হুকুমতের আমার ওপর নেকনজর রয়েছে' (রাহমান, ২০০৪ : ৩০৮)। রক্ত ঝরানো রাজনীতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে তিনি চিরকাল দূরে থাকতে চেয়েছেন, জীবনে একবারই তিনি যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন, যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিলেন কবিতায়। তিনি সবসময় যুদ্ধকে ঘৃণা করেছেন তার বিধ্বংসী চারিত্র্যের জন্য, রক্তপাত তাঁর এত অপ্রিয় যে, শিকারপ্রিয় বাবার বন্দুক বাগিয়ে কখনো একটি পাখি শিকারের মতো শৌখিন প্রাণহত্যায়ও তাঁর আগ্রহ জন্মায়নি। সেই কবি একাত্তরে হাঁক দিয়ে বললেন 'যুদ্ধই উদ্ধার' ('উদ্ধার', *বন্দি শিবির থেকে*)। অবশ্য এই কণ্ঠ তাঁর একার ছিল না, হাজারো দেশপ্রেমী মানুষের কণ্ঠে তিনি মিলিয়েছিলেন কবিতার স্বর।

এই একবার ছাড়া যুদ্ধ শামসুর রাহমানের কাছে কখনো প্রয়োজন বলে মনে হয়নি, তিনি বরং এদেশের মানুষ ও প্রকৃতির সংস্পর্শে স্বস্তি পেয়েছেন, চেয়েছেন কবিতার আশ্রয় : 'এক চিলতে নীল আকাশ, ভাসমান মেঘ, গাছের পাতার মৃদু কম্পন, শিশুর হাসি, একটি উত্তম কাব্য-পঙ্‌ক্তি আমাকে আনন্দিত করতে পারে সহজেই' (রাহমান, ২০০৪ : ১৫৯)। শামসুর রাহমানের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে ঢাকার বুকেই তিনি পেয়েছেন প্রকৃতির সান্নিধ্য, সেইসঙ্গে পাড়াতলীর নিবিড় প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা ছিলেন শিকড়ের টানে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সেই পাড়াতলীতেই ফিরতে হয়েছিল কবিকে : 'আব্বা যে দালানটি তৈরি করেছিলেন মসজিদের পাশে, পুকুরের কাছাকাছি, সে বাড়িতেই একাত্তরের এপ্রিল মাসের শুরুতেই ঠাঁই নিয়েছিলাম' (রাহমান, ২০০২ : ৩৬)। শিকড়ের কাছে ফিরে গিয়ে পেয়েছিলেন নিরাপত্তার অনুভূতি, সেইসঙ্গে পাড়াতলী তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল

দুটি বিখ্যাত কবিতা—'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা'। তিনি রাজনীতি থেকে, বাস্তব জীবন থেকে কবিতাকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন, পারেননি। রাজনীতি এবং রাজনৈতিক চেতনা-বিধৌত কবিতা থেকে খুব সন্তর্পণে নিজেকে মুক্ত করে থাকতে চেয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতনে' :

কোনো দিন আর রাজরাজড়ার লড়াই
বাঁধলে ঘেঁষি না তার ত্রিসীমায়, জানি না কোথায়
বাঘ-মোষ এক ঘাটে জল খায় কিংবা ইতিহাসের পাতায়
কারা কুশীলব,
তাদের বৈভব
আনে না বিভ্রান্তি মনে।

('মৃন্ময়', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

এভাবে শামসুর রাহমান ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনীতি ও বাইরের বিপুল বিশ্ব থেকে নিজেকে উন্মুল করে রাখতে চেয়েছিলেন কোন্ উদ্দেশ্যে? কোথায় তিনি নির্ধারিত করে রেখেছিলেন তাঁর কবিতার গন্তব্য? এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দীক্ষাগুরু মেনে তিনি বলেছিলেন :

অভ্যাসের বিবর্ণ দৃষ্টিতে নয়, সৃষ্টির আবেশে
সপ্রেম তাকাই চতুর্দিকে
এই চরাচরে : উন্মীলিত
বৈশাখী রৌদ্রের উজ্জীবনে,
উধাও মাঠের প্রান্তে ধ্যানী ঐ গাছের ছায়ায়
আর বনে বনে মর্মরিত খোলা উর্মিল হাওয়ায়
নীলিমায় দিই মেলে মানসমরাল।

('সূর্যাবর্ত', *রৌদ্র করোটিতে*)

পরে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনাকে একটু অতীতের দিকে ঠেলে দিয়ে আবার বলেছিলেন :

মনে পড়ে আমিও একদা পড়েছি ঝাঁপিয়ে অন্তহীন
নীলিমায়, কতদিন মেঘের প্রাসাদে
কাটিয়েছি মায়াবী প্রহর
আমি আশ্চর্যের যুবরাজ।
সেদিন আননে ছিল আঁকা

ত্রিলোকের রূপাভাস, আর
স্বপ্নের কাননে তুলে বাসনার ফুল
যথারীতি পেয়েছি মদির সঙ্গ কত
এবং বেসেছি ভালো—আস্থা রেখে সেই
দ্রাক্ষাবনে, অনন্তের প্রীত গুঞ্জরণে—

এই কবিতার পরের স্তবকেই কবি নিজের গন্তব্য নিয়ে যেন খানিকটা দ্বিধান্বিত, তাঁর কবিতার ভাবীকালের পথসন্ধানে খানিকটা ব্যস্ত এবং অনেকটাই বিভ্রান্ত :

নেশার খোয়ারি কেটে গেলে
নামব কোথায় তবে, এখানে কোথায়?
('অস্তিত্বের তন্ময় দেয়ালে', *রৌদ্র করোটিতে*)

রোমান্টিক ভাবালুতার 'সুনীল আকাশ' কবিকে বস্তুভূমির মতো নিরেট, নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারেনি, তাই রবীন্দ্রনাথ এমনকি তিরিশি আধুনিক কবিদের অতিক্রম করে তিনি পৌঁছাতে চাইলেন তাঁর একার নিজস্ব গন্তব্যে। 'শিল্পে শহীদ' এই কবি শেষ পর্যন্ত সমকাল, সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরে খুঁজে পেলেন কবিতাচর্চার নতুন প্রত্যয়। এজন্য অগ্রজ কবিদের বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে না এসে উপায় ছিল না তাঁর, বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে 'শান্তিনিকেতনে' বসে 'তুলে দিয়ে দরজায় খিল/ সত্তাসূর্যে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু গড়ি উজ্জ্বল কথার মিছিল' ('রুপালি স্নান', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*) অথবা 'মাঝে মাঝে তবু/ নিজের ঘরের ছিদ্রে চোখ রেখে দেখি পৃথিবীকে' ('অপাঙ্‌ক্তেয়', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)—এরকম কবিতা লেখা আর সম্ভব ছিল না। উপলব্ধিগত কারণে কবিকে সরে আসতে হলো আত্মমুখীনতা থেকে, প্রথমদিকের কলাকৈবল্যবাদী কবিতা-নীতি থেকে, দেশের জন্য লিখতে হলে রাজনৈতিকচেতনা-স্নাত কবিতা। তিনি সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, তবে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ছিল, অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতিকে তিনি মানসিকভাবে সমর্থন করতেন।[১৭] বামপন্থী চেতনার অনুসরণ, বিপ্লবের স্বপ্ন এবং শ্রেণিহীন মানুষের সর্বহারা জীবনের বয়ান শামসুর রাহমানের কোনও কোনও কবিতায় ছায়া ফেলেছে—'আনতেই হবে শান্তি/ ডানে নয় জানি বামে চলাটাই শ্রেয়/ ('আনতেই হবে শান্তি', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*) অথবা 'সমাজতন্ত্রের/ঝকঝকে রোদে হবে নাকি দূর শেষে/ এ যুগের ঘোর অমানিশা?' ('জনৈক লেখকের কথা', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*) এসব কবিতায় বাম রাজনীতির প্রতি পক্ষপাতের সুর খুঁজে পাওয়া যায়।

শামসুর রাহমান শুধু কবি নন, কবিতার জন্য, দেশ ও মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর অনেক সাংগঠনিক তৎপরতাও ছিল। রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদ, শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ, *জাতীয় কবিতা পরিষদ*, ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি—এসব আন্দোলন-সংগঠনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। দেশে ও দেশের বাইরে সভা-সমিতি, সেমিনার, সাহিত্যমেলায় যোগ দিয়েছেন। দেখা হয়েছে বাংলা ও বিশ্বের রূপ, পরিচিত হয়েছেন নানা দেশের বরেণ্য ব্যক্তি এবং তাঁদের দেশ-কাল-সাহিত্যভাবনার সাথে। ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, সেখানে আয়োজিত সাহিত্যমেলায় শামসুর রাহমান পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা বিষয়ক বক্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও। অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা রায়, আশাপূর্ণা দেবী, গোপাল হালদার, অশোক বিজয় রাহা, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, প্রবোধচন্দ্র সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, অজিত দত্ত, অম্লান দত্ত, বাণী রায়, দিনেশ দাস, নরেশ গুহ, জগদীশ ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, গৌরী দত্ত—প্রমুখ একঝাঁক গুণী ও বরেণ্য মানুষের ভীড়ের মাঝখানে গিয়ে পড়েন কবি। তাঁদের কারও সঙ্গে শুধু চোখের আলাপ, কারও সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ, আবার কারও সঙ্গে গড়ে ওঠে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্ব। নরেশ গুহ, অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা রায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু—এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন শামসুর রাহমান। নরেশ গুহর নেতৃত্বে জীবনানন্দের বাসায় গিয়ে হাজির হন শামসুর রাহমান। তাঁর বয়ানে :

> ঠিক হলো, ল্যান্সডাউন রোডে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেন'-এর কবি জীবনানন্দ দাশের বাসায় যাব। তাঁর বাসার দরজার কড়া নাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন স্থূলাকৃতি ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন।... বুঝতে পারলাম এই সাধারণ চেহারার ব্যক্তিটিই আশ্চর্য সব কবিতার রচয়িতা জীবনানন্দ দাশ। মনোভাব লুকাব না, কবিকে দেখে ঈষৎ হতাশই হলাম (রাহমান, ২০০৪ : ১০৯)।

জীবনানন্দের বাইরের অবয়ব যাই হোক তাঁর কবিতার গুণমুগ্ধ ছিলেন শামসুর রাহমান। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে পরিচিত হয়েছেন ইলা মিত্র, রমেন মিত্র, বিষ্ণু দে, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন। শামসুর রাহমানসহ আরও অনেক সাহিত্যিক এই মৈত্রী মেলায় অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শহীদ কাদরী ও মহাদেব সাহা। সাহিত্য সম্মেলনে কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের সাধুবাদ লাভ করেন তিনি। সেবারের কলকাতা সফরে বিষ্ণু দে কবিকে তাঁর বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছেলে জিষ্ণুকে পাঠান কবির কাছে। তাঁর সঙ্গে স্বপ্রণোদিত হয়ে দেখা করতে এসেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, অরুণ কুমার সরকার

প্রমুখ। নিজের বাড়িতে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং গৌরী আইয়ুব, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় জমে ওঠে বিশেষ আসর, *কবি ও কবিতা* পত্রিকার সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিয়মিত কবিতা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন শামসুর রাহমানের কাছ থেকে। কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য দেখা হলেও তাঁর সহৃদয় ব্যবহার কবিকে স্পর্শ করেছে, পরবর্তীকালে 'কমল মজুমদারীয় বঙ্গীয় ভাষায়' কবির সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়েছে। কবির সঙ্গে ইলা মিত্র এবং রমেন মিত্রের ব্যবহারও ছিল আন্তরিক ঔদার্যে পরিপূর্ণ।

শামসুর রাহমান তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে চার পাণ্ডবকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করেন, এর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব আন্তরিক, তাঁদের সঙ্গে দেখাও হয়েছে একাধিকবার। ১৯৮৫ সালে *আবৃত্তিলোক* আয়োজন করে দুই বাংলার কবিতা উৎসব, সেখানে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কবির, এছাড়া তাঁর প্রিয় কবির তালিকায় ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। শামসুর রাহমানের সঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুবের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, বিভিন্ন সময়ে তাঁর কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সেই সম্পর্কের ঋণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। দুই বাংলার ভেতরে সাহিত্যের সেতুবন্ধ তৈরি এবং সেই যোগসূত্রকে দীর্ঘকালের করে তুলেছিলেন শামসুর রাহমান, তিনি নিজে কবিতা পাঠিয়েছেন ওপার বাংলায় অন্যদিকে 'আবার আসিব ফিরে'র মতো স্বদেশগন্ধী কবিতা সংগ্রহ করে এনে এপার বাংলার *কবিকণ্ঠে* ছেপেছেন।[১৮]

১৯৭২ সালের এপ্রিলে শামসুর রাহমান গিয়েছিলেন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলায়, সে বছরের জুন মাসেই তিনি মস্কো গমন করেন পুশকিন মেলায় আমন্ত্রিত হয়ে। সেখানে রুশ কবি ইভতেশঙ্কু এবং ভজনেস্কিকে দেখেছিলেন, হৃদ্যতা জমে উঠেছিল কবি রজদেস্ত্ভেন্স্কির সঙ্গে। পাস্তেরনাকের শূন্য বাড়ি দর্শন করেছেন কবি ব্যথিত হৃদয়ে। পুশকিন মেলায় তিনি স্বরচিত বাংলা কবিতা পাঠ করেন। ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামে গিয়ে মার্কিন কবি রিচার্ড এবারহার্টের স্টাডিরুমে বসে পাশ্চাত্য কবিতা বিষয়ক আলোচনা হয়।

শামসুর রাহমান দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন, তাঁর কাছে এই অংশ নেয়ার ব্যাপারটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ : 'সাহিত্য সম্মেলন জরুরি বিবেচিত শুধু লেখকদের কাছে নয়, যারা সাহিত্যচর্চা করেন তাদের কাছে তো বটেই, যারা সাহিত্য পাঠকে অবশ্য-কর্তব্য জ্ঞান করেন, তারাও বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেন' (রাহমান, ২০০৪ : ২৮৭)। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত

হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন; এ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবদুল গণি হাজারী, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বেগম সুফিয়া কামাল, কামরুল হাসান প্রমুখ। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কলিম শরাফী, মাহবুব আলম চৌধুরী, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ প্রমুখ। শামসুর রাহমান সেই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য বিষয়ে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৭৪ সালে মুন্সীগঞ্জে পয়লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে সাহিত্যসভা এবং কবি সম্মেলনে তিনি সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। লঞ্চে নদীপথের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন নিবিষ্ট মনে : 'প্রকৃতি আমাদের আগমনে যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছেন। নদীর সংযত, সুশ্রী তরঙ্গমালা, পাখির অপরূপ উড়াল, হাওয়ার আদর আমাদের এই যাত্রাকে করে তুলেছিল আনন্দময়, প্রায় অপার্থিব' (রাহমান, ২০০৪ : ৩২৫)। প্রকৃতি দেখা এবং সাহিত্যপ্রিয় মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এই দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে শামসুর রাহমান বারবার যোগ দিয়েছেন দেশের নানা প্রান্তের সাহিত্য সম্মেলনে। ১৯৮৭ সালে খুলনায় গিয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধক হিসেবে, গাইবান্ধায় সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ১৯৯৭ সালে। যখন যেখানে গিয়েছেন কবি, বাংলাদেশের প্রকৃতি তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি, দু'চোখ ভরে তিনি উপভোগ করেছেন বাংলার রূপ। এই দেশ এবং দেশের প্রকৃতি নিয়ে আবেগমথিত কবি বেদনাও পেয়েছেন রক্ষণশীলদের আচরণে। আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের বসবাসসূত্রে এবং বিশেষ প্রাকৃতিক শোভাযুক্ত হবার কারণে সিলেট কবির প্রিয় স্থান ছিল, সিলেটে কবিকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করা হলে মৌলবাদী তাণ্ডবে সে অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হন আয়োজকেরা। সংবর্ধনার স্থানে অগ্নিসংযোগ এবং আয়োজকদের বাড়িতে বোমা হামলার মতো নিন্দনীয় ঘটনায় কবির সিলেট যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কবি এইসব ঘটনাকে খুব বড় করে দেখেননি, কারণ জীবনে এর চেয়ে অনেক বড় বড় সংকটময় মুহূর্ত পার করে এসেছেন। যখন পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যে উৎসবের আয়োজন করা হয় সেখানে কবি নির্ভয়ে 'সূর্যাবর্ত' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন :

প্রকৃতির টোলে আমি কখনো নিইনি পাঠ, তবু
ঋতুতে ঋতুতে
আমার সত্তার স্বরগ্রাম
কেবলি ধ্বনিত হয়, অবিরাম প্রহরে প্রহরে
এখনও যে ক্লান্ত হলে নিসর্গের কাছে

আশ্চর্যের গ্লাস হাতে যাই,
অবসন্ন চেতনার গোধূলিতে শুনি
সান্ত্বনার ভাষা এখনও রবীন্দ্রনাথ,
সে তোমারি দান।

(*রৌদ্র করোটিতে*)

অকপটে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যঋণ স্বীকার করে নিয়ে সাহসী কণ্ঠে আবৃত্তি করে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করেছিলেন কবি। ১৯৬৭ সালে তথ্যমন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দীনের নির্দেশে রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, চাকরিচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মুনীর চৌধুরী রচিত প্রতিবাদী বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন কবি। এর পূর্বে রোমান হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা চালায় পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব খান। ১৯৫৯ সালে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের এই অপতৎপরতা থামিয়ে দেয় ভাষা-সচেতন বাঙালি, কবি ছিলেন তাদেরই দলের। একসময় কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মকে ইসলামীকরণ করার চেষ্টা চলতে থাকে, নজরুলের অনেক শব্দকে 'হিন্দুয়ানি' বলে খারিজ করে নতুন আরবি-ফারসি শব্দ বসিয়ে দেয়া হচ্ছিল। কবি তখনও জীবিত কিন্তু চেতনারহিত, তাঁর অগোচরে তাঁর কবিতার শব্দ বদলে দেয়ার মতো গর্হিত কাজকে শামসুর রাহমান সমর্থন করেননি, সচেতন মানুষদের সঙ্গে তিনিও প্রতিবাদীর কাতারে দাঁড়িয়েছেন—নিজের অবস্থান এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে।

শামসুর রাহমান নিজের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে সবসময় শঙ্কিত ছিলেন, মিতবাক, অন্তর্মুখী চেতনা-সম্পন্ন কবি ছিলেন তিনি, সাংগঠনিক দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রে সেই অর্থে ছিল না। তারপরও *জাতীয় কবিতা পরিষদের* সভাপতি হিসেবে একাধিকবার কবিতা উৎসবের আয়োজন করেন। ১৯৮৭ সালে আয়োজিত উৎসব নিয়ে জল ঘোলা করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে নানা মহল। জাতীয় কবিতা উৎসবের পোস্টার লাগাতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন চারজন প্রচারকর্মী। এরকম অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শামসুর রাহমানের জীবনের অর্জন অনেক বেশি, *নতুন কবিতা* সংকলনে কবিতা প্রকাশের পর তাঁকে তিরিশি উত্তরাধিকারের নতুন প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিরিশি প্রভাবের মেদ ঝরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নয়, পূর্বে তিনি আরও একটি কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন, সেটি তাঁর ইচ্ছাতেই গ্রন্থরূপ লাভ করেনি।[১৯] প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উদীয়মান কবি হিসেবে তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি কবিতা-বোদ্ধা ও সমালোকচদের আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। এই বইটির প্রশংসা

করেন মনজুরে মওলা, আবুল হোসেন এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আলোচনাসমূহ প্রকাশ পায় যথাক্রমে *উত্তরণ*, *মর্নিং নিউজ* এবং *পূর্বমেঘ* পত্রিকায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ আদমজী পুরস্কারের জন্য জমা দিলেও পুরস্কার পাননি, তিনি কবিতা লিখতেন নিজের ভেতরের 'সত্তার প্রেরণা-তাড়িত' হয়ে, পুরস্কারের লোভে নয়, তাই পুরস্কার না পাবার ব্যাপারটি তাঁকে কবিতা-বিমুখ করতে পারেনি। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন আবদুল বারি চৌধুরী, তিনি পাণ্ডুলিপি নিয়ে জমা দেন লেখক সংঘে। এই কাব্যগ্রন্থের জন্য শামসুর রাহমান লাভ করেন আদমজী পুরস্কার। পুরস্কারের লোভ না থাকলেও পুরস্কার আনন্দঘন ব্যাপার, পুরস্কার পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থের কবিতাবলী পূর্বের কবিতা থেকে স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে বিকশিত হয়েছিল, কবিতার এই পরিবর্তন কবি নিজে উপলব্ধি করেছিলেন :

> 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশিত হওয়ার পর আমি যে কবিতাবলী লিখতে শুরু করি সেসব স্পষ্টতই আমার লেখা কবিতা থেকে কী বিষয়ে, কী ভঙ্গিতে আলাদা হতে শুরু করে। পার্থক্য সৃষ্টির জন্য আমি যে আদাজল খেয়ে লেগেছিলাম, তা কিন্তু নয়। গাছের ডালে যেমন পাতা আসে তেমনি তৈরি হয়ে যাচ্ছিল কবিতাবলী (রাহমান, ২০০৪ : ১৪৫)।

পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে কবিতার জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন শামসুর রাহমান। কবিতা তাঁর ধ্যান-জ্ঞানের রাজ্য অধিকার করে রাখলেও তিনি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে কম-বেশি বিচরণ করেছেন—উপন্যাস, গল্প, গান এবং ছোটদের জন্য লিখেছেন, তিনি নাটক এবং অনুবাদের কাজও করেছেন; *কালের ধুলোয় লেখা* এবং অকালমৃত সন্তান মতিনকে উৎসর্গ করে লেখা *স্মৃতির শহর*—এ গ্রন্থ দু'টি তাঁর আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা। তিনি পুশকিন মেলা উপলক্ষে মস্কো ভ্রমণ করেন এবং ভ্রমণ কাহিনি লেখেন *মস্কো থেকে ফিরে*।[২০] শামসুর রাহমান যেমন অনুবাদের কাজ করেছেন, তাঁর নিজের কবিতাও অনেকের হাতে অনূদিত হয়েছে। কবি-জীবনের শুরুতে লেখা 'কম্পোজিটার' কবিতাটি অনুবাদ করেন অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। বাংলা কবিতাটি *সৈনিক*-এ এবং অনুবাদ কবিতাটি *New Value*-তে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে কবির আরও দু'টি কবিতা খান সারওয়ার মুরশিদ অনুবাদ করে *New Value*-তে প্রকাশ করেন। হারুন-উর রশিদের সম্পাদনায় শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ ও শহীদ কাদরীর কবিতার অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'রূপালি স্নান' কবিতার অনুবাদ, এইসব অনুবাদ শামসুর রাহমানকে নতুন আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শামসুর রাহমানের যোগাযোগের বহুমুখী বিস্তার ঘটে, যদিও তিনি ছিলেন বাকসংযমী, অন্তর্মুখী, স্বভাব-নির্জন, তবু তাঁর বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা কম ছিল না। লেখালেখি ও কর্মসূত্রে জীবনের নানা মুহূর্তে নানা গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। ভারতসহ বিশ্বের আরও অনেক দেশ ভ্রমণের সুযোগে তিনি পরিচিত হয়েছেন অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে, তাঁদের কাছে কবি হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। আমৃত্যু অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, প্রগতিশীল চেতনায় বিশ্বাসী এই কবির শত্রুমণ্ডলীরও অভাব ছিল না, কবির নামে নানা অপপ্রচার, কুৎসা রটনা করেছেন তারা। এমনকি তিনি মৌলবাদী হামলার ষড়যন্ত্রে পড়েছিলেন, তারা কবির বাড়িতে হানা দিয়েছিল, সফল হতে পারেনি। একাত্তরের পর এই ঘটনায় কবি আবার অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে থাকেন :

> আজকাল বেশিরভাগ সময় নির্ঘুম কাটে। যেটুকু ঘুমোই, হিজিবিজি স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নে নয়, জাগ্রত অবস্থাতেই প্রায়শই একটি ধাবমান, ধারালো কুড়াল নাচতে থাকে দৃষ্টিপথে। এক হিংস্র তরুণ ধেয়ে আসছে আমার দিকে। মূর্তিমান এক বিভীষিকা দেখে আমি পাথরের মতো স্থির, বাকশক্তিরহিত (রাহমান, ২০০২ : ১৫৯)।

শামসুর রাহমানের একটাই দুর্ভাগ্য, তিনি জন্মেছিলেন এমন এক সময়ে যেখানে 'লেখকের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে আমাদের দেশে লাঠিসোটা ধরা ধর্মান্ধরাও আছে। একবার শামসুর রাহমানের ফাঁসি দাবি করেছিল ওরা' (শাহরিয়ার, ২০১১ : ৪৪)। জন্মের পর থেকে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সময়ের আলিঙ্গনে বেড়ে উঠেছেন তিনি, দেখেছেন দেশের ভাঙ্গা-গড়া, বিশ্বযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, নিজের দেশ ও বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক টানাপোড়েন। এসব কারণে শামসুর রাহমান নিতান্তই সমকাল-তাড়িত কবি, পরিপার্শ্বের অস্থিতিশীল প্রেক্ষাপট আলোড়িত করেছে তাঁর সংবেদনশীল কবিমনকে। রাজনীতি থেকে দুরে থাকতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক কবিতা লিখতে চাননি, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্বের কালিক-চিত্র তাঁর কবিতায় নিষ্ঠার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্র-রাজনীতি, জনজীবন, ভূ-প্রকৃতি—সবই স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রথমদিকের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে আত্ম-অনুভূতির বয়ান ছিল, পরবর্তীকালে নিজের দিকে ফেরার আর অবকাশ মেলেনি, দেশ-কাল, জনজীবন, প্রকৃতি, পুরাণ, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অবতলে রেখে সম্পন্ন করেছেন কবিতার নির্মাণ। অনেকেই শামসুর রাহমানকে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সংকটে ভুগেছেন—যেমন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বা জসীউদ্‌দীনকে নির্দিষ্ট করা যায় বিশেষ প্রবণতা দিয়ে, তেমন কোন বিশেষ প্রবণতার সন্ধানে কবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, শামসুর রাহমানের কবি-পরিচয়কে আটকে দিতে চেয়েছেন বিশেষ কিছু উপাধির সীমায় :

> কবি শামসুর রাহমান এত বড় কবি, এত দিকে তাঁর ডানার বিস্তার, বা কবিতায় বিচরণ, তাঁকে নাগরিক কবি আন্দোলনের কবি এই সব অভিধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একজন বড়ো মাপের কবি হিসেবে শামসুর রাহমানকে আইডেনটিফাই করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। অবশ্য তাঁর প্রথম দিকের কিছু কবিতায় সে সম্ভাবনা দেখা গেছে। কই আর তা পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে জনগণই তাঁকে ভাগযোগ করে ছিঁড়েখুঁড়ে যার যার ক্ষুধা মিটিয়ে নিল। জানি না এ ব্যাপারে আপনি কী ভাবছেন। তা এ ব্যাপারে আজকে আপনার কাছে যা জানতে চাচ্ছি, এ বয়সেও আপনি আপনার প্রগাঢ় মনের প্রজ্ঞাবুদ্ধি নিয়ে সেই গোড়ার দিকের জগতে ধ্যানলোকে চলে আসুন। তাহলে আমরা বলতে পারব, শামসুর রাহমানের কবিতা মানেই এই দর্শন, এই চিন্তা জীবন সম্পর্কে (সিদ্দিক, ২০১০ : ২৯০-২৯১)।

প্রথামতো জাগতিক সবকিছুই সম্মুখগতিতে এগিয়ে চলে, পেছন বা অতীত যত উজ্জ্বলই হোক সেটাকে আঁকড়ে ধরে স্থবির হয়ে থাকা যায় না। যা কিছু জন্মায় তার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, শামসুর রাহমানের কবিতাও কালের পথে হেঁটেছে দীর্ঘসময়, সময়ের ব্যবধানে তাঁর কবিতা পড়েছে অনিবার্য রূপান্তরের মুখে, সেই রূপান্তর পূর্বের তুলনায় অনেক সময় অনুজ্জ্বল। কবি যখন উপরিউক্ত প্রশ্ন ও মূল্যায়নের মুখোমুখি হচ্ছেন তখন তাঁর বয়স উনসত্তর বছর, লেখা হয়ে গেছে জীবনের অধিকাংশ কবিতা, এই প্রশ্ন তাঁকে বিব্রত করেনি, বরং বড়ো কবির স্বভাবপুষ্ট বিনয়ে তিনি নিজের দ্বিধার কথা স্বীকার করেছেন, স্বীকার করেছেন সেই অতৃপ্তির কথা, যা শিল্পীমাত্রই লালন করে থাকেন, বয়সকে অস্বীকার করে তিনি নতুন প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন :

> মাঝে মাঝে আমি বিষণ্ন হয়ে পড়ি, কারণ আমি যা করতে পারতাম তা করতে পারি নি। এ বোধটা সবচাইতে বেশি পীড়িত করে আমাকে এবং আমার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, সেটি যথাসম্ভব কাজে লাগাতে পেরেছি কিনা এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা আছে—দ্বন্দ্ব আছে।... আমার ভেতরে যেটুকু আলো আছে কিংবা অন্ধকার আছে সেগুলোকে বাইরে এনে একটি আলো আঁধারের উন্নতমানের খেলা আমি দেখাতে পারি কিনা, সেই চেষ্টা আমি আমৃত্যু করে যাবো (সিদ্দিক, ২০১০ : ২৯১)।

অস্থির সময়ের চাপে নিজের দিকে ফিরে একান্তে কবিতা লেখার সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি, আরও দীর্ঘ জীবনের অবকাশ তাঁর প্রয়োজন ছিল, এজন্য সৃজনশীল মানুষের বাঁচার বয়সকে বাড়িয়ে তিনি নিয়ে যেতে চান হাজার বছরের সীমায় : 'চার শ বা পাঁচ শ বছর বাঁচা উচিত সৃষ্টিশীল মানুষের। তাই বলে অথর্ব হয়ে নয়। সক্রিয় থাকা চাই। পৃথিবীকে যারা অনেক কিছু দিতে চায়, পৃথিবীর যাদের কাছে

সামান্য প্রত্যাশা আছে, তাদের আয়ু যদি দুই হাজার বছরও হয়—সে আর তেমন বেশি কী!' (শাহরিয়ার, ২০১১ : ৬৮) রাইনার মারিয়া রিলকে তো বলেছিলেন, 'যদি কেউ মনে করে না-লিখেও সে বাঁচতে পারবে, তবে তাঁর আদৌ লেখা উচিত নয়' (শহীদুল্লাহ, ২০১১ : ১৩)। কবি বেঁচেছেন কবিতার জন্য, একদিন আয়ু বাড়লে আর একটি কবিতা লিখবেন এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করে 'ইচ্ছা' কবিতায় বলেছিলেন : 'যদি বাঁচি চার দশকের বেশি/ লিখব।/ যদি বাঁচি দুই দশকের কম/লিখব।...যদি বেঁচে যাই একদিন আরও/ লিখব' (*নিজবাসভূমে*)। শহীদ কাদরীকে তিনি একবার বলেছিলেন : 'যদি না লিখতে পারেন তবে আত্মঘাতী হবেন' (কাদরী, ২০০৬ : ৬৮)। যে কোনো পরিস্থিতিতে কবিতা লেখার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে শামসুর রাহমান তাঁর জীবনের সঙ্গে কবিতার মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছিলেন। ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশ-কাল, প্রকৃতি-পুরাণের ভেতরে তাঁর কবি-জীবনের বিস্তার, তাঁর কবিতারা সমকালের সুযোগ্য সন্তান : 'শামসুর রাহমান সংগ্রহ ক'রে সমকালের প্রচুর সংবাদ, সাজিয়ে দিয়েছেন তা কবিতার স্তবকে স্তবকে; তাই তাঁর কবিতায় সমকাল রচিত হয়েছে বিবরণে-বর্ণনায়, এবং সে-সাথে তিনি গেঁথে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বেদনা' (আজাদ, ১৯৮৩ : ৫৭)। অনেকরকম সম্ভাবনা ছিল শামসুর রাহমানের পেশাগত জীবন এবং সৃজন-মননের ক্ষেত্র নির্বাচনে, তিনি হতে পারতেন ব্যবসায়ী, চিত্রশিল্পী, গদ্যশিল্পী, আবৃত্তিকার অথবা অধ্যাপক, শেষ পর্যন্ত তিনি হয়েছেন কবি।[২১] কবিতাতেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন আত্মতৃপ্তি, আত্মবিকাশের মাচান। বহুতর সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে কবি হয়ে ওঠা—এটি কবির একার অর্জন, শিল্পের ক্ষেত্রে যে 'সাধনা'র ওপর তিনি বারবার জোর দিয়েছেন, এ সেই সাধনার ফল।

শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে পরিবার থেকে কোনো প্রেরণা অথবা পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী কিছুই পাননি, এ ব্যাপারে পারিবারিক গণ্ডীতে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। এই একটি দরোজা বন্ধ থাকলেও প্রেরণা ও উত্তরাধিকারের আরও অনেক দরোজা খোলা ছিল তাঁর সামনে। তিনি প্রথম আধুনিক বাংলা কবিতার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন চারটি গ্রন্থের মাধ্যমে—মোহিতলাল মজুমদারের *বিস্মরণী*, কাজী নজরুল ইসলামের *অগ্নিবীণা*, প্রেমেন্দ্র মিত্রের *প্রথমা* এবং বুদ্ধদেব বসুর *বন্দীর বন্দনা* দিয়ে। এর মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যচর্চা ও জীবনদর্শনে বুদ্ধদেব বসুর কতকগুলো মৌল প্রবণতা ছিল : রাজনীতিমুক্ত বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার, সংঘবদ্ধ সাহিত্যচর্চায় অবিশ্বাস। বুদ্ধদেব বসু এই প্রবণতাসমূহকে সবসময় লালন করতে পারেননি, কখনো কখনো সরে আসতে হয়েছে পরিস্থিতির প্রয়োজনে। বুদ্ধদেব বসুর মতো শামসুর রাহমানও কবিতাচর্চা এবং জীবনদর্শনের কিছু মৌল প্রত্যয় নির্ধারণ করেছিলেন, তিনি

প্রথমদিকে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মকে সন্তর্পণে রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হন কিছুকাল। কিন্তু, এই অবস্থানে অনড় থাকতে পারেননি, রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁর কবিতার বাঁক বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিতাকে সামাজিক দায়মুক্ত বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মানুষ ও মানবতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন শামসুর রাহমান, তাই মানবকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণের সঙ্গে তাঁর কবিতার গভীর যোগসূত্র ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : আমি বলি, কোনো কবি, কোনো শিল্পী তাঁর সামাজিক পরিমণ্ডল ও যুগকে এড়িয়ে কখনো পুরোপুরি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন না' (রাহমান, ২০০২ : ৩৮)। বুদ্ধদেব বসু চেতনাগতভাবে নিঃসঙ্গ ছিলেন, সংঘবদ্ধ সাহিত্যচর্চার কোনো প্রয়োজন তিনি দেখেননি। শামসুর রাহমান যদিও স্বভাব-লাজুক কিন্তু আড্ডাবাজ এক প্রাণচঞ্চল চেতনাকে তিনি লালন করতেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সূত্রে ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে এবং কর্মসূত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে অফিসে আড্ডার বাইরেও তাঁর নিজের বাসা, বিউটি বোর্ডিংসহ ঢাকার নানা জায়গায় তাঁর আড্ডার এক বিশাল পরিমণ্ডল ছিল। এসব আড্ডা নিছক কথোপকথন ছিল না, এসব জায়গায় নিয়মিত সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা এবং স্বরচিত কাবতাপাঠের ব্যাপারও জড়িত ছিল। আড্ডা বা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের বয়স বা অবস্থানের বিবেচনা ছিল না, সেসব জায়গায় বন্ধুপ্রতিম শিক্ষকেরা যেমন থাকতেন তেমনি অগ্রজ ও অনুজ কবিদের সঙ্গেও তিনি অনায়াসে মিশতে পারতেন। *কবিতা পরিষদ* তো ছিলই, এছাড়া বিচ্ছিন্ন অনেক আড্ডা থেকেও নতুন কবিতার জন্ম হয়েছে। কবির বাড়িতে এক ঘরোয়া আড্ডায় 'রশীদ করীম দাবি করে বসলেন, কবিকে একটি কবিতা রচনা করতে হবে, যার বিষয় হবে, স্ত্রীর দৃষ্টিতে তিনি কেমন' (সিদ্দিকী, ২০১০ : ৩)। এই ফরমায়েশের ভিত্তিতে তিনি লিখেছিলেন 'তার চোখে আমি' কবিতাটি।

নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও অগ্রজ কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসুকে শামসুর রাহমান অস্বীকার করেননি, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রতি' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> যতই যাই না কেন দূরে
> অচেনা স্রোতের টানে ভাসিয়ে আমার জলযান,
> হাতে রাখি আপনার কম্পাসের কাঁটা; ঝড়ে চার্ট
> কখন গিয়েছে উড়ে, চুলে চোখে-মুখে রুক্ষ নুন,
> অস্পষ্ট দিগন্তে দেখি বৌদ্ধ মুখ। আপনার ঋণ
> যেন জন্মদাগ, কিছুতেই মুছবে না কোনো দিন।
>
> (*এক ধরনের অহংকার*)

তিরিশের আরেক কবি জীবনানন্দ দাশের বিশেষ কিছু শব্দ দ্বারা কবি আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রথমদিকে 'মেঠো চাঁদ', 'হাজার বছরের ঢের' বা 'দাঁতে ছিঁড়ি ঘাস'—এসব শব্দবন্ধ জীবনানন্দের কবিতায় বহু-ব্যবহৃত। তিরিশের কবিরা টি.এস.এলিয়ট এবং বোদলেয়ারের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না, শামসুর রাহমান তিরিশি উত্তরাধিকারসূত্রে পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারা খানিকটা তাড়িত হয়েছেন, পাঠের সুবাদেও তাঁদের কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর। এলিয়টকে তিনি নিবেদন করেছিলেন 'কোথাও পারি না যেতে' কবিতাটি, সেখানে বলেছেন : 'তোমারই গণ্ডিতে/ এখনও রয়েছি বাঁধা, জানি/ চুকানো যায় না ঋণ বড় মোড়লকে/ কানাকড়ি দিয়ে' (*বিধ্বস্ত নীলিমা*)। এখানেই অকপটে স্বীকার করে নেন এলিয়টের ঋণ : 'আমাদের মনীষাকে/ বয়স্ক করেছ তুমি, চৈতন্যের প্রখর আলোয়/ সর্বদা দিয়েছ ভরে আমাদের সংকীর্ণ আকাশ।' তাঁর কবিতাচর্চায় দেশ-বিদেশের কবিরা প্রেরণা যুগিয়েছেন, তারপর একসময় রবীন্দ্রনাথ, তিরিশের কবিকুল, পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে উত্তরিত হয়েছেন নিজস্বতায়। শামসুর রাহমানের কবিতার দুটি মৌল উপকরণ—ভাষা ও ছন্দ। লঘু উচ্চারণের জন্য এবং যাপিত জীবনের যে কোনো বক্তব্য নির্মাণে তাঁর ভাষাভঙ্গি ছিল উপযুক্ত : 'সন্দেহ নেই এ কবির অবদানের সবচেয়ে বড় দিক তাঁর কাব্যভাষার 'ধারণক্ষমতা', জটিলতা ও বিস্তৃতি। ব্রিটিশ-উত্তর পূর্ববাংলার নব-উদিত মধ্যসমাজের সব আবেগ ও প্রয়োজনের ভাষার তিনি প্রায় একক মহৎ নির্মাতা।'[২২] এই ভাষাকে তিনি দিয়েছিলেন অক্ষরবৃত্তের গতি-মন্থরতা, যে কোনো বিষয়কে কবিতায় রূপান্তরের আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিল শামসুর রাহমানের কাব্যভাষা ও ছন্দ, এজন্যই দীর্ঘ কবিজীবনে তাঁর কবিতার ব্যাপ্তি বিশাল—'বেতো ঘোড়া' থেকে শুরু করে 'বাজারের থলে' পর্যন্ত তাঁর কবিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

শামসুর রাহমানের কবিতা যুগপৎ নন্দিত এবং নিন্দিত হয়েছে, সমালোচকের প্রশংসা অথবা নিন্দা কোনোটাই তাঁকে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, কবিতাকে তিনি দেখেছিলেন সবচেয়ে স্পর্শকাতর প্রেয়সীর সঙ্গে একাত্ম করে : 'কবিতা ঈর্ষাকাতর প্রণয়িনীর মতো। সে ক্ষণকালের অমনোযোগ কিংবা উপেক্ষা সহ্য করে না' (রাহমান, ২০০২ : ১৮)। ফলে বিরতিহীন চর্চায় নিয়মিত তুষ্ট রেখেছেন কাব্যদেবীকে। দীর্ঘকালের এই কাব্যচর্চার ভেতরে থাকতে গিয়ে তাঁর কবিতা স্বদেশ এবং পুরাণসহ নানা বিষয়কে অঙ্গে ধারণ করেছে, তাই তাঁর কবিতার মর্মমূলে পৌঁছতে হলে 'পাঠককে জানতে হবে ইউরোপীয় পৌরাণিক কাহিনীসহ পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ইতিহাস। সর্বোপরি স্বদেশের ও স্বসমাজের স্বরূপ এবং রাজনীতির বিশ্লেষণ' (হক, ২০০৬ : ২২)। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতা এবং মানবতার পক্ষের এক উজ্জ্বল কবি। তাঁর কবিতার আর একটি

মহার্ঘ অস্ত্র ছিল—'প্রেম', এই প্রেমকে তিনি বৃহত্তর অর্থে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন কবিতায়; প্রেম শামসুর রাহমানের কবিতায় ব্যক্তিক গণ্ডি অতিক্রম করে মানবপ্রেম এবং স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে তাঁর কবিজীবন এবং কাব্যচর্চাকে দিয়েছে উজ্জ্বল পরিণতি।

## টীকা

১. দশকভিত্তিক পরিচয়ের ব্যাপারে শামসুর রাহমানের আপত্তি ছিল। কবিতাকে যেমন কোনও সীমায় বাঁধেননি, তেমনি কবিতাচর্চাকে কোনও নির্দিষ্ট দশকের শাসনে রাখতে চাননি, 'আমরা যারা পঞ্চাশ দশকের লেখক তারা দশকের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াই নি। বিশেষ দশকের জোয়ালের রেওয়াজ বেশ তোড়জোড়ের সঙ্গে শুরু হলো ষাটের দশক থেকে। কবি সাহিত্যিকদের কোনও একটি বিশেষ দশকের গণ্ডিতে আটকে রাখার মানে হয় না, আটকে রাখা যায়ও না' (রাহমান, ২০০৪ : ২০০)।

২. শামসুর রাহমানের বাবার নামের বানানের ক্ষেত্রে অনেকে 'মুখলেসুর রহমান' ব্যবহার করেছেন। কবির আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখা* গ্রন্থ অবলম্বনে এখানে 'মোখলেসুর রহমান' বানানটি ব্যবহার করা হলো।

৩. 'ঢাকায় যখন রায়ট হয়েছিল তখন আমাদের প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন একজন হিন্দু ভদ্রলোক। আমার বাবা সেই হিন্দু ভদ্রলোককে আমাদের বাসায় দেড় মাস লুকিয়ে থাকতে দিয়েছিলেন' (শামসুজ্জামান ও আমিনুর, ২০১০ : ২৮৬)।

৪. হরকাতুল জেহাদ কবির ওপর আক্রমণের পর হতাশাগ্রস্ত কবি মাকে স্মরণ করেছেন : 'জীবদ্দশায় তিনি যে আলো সঞ্চারিত করেছেন আমার চেতনায়, সেই আলো ধর্মীয় উন্মাদনা, সন্ত্রাস, জাহেলিয়াত এবং হতাশার অন্ধকারে আমাকে পথ দেখাবে' (রাহমান, ২০০২ : ১৬০)।

৫. 'মুসলমান ছাত্রদের প্রতি অবহেলার কিছু পরিচয় পাওয়া যেত টিফিন ঘরের ব্যবস্থাপনায়। আমাদের পানির এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসটি রাখা হতো জলখাবার ঘরের বাইরে কিছুটা অযত্নে। হিন্দু ছাত্রদের জন্য ছিল অনেক পিতলের গ্লাস আর সেগুলো থাকত ঘরের ভেতর' (রাহমান, ২০০৪ : ২১)।

৬. 'গুলিস্তান সিনেমায় নিয়মিত প্রভাতী শো দেখার লোভে এমএ পরীক্ষা দিইনি। এই তথ্য অনেকের কাছে হাস্যকর, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ঘটনাটি নগ্ন সত্য' (রাহমান, ২০০৪ : ৬৫)।

৭. 'আর একজন টিচার যাঁর কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। তিনি আমাদের রোম্যান্টিক কবিতা পড়াতেন' (শামসুজ্জামান ও আমিনুর, ২০১০ : ৩০৮)। অমিয়ভূষণ এবং শামসুর রাহমান উভয়েই ওয়াগনের উদ্বাস্তু বিহারীদের ওপর একটি করে কবিতা লেখেন। কবিতা দুটি অমিয়ভূষণের বাসায় এক আড্ডায় দু'জনে পাঠ করেন। শামসুর রাহমানের কবিতাটি বেশি ভাল হয়েছে বলে উদার মত প্রকাশ করেছিলেন অমিয়ভূষণ। 'স্যারের এই বিরল ঔদার্যে আমি স্তম্ভিত তো হলামই, আমার চোখও ছলছলিয়ে উঠল' (রাহমান, ২০০৪ : ৫৬)। 'কয়েকটি দিন ওয়াগনে' শিরোনামের এই কবিতাটি পরবর্তীকালে লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছিল। অনিল সিংহ সম্পাদিত কলকাতার *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশ পায়। কবিতাটিতে সুর সংযোজন করেন হামিদুর রহমান। সাঈদ আহমদ সেই সুরটি সেতারে বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন রেডিও পাকিস্তান ঢাকার একটি অনুষ্ঠানে। তাছাড়া শামসুর রাহমানের 'কম্পোজিটর' নামক কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে *New Value* পত্রিকায় প্রকাশ করেন অমিয়ভূষণ। 'একজন তরুণ কবির জন্য এই ঘটনা খুবই সুখকর এবং অনুপ্রেরণামূলক' (রাহমান, ২০০৪ : ৬৭)।

৮. 'জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সাবের রেজা করিম মুক্তমনের অধিকারী। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী ঝুঁকেছিলেন বাম রাজনীতির দিকে। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন সেকালে। বদরুদ্দীন উমরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে।... কিছু পরে তিনি তমদ্দুন মজলিসের সংস্রব ত্যাগ করে সাম্যবাদে সমর্পিত হন। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, তরীকুল আলম, মোস্তফা কামাল যতদূর মনে পড়ে, ইসলামিক ব্রাদারহুডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন' (রাহমান, ২০০৪ : ৭৩)।

৯. 'ইচ্ছে করেই কোনও নাম উল্লেখ করি নি। যে তরুণীকে বইটি উৎসর্গ করেছিলাম, তার অসুবিধা হতে পারে একথা ভেবে। খুবই সুন্দর ছিল সে, আচরণে ছিল সলাজ সুষমা' (রাহমান, ২০০৪ : ১৪৮)।

১০. 'আজ গৌরীর সঙ্গে কথা বলা গেল অনেক্ষণ। নিরবিচ্ছিন্ন এই আলাপে সব শরতের আকাশের মতো হয়ে গেল; আমি আমার মধ্যে স্নিগ্ধ রোদ, কয়েকটি দূরগামী পাখির ঝলসানি, সরোবরের টলটলে জল, সোনার ঘণ্টার ধ্বনি অনুভব করলাম' (রাহমান, ২০০৪ : ৩৩০)।

১১. জীবিকার প্রয়োজনে বিরুদ্ধ-আদর্শের পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এ চাকরির গ্লানি তিনি আমৃত্যু বহন করেছেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্বশুরের চাপে অনেকটা নিরুপায় হয়ে কবি সাত মাস এই পত্রিকায় কাজ করেন। অন্যদিকে হাসান হাফিজুর রহমান পুরো নয় মাস আত্মগোপন করে থেকেছেন, চাকরিতে যোগ দেননি। ইচ্ছে থাকলেও শামসুর রাহমানের পক্ষে সেটি করা সম্ভব হয়নি বলে পরবর্তীকালে গ্লানির মাত্রা আরও বেড়েছে।

১২. পরবর্তীকালে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনেক বেদনা তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে। বেদনাকে তিনি শিল্পের মর্যাদা দিতে পারতেন। প্রিয় পুত্র মতিনের মৃত্যুর পর লেখা 'তোর কাছ থেকে দূরে' শিরোনামের কবিতা, মায়ের মৃত্যু নিয়ে লিখেছেন : 'মা, তোমার শিয়রে গোলাপ রেখে হৃদয়ে সায়াহ্ন/ নিয়ে পথ হাঁটি, প্রাণে ঝরে মরা পাতা,/ মৃদু হাওয়া বন্দিনীর শীতল ফোঁপানি,/ চোখ বড় বেশি জ্বালা করে' (মা'র কবরের পাশে দাঁড়িয়ে, *সৌন্দর্য আমার ঘরে*)। কবির কাছে মৃত্যু এবং হারানোর বেদনা পায় নতুন ব্যঞ্জনা '-মৃত্যু সব মানুষের নিয়তি, কবির কাছে অধিকন্তু তা শিল্পের কাঁচা মশলা এবং একটা বিষয়-ও বটে' (খান সারওয়ার, (২০০৪), 'ভূমিকা', *শামসুর রাহমান রচনাবলী*, ঐতিহ্য, ঢাকা)।

১৩. ঢাকার প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের শেষ সভায় শামসুর রাহমান পাঠ করেছিলেন 'কোনও একটি নিমগ্ন শহরকে' শিরোনামের কবিতা। কবিতাটির প্রশংসা করে মুস্তফা নূরউল ইলাম বলেছিলেন : 'আজ থেকে আমাদের কবিতা নতুন মোড় নিল' (রাহমান, ২০০৪ : ৫৯)। কবিতাটি *অগত্যা* পত্রিকায় ছাপা হলেও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। *পূবালী* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছাপা 'অন্তরাগের আগে' কবিতাটি কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় যৌক্তিকভাবে কবি ছিলেন পাকিস্তানের সমর্থক, সেই যুদ্ধের উত্তেজনায় শান্তির পক্ষে থেকে তিনি কিছু কবিতা লিখেছিলেন : 'আমার কোনও কাব্যগ্রন্থেই সেই কবিতাবলীর একটিও ঠাঁই পায় নি। এখন আফসোস হয়, কবিতাগুলো গ্রন্থভুক্ত হতে পারত। আমার প্রিয় শিক্ষক এবং কল্যাণকামী ড. খান সারওয়ার মুরশিদ সেই কবিতাবলীর একটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে তাঁর উঁচুদরের বিখ্যাত পত্রিকা New Value এ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সেই কবিতার শিরোনামটির অনুবাদ করেছিলেন এরকম —'A Red Rose on the Moving Branch of Time', প্রকৃত বাংলা শিরোনামটি হুবহু আমার মনে নেই' (রাহমান, ২০০৪ : ২১১-২১২)। *পূর্বাশা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বীপ' ও 'প্রার্থনার সময়' কবিতাদ্বয় কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই (কায়সুল, ২০০৬ : ২০)। এমনকি ছাপার অক্ষরে আসা শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা 'উনিশ শো উনপঞ্চাশ' কোনও গ্রন্থের আশ্রয় পায়নি।

১৪. '*পূর্ববাংলার* প্রথম আধুনিক কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায়। সেকালের আমরা ক'জন তরুণ আরমানিটোলা মাঠে এক পড়ন্ত বিকেলে বসে চিনা বাদাম চিবোতে চিবোতে *নতুন কবিতা* প্রকাশে উদ্যোগী হই। যতদূর মনে পড়ে সংকলনটির নাম আমি প্রস্তাব করেছিলাম' (রাহমান, ২০০৪ : ৮১)। *নতুন কবিতা* প্রকাশের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোক্তা ছিল ওয়ার্সি বুক সেন্টার। কাজটির প্রস্তাব প্রথম আসে আলাউদ্দিন আল আজাদের কাছ থেকে। কিন্তু কলকাতায় শান্তি সম্মেলনে যোগদান এবং নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে বেশ কিছুদিন আটক থাকায় কাজটি তিনি করতে পারেননি।

১৫. 'বিভিন্ন ধরনের সভা, সমিতি, সম্মেলন, মিছিলে তার অকুণ্ঠিত অংশগ্রহণ তাকে জনব্যক্তিত্বে পরিণত করে। এইসব কাজে কবি-লেখক-শিল্পীদের ঘনঘন অংশগ্রহণের পক্ষ আমি নই। এসব আমাদের জন্য নয়। লেখক-শিল্পীদের যথেষ্ট কাজ আছে। কবি তার বক্তব্য দেবেন কবিতায়, শিল্পী তার চিত্রে, লেখক তার রচনায়। তাদের কাজই তাদের সেরা মাধ্যম সে যেমন আত্মপ্রকাশের জন্যে, তেমনি দেশ ও সমাজসেবার জন্যেও' (চৌধুরী, ২০০৬ : ১১)।

১৬. 'বঙ্গবন্ধু তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রধান কর্তাকে পাঠালেন আমার কাছে, যার নাম সেলিমুজ্জামান। সেলিমুজ্জামান বললেন যে, বঙ্গবন্ধু আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলছেন, তিনি চান আমি যেন *দৈনিক বাংলার* সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। এটি লুফে নেয়ার মতোই এক প্রস্তাব, কিন্তু আমি জনাব সেলিমুজ্জামানকে বললাম যে, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারি *দৈনিক বাংলার* জন্যে অত্যন্ত একজন যোগ্য ব্যক্তি।

তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন আমাদের এই পত্রিকায়। তাঁকে এই পদ থেকে অপসারণ করা ঠিক হবে না বলে মনে করি' (রাহমান, ২০০৪ : ৩২০)।

১৭. 'রাজনীতির সঙ্গে আমি ঠিক প্রত্যক্ষভাবে জড়াইনি। তবে ছাত্র ইউনিয়নের ক্রিয়াকর্মের প্রতি আমার একটা সমর্থন ছিল, আগ্রহ ছিল এবং দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির ধারা তার প্রতি একটা আগ্রহ এবং অনুরাগ ছিল—এটা বলতে পারি' (শামসুজ্জামান ও আমিনুর, ২০১০ : ৩১০)।

১৮. ফজল শাহাবুদ্দীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে *কবিকণ্ঠ* নামক কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন একসময়। সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের কবিতা, কবি তখন মৃত। এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান বলেছেন : 'সুরজিৎ দাশগুপ্ত অল্প সময়ে জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা 'কবিকণ্ঠে'র জন্যে পাঠাতে পেরেছিলেন। কবিতাটির নাম 'আবার আসিব ফিরে'। সেই কবিতাটি পেয়ে, না লিখলেও চলে, আমারা অতিশয় আনন্দিত এবং কৃতার্থ হয়েছিলাম' (রাহমান, ২০০৪ : ১২৭)।

১৯. 'আমার যে বই বেরিয়েছে প্রথম, তার আগে একটা বই বের হতে পারতো। আমি সেগুলো কোনো বই আকারে প্রকাশ করিনি' (চৌধুরী, ২০১০ : ৩০১)। প্রথম কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি তিনি তৈরি করেছিলেন *মেধাবী রাতের নদী* নামকরণ করে। পরে তিনি নিজ হাতে সেই পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করেন: 'নানা পত্রিকায় মুদ্রিত আমার অনেকগুলো কবিতা একাট্টা করে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রেখেছিলাম। ...কিছুদিন পর পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এক বিকেলে ছাদে গিয়ে বসলাম, একা। চোখ বুলিয়ে গেলাম পুরো পাণ্ডুলিপিটির ওপর। বিরক্তিকর মনে হলো আমার। একটি একটি পাতা করে সবগুলো কবিতা ছাদ থেকে কাটা ঘুড়ির মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম না জানি কোন অজানায়' (রাহমান, ২০০৪ : ১৪২)।

২০. ভ্রমণকাহিনিটি *দৈনিক বাংলায়* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলায় সেটি আর কবির গ্রন্থ-তালিকায় স্থান পায়নি।

২১. কবির বাবা চেয়েছিলেন কবি যেন তার লাইব্রেরিতে বসেন। কবি সেটি করেননি, 'বাবা আমাকে লাইব্রেরির ভার নিতে বলেছিলেন। ...কিন্তু বাবার ইচ্ছা পূরণে আমি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারি নি' (রাহমান, ২০০৪ : ১২৮)। তাঁর বাবা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি ব্যবসা করে মুনাফা অর্জনের মধ্যে জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, 'কী ব্যবসা, কী বাণিজ্য—এই দুটোর কোনওটির প্রতিই কখনও তেমন আকর্ষণ বোধ করি নি। ধনকুবের হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে মন থেকে শত হস্ত দূরে রেখেছি সবসময়' (রাহমান, ২০০৪ : ১৩১)। চিত্রশিল্পে তাঁর বিশেষ আগ্রহ শৈশবকাল থেকেই ছিল, তিনি চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন, কখনও সাধারণ দর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন, *দৈনিক বাংলায়* চিত্রশিল্পের পক্ষে কলম ধরেছেন, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও গিয়েছেন চিত্রপ্রদর্শনীতে—'শামসুর রাহমানের সঙ্গে আমার শেষ দেখা ২৭ মে ২০০৬ তারিখে। দৃক গ্যালারিতে আটাশজন গুণিজনের ডিজিটাল বায়োগ্রাফি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে' (বশীর, ২০০৬ : ৩২)। চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর দরদ ও দূর্বলতা ছিল অসীম, তাঁর কবিতার জগতে তাই অনায়াসে প্রবেশাধিকার পান ভ্যানগগ, পিকাসো, মাতিস। শৈশব থেকে তাঁর পাঠ এবং চর্চার বিষয় ছিল গদ্য, তাঁর বোনের মৃত্যুতে তিনি গদ্যে একটি শোকভাষ্য লেখেন, স্কুলের গদ্য নিবন্ধ রচনাতেও তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, ফলে গদ্য-সাহিত্যিক হওয়ার একটা সম্ভাবনা শুরুতে ছিল। আবৃত্তিতে অংশ নিয়েছেন জীবনের বিভিন্ন সময়ে। প্রথম আবৃত্তির কালে তিনি প্রথম স্থান পেয়েছিলেন—'সেবার আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলাম।... আশ্চর্যের বিষয়, আনাড়ি আমিই প্রথম পুরস্কারটি পেয়ে গেলাম।' (রাহমান, ২০০৪ : ১১১)। এমনকি একসময় তিনি অধ্যাপক হওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে ভূঁইয়া ইকবাল বলেছেন : '১৯৭৩ সালে *দৈনিক বাংলার* কাজ ছেড়ে আমি যখন চট্টগ্রামে চলে আসি, তখন তিনি খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিনি নিজে সাংবাদিক না-হয়ে অধ্যাপক হতে পারলে তৃপ্তি পেতেন' (২০০৬ : ১১২)। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার কোনও প্রস্তুতি নেয়ার উদ্যোগই ছিল না আমার' (রাহমান, ২০০৪ : ৬৪)। অনেক সম্ভাবনার ভেতরে থেকে তাঁর চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল কবিতা।

২২. খান সারওয়ার মুরশিদ (২০০৪)। 'ভূমিকা', *শামসুর রাহমান রচনাবলী*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

## তৃতীয় অধ্যায়

# শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বদেশভাবনা

হাজার বছর ধরে প্রবহমান বাংলা কাব্যের ধারায় দেশবিভাগ (১৯৪৭) একটি ছেদচিহ্ন। ভাগ ও বণ্টনের রাজনীতি বাংলা কবিতাকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলার পৃথক ভূগোলে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। পূর্ব বাংলার কবিতার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্তি ঘটে রাজনীতির সঙ্গে, বিশেষ করে এ প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের বিতর্কের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে কবিতার ভবিষ্যৎ। কবি এবং কবিতা দেশ-কাল নিরপেক্ষ নয়, এ কারণে দেশবিভাগোত্তর পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে পূর্ব বাংলার শিল্প-সাহিত্য বিশেষত কাব্যধারাকে। পূর্ব বাংলার কবিতার নতুন গতিপথ নির্মাণের প্রশ্নে তৈরি হয় দ্বিধাবিভক্তি। এ সময় পশ্চিমবঙ্গের কবিতাধারার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসে একদল বেছে নিয়েছিলেন আরবি, ফারসি, উর্দুর মিশ্রণে এক নতুনতর বাংলা ভাষা, যার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল পুঁথিসাহিত্যের। অন্য দল প্রচলিত বাংলা ভাষার সাবলীল রূপটিকে বেছে নিয়েছিলেন কাব্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে, তারা পশ্চিমবঙ্গের কবিতার সঙ্গে ভাষাগত ব্যবধান বাড়ানোর চেয়ে কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকের পরিচর্যায় মনোযোগী হয়েছিলেন; রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে, শিল্পচর্চার আন্তরতাগিদে বিকশিত এই ধারাটি হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার কাব্যধারার মূলস্রোত। এই ধারাতে শামসুর রাহমানের আবির্ভাব। দেশবিভাগোত্তর কালে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে বিবদমান সময়ের ভেতরে থেকে কবিতার সঠিক পথ নির্ণয়ের বিষয়টি ছিল সুকঠিন। তাছাড়া কবিতার এই মূল ধারাটি ছিল রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিপরীত প্রান্তে। ফলে, শুরুতেই পূর্ব বাংলা নামক ভূখণ্ড এবং বাংলা কবিতার নিয়তি বৈরী পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চব্বিশ বছরের কবিতার ইতিহাস পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লেখা হতে থাকে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতা নকশালবাড়ি আন্দোলন ছাড়া আর কোন রক্তাক্ত ঘটনাবিজড়িত নয়।

পূর্ব-বাংলার নতুন কবিতাকাঠামো নির্মাণের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান প্রভাবক তৎকালীন রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং শোষণ ও বঞ্চনার অনুভব। এ কাব্যধারা নতুন হলেও উন্মূল ছিল না, তিরিশের কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ ছিল, যেমন তিরিশের সঙ্গে ছিল বিশ্বকবিতার সখ্য। শামসুর রাহমান পঞ্চাশের আত্মপ্রকাশলগ্নে তিরিশি কবিদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিশেষ করে এলিয়ট ও বোদলেয়ারের কাব্যচেতনাও তাঁকে যুগপৎ প্রভাবিত করেছিল। পূর্ব বাংলার কবিতার সঙ্গে বিশ্বকবিতার সংযোসূত্রের পথিকৃত শামসুর রাহমান, 'যিনি জীবনানন্দ দাশ

থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এলিয়ট থেকে লাওয়েল, বোদলেয়ার থেকে নেরুদা পর্যন্ত সকল কবির রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন নিবিড়ভাবে' (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ২৮০)। কাব্যে অগ্রজের প্রভাব রাহুর মতো, যথাসময়ে নিজস্বতায় প্রত্যাবর্তনের দূরদর্শিতা না থাকলে কালের অন্ধ গ্রাস কবি ও কবিতার সুনির্ধারিত পরিণতি। শামসুর রাহমানের প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতায় প্রতিভাসিত রোমান্টিক বিষাদ, নাগরিক ক্লেদ, রিক্ততা, দ্বিধাদীর্ণতা—এসবই বিশ্বকবিতার ঋণ। তবে ঋণ গ্রহণের পর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার বিমিশ্রণে তাকে নিজস্বতায় উত্তরণের প্রতিভা তাঁর ছিল, এই প্রজ্ঞাদীপ্ততা তাঁকে দেশবিভাগোত্তর কালের অন্যতম প্রধান কবিতে পরিণত করেছিল।

কবিতায় পঞ্চাশের দশক যাত্রা শুরু করেছিল তিরিশ ও চল্লিশের পুরোনো মূল্যবোধকে নবায়নের মধ্যে দিয়ে। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কাব্যধারার সমাজবাদী চেতনা অথবা রোমান্টিক গীতিকবিতা ভিন্ন বিকল্প পথ ছিল না, ভাষা আন্দোলন কবিতার সেই সম্ভাব্য গতিপথকে নিয়ে গিয়েছিল এক ভিন্নতর বাঁকে। এ এমন এক উদ্দীপনা, অস্তিত্বের সঙ্গে ভাষার এই গভীর সংযোজনাকে এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। ফলে, ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সঠিক মূল্যায়নের প্রশ্নে পূর্ব বাংলার কবিতা পেল নতুন রূপ, নতুনতর ব্যঞ্জনা। শামসুর রাহমান অবশ্য শুরুতে সময়, সমাজ ও স্বদেশ সচেতন ছিলেন না, রোমান্টিকতা দিয়ে তিনি জয় করতে চেয়েছিলেন কবিতাভুবন। নারী, নিসর্গ এবং নার্সিসাসি চেতনায় প্রগাঢ়ভাবে সমর্পিত ছিলেন তিনি, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'হ্যাঁ, আমি কবিতা এবং দয়িতার প্রেমে ডুবে 'সমাজ সংসার মিছে কলরব, এই রাবীন্দ্রিক শব্দমালাকেই ধ্রুবজ্ঞানে কবিতার পঙক্তিমালা রচনা এবং প্রেয়সীর চোখে চোখ মেলে, হাতে হাত রেখে কাটিয়ে দিয়েছি নানা প্রহর' (রাহমান, ২০০৪ : ২২৪)। তাঁর অভিপ্রেত গন্তব্য সম্পর্কে *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে জানা যায় :

ক.

যেখানে সূর্যের তলে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা
নিসর্গ মধুর মতো, ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে
অথবা যেখানে গাঢ় চন্দ্রবোড়া সঙ্গিনীর শাখায় আকুল,
ঋতুর মধুর রণে পরাক্রান্ত, সেখানে আমার অভিলাষ
অভিসারী। পিছনে থাকুক পড়ে অনেক দূরের
অনচ্ছ তারার মতো লোকালয়, তাকাবো না ফিরে।

('সুন্দরের গাথা', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

খ.

তোমার হাতের স্পর্শ, কপালের টিপ,
তোমার কণ্ঠের মৃদু গুনগুন ধ্বনি, হাসি, কালো
চুল আর অতল চোখের দুটি শিখা দিতে পারে যত আলো
তত আর দেয় নাকো অন্য কোনো জ্ঞানের প্রদীপ।

('জর্নাল, শ্রাবণ', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

লোকালয়কে তিনি 'অনচ্ছ তারার মতো' দূরত্বে রাখতে চান কবিতা-শরীর থেকে, এই উচ্চারণের ভেতর বস্তুতা থেকে কবিতাকে দূরে নিক্ষেপের প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে প্রেমের প্রগাঢ় অনুভবকে গ্রন্থপাঠলব্ধ জ্ঞান, ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ের চেয়ে আলোকিত অবস্থানে রেখেছিলেন। 'রাজরাজড়ার লড়াই' থেকে কবিতাকে সন্তর্পণে মুক্ত রেখে প্রেমের 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য। কিন্তু, শামসুর রাহমানের আত্মপ্রকাশলগ্নে দেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চাবুকের নিচে, এরকম পরিস্থিতিতে একজন সচেতন কবির পক্ষে কালের সংঘাত এড়িয়ে কেবল শিল্পসর্বস্ব কবিতাবলয়ে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। কবির চেতনা প্রসারিত হয়ে স্পর্শ করে কালকে, কালের ক্ষত উন্মোচিত হয় কবিতার গর্ভে। এ কারণে শামসুর রাহমান মালার্মের মতো নিজের কবিতার শিল্পশুদ্ধতা রক্ষার আন্তরিক চেষ্টার পরও ব্যর্থ হয়েছেন। লখিন্দরের বাসরঘরের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে প্রবেশ করা সাপের মতো সেখানে ঢুকে পড়েছে সমাজ, স্বদেশ, সমকাল :

আখেরে হলাম এই? আর দশজনের মতন
দৈনিক আপিস করা, ইস্ত্রি করা কামিজের তলে
তিনশো টাকার এই পোষমানা আমিকে কৌশলে
বারোমাস ঝড়ে জলে বয়ে চলা যখন-তখন?
এই আমি? এবং প্রভুর রক্তনেত্র সারাক্ষণ
জেগে রয় ঘানিটানা জীবনের চৌহদ্দিতে; ফলে
ঠাণ্ডা চোখে ঠুলি এঁটে দশটা-পাঁচটার জাঁতাকলে
অস্তিত্বকে চেয়ে দেখি নিখুঁত গোলাম, নিশ্চেতন।

('তিনশো টাকার আমি', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

উপরিউক্ত উদাহরণে শিল্পশুদ্ধ রোমান্টিক মন উধাও, আত্মবিবৃতির অন্তরালে এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন-জীবিকার বাস্তবতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের 'ওই মৌন আকাশের', 'মর্মর প্রাসাদ শুধু', 'আত্মজীবনীর খসড়া', 'গোষ্পদ এবং মন' কবিতাসমূহে যে আধা-বাস্তব উচ্চারণ তার নেপথ্যে আছে রোমান্টিক কবিতা-নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক

কবির অপারগতার যন্ত্রণা। অপারগতা অনিবার্য, কারণ 'নির্দ্বন্দ্ব সমাজ না হলে নিরঙ্কুশ কবিতাও সম্ভব নয়। অনুকূল পরিপার্শ্বের অভাব ও নিজের নিরঙ্কুশ উৎসারণের ব্যত্যয় তিনি সহজে মেনে নিতে পারেননি কখনই—তাই সর্বত্রই তাঁর মধ্যে এক অসামঞ্জস্যজনিত ক্ষোভ, বাধাহত ক্ষতের সোচ্চার যন্ত্রণা-আর্তি' (রহমান, ২০০০ : ১৮৯)। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের নাম কবিতায় শামসুর রাহমানের কবি সত্তায় সঞ্চিত 'আশ্চর্য বিষাদ', 'আতঙ্কের ফুল', এবং 'রোমশ অন্ধকারে'র উৎসে রয়েছে ওই 'সোচ্চার যন্ত্রণা-আর্তি'। এ কাব্যের কিছু কবিতায় সেই রোমান্টিক বিবিক্তি থেকে কবি যেন পরিত্রাণ পেতে খানিকটা উৎসুক, তাই যে লোকালয়কে লক্ষ-যোজন দূরে রাখতে চান, ফিরে তাকাবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, নিম্নোক্ত উচ্চারণের ভেতর দিয়ে যেন সেই দৃঢ়তা টলে ওঠে : 'আমাকে গ্রহণ করো তোমাদের নিকানো উঠোনে/ নারীর আর শিশুর ছায়ায় আঁকা, রক্তকরবীতে' ('অপাঙ্‌ক্তেয়')। যে গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্গে সংলগ্ন হবার প্রার্থনা তিনি জানান, সেটি লোকালয় এবং জনজীবনেরই একাংশ। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* সংযুক্ত হবার এই বোধ আরও প্রসারিত হয়ে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনযন্ত্রণা, ক্লেদ, দ্বিধাদীর্ণ মনের পরিচয় এ কাব্যের অনেক কবিতার মূলভাব দখল করেছে। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের 'নিখুঁত-নিশ্চেতন গোলাম' মধ্যবিত্তের চারিত্র্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'খুপরির গান', 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', 'ছুঁচোর কেত্তন', 'আত্মহত্যার আগে' কবিতাসমূহে। আত্মবলয়ের বাইরে বাস্তব জগৎ ও সমকালের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রবণতা এ কাব্যের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। এ সময় দেশ-কালের সঙ্গে সরাসরি সংযোগকে কবি অস্বীকার করলেও দেশ-কালের বাস্তবতা জমে উঠেছে কবিতার আন্তরভাবনায়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা 'যখন রবীন্দ্রনাথ', 'সূর্যাবর্ত' এবং 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাত্রয়ী সমকাল-সচেতনতার চিহ্ন বহনকারী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান নিয়ে কূট রাজনীতি ধূমায়িত হয়ে ওঠে ষাটের দশকের শুরু থেকে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে, পঁয়ষট্টিতে এসে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নিষিদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায়। শামসুর রাহমান এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকাশিত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব্যসাচী প্রতিভা-গুণে সমকালের এবং পরবর্তীকালের কবিগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, শামসুর রাহমান নিজেও রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রেরণার অন্যতম উৎস বলে স্বীকার করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈরী আচরণের মুখে রবীন্দ্রনাথ আরও তীব্রভাবে বাঙালির চর্চার কেন্দ্রে চলে আসেন, 'সামরিক শাসনের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল সার্বিক জাগরণ' (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ২৬৬)। শামসুর রাহমানের রবীন্দ্র-বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ সেই সাংস্কৃতিক জাগরণেরই অংশ।

শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* প্রথম 'স্বদেশ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রে ঘূর্ণায়মান মাতৃমূর্তিকে তিনি আরও ব্যাপক অর্থে স্বদেশের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন :

তাকে চিনে
নিতে পারি সহজেই যখন নিভৃত অনুভবে বারবার
একটি ভাস্বর নদী, ফলের বাগান, মাঠ আর
শস্যক্ষেত, দূরের পাহাড়
গলে গিয়ে একই স্রোতে বয়ে যায়, সীমা
মুছে যায় চরাচরে: স্বদেশের স্বতন্ত্র মহিমা
অনন্য উপমা তার।

('আমার মাকে')

স্বদেশও মাতৃময়ী, সঘন মমতা নিয়ে সে প্রতিপালিতা। দেশভাগের বদৌলতে পাওয়া পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে তখন বিরাজ করছে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের কালো দশক, প্রাণ খুলে কথা বলার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি লিখলেন ব্যঙ্গ কবিতা 'হাতির শুড়' :

> দেশে মার্শাল ল' কায়েম রয়েছে। আমি হঠাৎ একটি কবিতা লিখে ফেললাম। কবিতাটির নাম 'হাতির শুড়'। আগে আমি এ ধরনের কবিতা লিখিনি। সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল'—এ ছাপা হলো। একদিন টেলিফোন করে আমাকে বললেন, শামসুর রাহমান, তোমার 'হাতির শুড়' কবিতাটি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার ভাগ্য ভালো যে, দেশের রাজা এবং তার খাস সভাসদরা বাংলা ভাষা জানে না (রাহমান, ২০০৪ : ১৪৩)।

এ ধরনের কবিতা লেখার পর তাঁর 'তাকাব না কখনও বাইরে...ঘরে জানলা নেই' ধরনের উক্তি অনুজ্জ্বল হয়ে উঠল, পরিবর্তে দেশ-কাল-বাস্তবতার দিকে তাঁর মনোযোগ বেড়ে যাবার লক্ষণ প্রকাশ পেল এই বাক্যবন্ধে—'যুদ্ধবাজ সাইরেনে উচ্চকিত কৈশোর' এবং 'যৌবন দুর্ভিক্ষ-বিদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভাঙ্গে দেশ' ('আত্মজৈবনিক', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)। সিসিফাসীয় দর্শনের অনিকেত জীবনভাবনাকে স্পর্শ করে ঘনায়মান আর এক যুদ্ধের সংবাদ শোনান কবি—'চোখে ভ্রম,/ আরেক যুদ্ধের ছায়া যৌবনের অপরাহ্নে নামে'। *বিধ্বস্ত নীলিমা* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় শামসুর রাহমানের বয়স ছত্রিশ বছর, যৌবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ।

অস্থির সময় ও জীবনবাস্তবতার আঘাতে বিপন্ন কবির সঙ্গে জীবনানন্দের মনোজাগতিক সাক্ষাৎ ঘটে এ কাব্যের 'বৃষ্টির দিনে' কবিতায়, জীবনানন্দ তাঁকে বলেন : 'বর্ষায় নিমগ্ন হও, নিসর্গকে করো তীর্থভূমি'। জীবনানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দার্শনিক আলাপ এবং শেষের এই পরামর্শ ফলপ্রসূ হয়নি,[১] কারণ কবিতার শেষদিকে আমরা দেখতে পাই শামসুর রাহমানের অবস্থান :

> অগ্রজ কবির মন্ত্রণায় নিসর্গকে তীর্থভূমি
> জ্ঞানে দ্রুত যতটা এগোই তারও বেশি
> নিশ্চিত পিছিয়ে পড়ি বিতৃষ্ণায়, আর চিরকেলে
> বর্ষার জানুতে মাথা রেখে রেখে বড় ক্লান্ত লাগে।
>
> ('বৃষ্টির দিনে', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

উপরিউক্ত উদাহরণে 'পিছিয়ে' পড়া, 'চিরকেলে বর্ষা', 'মাথা রেখে রেখে' এবং সবশেষে 'ক্লান্ত লাগে' শব্দাবলী যেন জীবনানন্দের মন্ত্রণাকে নাকচ করে দিতে চাইছে। এই কাব্যের 'পুরাণ' শিরোনামের আরেকটি কবিতায় শামসুর রাহমান পূর্বজদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বজায় রেখে বলেছেন, 'তোমাদের কারুকাজে শ্রদ্ধা অবিচল, কিন্তু বলো—/ কী করে পিতার শব কাঁধে বয়ে বেড়াই সর্বদা?' এ উক্তিতে রয়েছে নতুন নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠার ইঙ্গিত। জীবনানন্দ যেমন কবিতায় পুরোনোর প্রয়োজনকে নস্যাৎ করে দিয়ে দাবি করেছিলেন—'কোনো এক নতুন—কিছুর/ আছে প্রয়োজন' ('কয়েকটি লাইন', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)। কবি মাত্রই নিজস্বতায় উত্তরণের পথে আসেন এরকমই কোনো উচ্চারণ বা উপলব্ধি থেকে, এই পর্বে এসে শামসুর রাহমানেরও প্রয়োজন ছিল নতুন কোনো উদ্দীপনা। বস্তুবিশ্বের চকিত ইশারায় ক্ষতবিক্ষত অন্তরলোক নিয়ে শামসুর রাহমান জনজীবনের মিছিলে যোগ দিতে আগ্রহী, আবার কবিতাকে সমষ্টির জীবন-কাতরতা থেকে দূরে রাখার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃতও নন তিনি, ফলে এ কাব্যে টানাপোড়নের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *নিরালোকে দিব্যরথে* (১৯৬৮) বিধৃত হয়েছে দেশ-কালের সঙ্গে সংলগ্ন হবার পূর্বসূত্র। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার পাশাপাশি এ দেশে সমাজকাঠামোর অন্তরালে ঘনীভূত শ্রেণি-ব্যবধান এ কাব্যের অস্থি-মজ্জা নির্মাণে অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজ সচেতনতা তাঁর নারী ও নিসর্গগামী, আত্মনিমগ্ন সত্তাকে রদ করে দিতে যেন উন্মুখ। তাই সৌন্দর্যসন্ধানী কবির চোখে প্রেমের প্রতীক হয়ে বসন্ত আর দেখা দেয়নি :

> প্রচুর আদর খেয়ে প্রকৃতির বসন্তের পেছনে পেছনে
> করি ধাওয়া, খুঁজি তাকে দিনমজুরের
> খুপরিতে, রেশনের দোকানের দীর্ঘ পাঁচমেশালী কাতারে,

মুদীর চালায়, কারখানায়,
আর ঢেউ-খেলানো টিনের ছাদে, ডোবার কিনারে।
সেখানে বসন্ত কই?

('অধর্মণের গান', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

বসন্ত এখানে প্রেম-বিবিক্ত হয়ে জীবনের ভিন্নতর তাৎপর্যের ভেতরে কেন্দ্রীভূত, নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও যুগলের মদির কামনার পটভূমি থেকে বসন্তের উত্তরণ ঘটেছে জীবনবাস্তবতার গভীরে—'বসন্ত প্রতিষ্ঠা খোঁজে তারুণ্যের উদ্দাম মিছিলে,/ সংস্কৃতির উচ্চকিত স্বাধিকারে, পর্বত-টলানো হরতালে।' দেশে তখন আইয়ুব খানের শাহী তখতের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে গণ-আন্দোলন, মিছিলে-হরতালে প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল স্বৈরশাসনবিরোধী চেতনা, যে চেতনার অন্তরালে জমাটবদ্ধ হচ্ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি; একই সময়ে বিশ্বারাজনীতিতে চলছিল নানা ভাঙাগড়া। ফলে, দেশ-কাল-সমাজ বিচ্ছিন্ন প্রেম 'রিক্ত'[২] রূপ নিয়ে কবির কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে, প্রেমের পরিচর্যায় অপারগতার কথাও অকপটে স্বীকার করে নেন। 'আমি-তুমি'র প্রেমময় সর্বনামের জগতে সেই সুযোগে ঢুকে পড়ে বিশ্বরাজনীতির প্রসঙ্গ :

আমরা যখন ঘড়ির দুটি কাঁটার মতো
মিলি রাতের গভীর যামে,
তখন জানি ইতিহাসের ঘুরছে চাকা
পড়ছে বোমা ভিয়েতনামে।

('প্রেমের কবিতা', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

অথচ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের 'জর্নাল, শ্রাবণ' কবিতায় এই প্রেম ও প্রেয়সীর কাছে তুচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছিল গ্রন্থপাঠলব্ধ জ্ঞান, বিশ্বরাজনীতির অভিজ্ঞান। পুরোনো সেই ধ্যান-ধারণা থেকে সরে আসতে হয়েছিল শামসুর রাহমানকে। কারণ, ছদ্ম উপনিবেশবাদের প্রেতায়িত সময়ে বন্দি স্বদেশ, তাই তিনি স্মরণে আনেন কাজী নজরুল ইসলামের নাম, যিনি বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। 'পোড়ো বাড়ি' কবিতায় নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রণা উন্মোচন করেছেন নজরুলের কাছে, সংকট উত্তরণে তাঁর কবিতার সেই শাণিত কৃপাণের ধার ঋণ নিতেও কী আগ্রহী শামসুর রাহমান? প্রসঙ্গত স্মরণীয় রাহমানীয় পঙক্তিমালা :

শেকল ছেড়ার গানে রাত্রিদিন সেই ঝোড়ো যুগে
নিজেই হয়েছো অগ্নিবীণা।
সেই গানে মেলাই সত্তার সুর, নির্বাসনে আজো

চৈতন্যের পল্লী জ্বলে, গান গাই শৃঙ্খলিত দাস।

('পোড়ো বাড়ি', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

জাঁ পল সার্ত্র কথিত নিওকলোনিয়ালাইজেশন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন শামসুর রাহমান, তাই তিনি শরণ নিয়েছিলেন নজরুলের। *কলোনিয়ালিজম এবং নিওকলোনিয়ালিজম* (১৯৬৪) গ্রন্থে সদ্য উপনিবেশমুক্ত মেকি স্বাধীনতার স্বাদ নিতে থাকা দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে সার্ত্র বলেছিলেন—'উপনিবেশবাদ বিদেয় হবার নয়, সে নব্য উপনিবেশবাদের মুখোশ পরে ফিরে আসবে' (বসাক, ২০০৬ : ১৪০)। সার্ত্র কথিত সেই 'ফলস ইন্ডিপেন্ডেন্স' এবং 'ইনফারনাল সাইকল অব কলোনিয়ালিজমে'র জ্বলন্ত উদাহরণরূপে দেখা দিয়েছিল দেশবিভাগোত্তর পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা। শামসুর রাহমান দেখেছিলেন বিচূর্ণিত সমকাল, বেহাল স্বদেশ, যেখানে 'ব্যাধেরা হননের নেশায় অস্থির' ('মেঘের নীল ইজিচেয়ারে', *নিরালোকে দিব্যরথ*)। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-দমনের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল পূর্ববাংলা। তাদের রক্তপিপাসার প্রথম নিদর্শন বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, তাদের অপশাসন দুরারোগ্য ব্যাধির মতো আক্রান্ত করেছিল কবির মাতৃভূমিকে :

এবং আমার বুক পূর্ব বাংলার মতোই হু হু, তীব্রতর
কাশির দমকে বড্ড দুমড়ে যাই, কুঞ্চিত চাদর
গোধূলি-তরল রক্তে বারবার ওঠে ঝক্‌ঝকিয়ে।

('ক্ষয়কাশ', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

দেশকে নব্য-উপনিবেশের করালমুক্ত করতে শামসুর রাহমানের কবিতা হতে চেয়েছে দায়বদ্ধ। 'এ দেশের পোকা-মাকড়, জীবজন্তুগুলোসুদ্ধ ভীষণ অসুখী', এইসব অসুখের পেছনে ছিল স্বদেশের অসুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ। *নিরালোকে দিব্যরথ* কাব্যের 'টেলেমেকাস' কবিতায় দেশকে পেনিলোপির অবস্থানে রেখে টেলেমেকাসের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে কবি অপেক্ষারত নিরুদ্দেশ পিতার। সে সময় পূর্ব বাংলার রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে, শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা ও স্বায়ত্তশাসনের জোরালো দাবির মুখে কৌশলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এ আন্দোলনকে নেতৃত্ব-শূন্য করার অপপ্রয়াস দেখা যায়। শামসুর রাহমান যখন 'টেলেমেকাস' লিখেছিলেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে বন্দি, তিনি তখনও 'জাতির পিতা' নন, কিন্তু জাতির ত্রাণকর্তা, তাঁর অনুপস্থিতিতে ইথাকার মতই অসহায় হয়ে পড়েছিল দেশ; সেই প্রেক্ষাপটে 'টেলেমেকাস' কবিতার জন্ম। এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান বলেছেন : 'শেখ মুজিবুর যখন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাননি, তখনই সম্ভবত ১৯৬৬ কিংবা ১৯৬৭ সালে তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লিখি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর

আড়ালে। কবিতাটির নাম 'টেলেমেকাস' (রাহমান, ২০০৪ : ২২২)। তিনি দেখেছেন 'আগাছার দৌরাত্ম্য বাগানে বাড়ে প্রতিদিন', মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ টেলেমেকাসের সামনে অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ, এরকম পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের দায় কাঁধে তুলে নেবার দৃঢ়তা দেখা যায় তার মধ্যে :

বাগানের আগাছা নিড়ানো
তবে কি আমারই কাজ? বুঝি তাই ঋতুতে ঋতুতে
সাহস সঞ্চয় করি এবং জীবন তরঙ্গের
বর্ণিল লাগাম ধরে থাকি দৃঢ় দশটি আঙুলে।

চেতনাগত সাদৃশ্যে কবি নিজেই যেন হয়ে ওঠেন টেলেমেকাস। নিরুদ্দেশ পিতার অপেক্ষায় থাকা টেলেমেকাসের চোখে ধরা পড়েছে 'সমস্ত ইথাকা, গরগরে জনগণ প্রতিষ্ঠিত/ অনাচার, অজাচার ইত্যাদির চায় প্রতিকার।' এরকম পরিস্থিতিতে কালের প্রতিকার-প্রত্যাশার সম্মুখে টেলেমেকাসের মতো কবির সত্তাতে জেগে ওঠে দায়বোধ। এ কাব্যের শুরুতেও কবির এই দায়বদ্ধতার জায়গাটি ছিল প্রশ্নবিদ্ধ, তখন বলেছিলেন :

এখন যদি লিখি শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রখর কতিপয় পংক্তি
তবে কি বিস্মৃত বাগানে পুনরায় ফুটবে রক্তিম ফুলদল?
তবে কি পৃথিবীতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ঘটবে অচিরাৎ অবসান?
তবে কি সভ্যতা সত্যি যাবে বেঁচে ছন্দ মিল আর প্রতীকে?
('দু'এক দশকের', নিরালোকে দিব্যরথ)

সেইসব দ্বিধা ও সংশয় পেরিয়ে যাবার প্রত্যয় নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন টেলেমেকাসের রূপকল্প, এ সময় থেকে ক্রমান্বয়ে স্বদেশের সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে নিবিড় গ্রন্থি বেঁধেছিল তাঁর কবিতা। এ পর্যায়ে এসে তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর কবিতার চারিত্র্য পরিবর্তন এবং রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠার বিষয়টি : 'রাজনীতি-বিমুখ এই আমি ক্রমান্বয়ে রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠলাম। আমার কবিতায় তার ছায়াপাত শুরু হয়' (রাহমান, ২০০৪ : ২২৩)। *নিরালোকে দিব্যরথ* কাব্যে বাস্তব চেতনাকে আরেকটু প্রসারিত করে তিনি জনজীবনের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন, ভেঙেছিলেন রোমান্টিকতার দেয়াল, আত্মপরায়ণতা। খানিকটা দ্বিধা থাকলেও রোমান্টিক বিষাদের উন্মুলতা থেকে তিনি যে বাস্তবে ফিরবেন তাঁর ইঙ্গিত এ কাব্যে দিয়ে রেখেছেন : 'লেখার টেবিলে চড়ুই রটায় ফের/ আনন্দ-ঘন নতুন বস্তুবোধ' ('দৃশ্যপট, আমি এবং অনেকে', *নিরালোকে দিব্যরথ*)। বস্তুময় বাস্তবে চোখ মেলে তিনি দেখলেন :

শার্টের কলার ঠিক করে কেউ হেঁটে যায় দ্রুত, হাসিমুখে
কেউবা সেলুনে ঢোকে, কেউ
পুরোনো জুতোর কাদা ঝেড়ে ঝেড়ে আড়চোখে দ্যাখে
সিনেমার বর্ণাঢ্য পোস্টার।
কেউবা ছেলের হাত ধরে
দাঁড়ায় রাস্তার মোড়ে, ধাবমান ট্রাকের শত্রুতা
থেকে গা বাঁচায় আবশ্যিক ক্ষিপ্রতায়।
দেখি কেউ বুড়ো সুড়ো একজন, পান
চিবুতে চিবুতে হাল্কা রসিকতা করে
পড়শীর সঙ্গে আর অবহেলে কেউ অশ্লীল গানের কলি ভেঁজে
লক্কর গাড়িতে জোতে ডানা-কাটা হাড় জিরজিরে পক্ষীরাজ।

('দৃশ্যপট, আমি এবং অনেকে', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

জনজীবন প্রবাহের দিকে ফিরে তাকানোর নেপথ্যে সক্রিয় ছিল সেই 'আনন্দঘন নতুন বস্তুবোধে'র প্রেরণা। *নিরালোকে দিব্যরথে* এসে তিনি যেভাবে সমাজতান্ত্রিক চেতনার কথা বলেছেন, পূর্বের অন্য কোন কাব্যগ্রন্থে এমন করে বলেননি। 'দৃশ্যপট, আমি এবং অনেকে' কবিতায় সূর্যের 'লাল মুখের' উল্লেখে তিনি নতুন করে সাম্যবাদী চেতনার উদ্বোধনী বাণী শোনান। আর 'অসাধ্য' শব্দটি ব্যবহার করে জানিয়ে দেন এই উত্থান অপ্রতিহত। এই কবিতায় 'লাল' এবং 'দিনার' প্রতীকী শব্দ দুটি নিকট দূরত্বে রয়েছে, যা ইঙ্গিতময়। একদিকে সমাজতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য অবস্থান, অন্যদিকে পুঁজিবাদের 'দিনারের ঝকমকি'। এখানে 'বিড়াল' কী বঙ্কিমী তাৎপর্যমণ্ডিত? অর্থনৈতিক জীবনের দৈন্যদশা উঠে আসে 'কয়লা'র মাজুনি এবং চায়ের 'সামান্য' সরঞ্জামে। তখন নেপথ্যে বাজতে থাকা আলী আকবর খানের 'আশাবরি' কোন রোমান্টিক শিহরণ বয়ে আনে না। কবিতার এ পর্যায়ে 'দৃশ্যপট' বদলায় এবং কবি 'আমি' থেকে চলে যান 'অনেকে'র সন্নিধানে। ঘরের পরিবর্তে রাজপথ, সেখানে জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত পরিক্রমা, 'রঙিন বেলুনে'র উল্লেখ ইতিবাচক সময়ের ইঙ্গিতবাহী। রাজপথের ভিড়ের দৃশ্যায়নের ভেতর তিনি এ শহরের বিশেষ এক শ্রেণির কথা বললেন, যারা 'হাপর টানে', 'পেটায় লোহা', 'ঘুরিয়ে চাকা' জীবিকা নির্বাহ করে—এক কথায় যাদেরকে আমরা শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে চিনি। শামসুর রাহমানের 'বস্তুবোধের সরণি বেয়ে পঙ্‌ক্তিভুক্ত হতে থাকে যেসব খণ্ডচিত্র তা প্রতিবিম্বিত করে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশকে' (কামাল, ২০১৪ : ১১৭)। এরপর তিনি 'অনেকে' থেকে আবার 'আমি'র বৃত্তে ঢুকে পড়েন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সুলভ ক্ষণবাদী চিন্তাকে এবং নৈরাশ্যকে খানিকটা স্পর্শ করে আবার জীবনবাদে আস্থা রাখেন। কবিতার সমাপ্তিসূচক বক্তব্যে

সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যের উজ্জীবনী আশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায়, এরকম আশাবাদ কবিতায় রাখতে পারেননি বলে অনেক সময় সমর সেনকে তাঁর বামপন্থী আদর্শ নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়েছে, অন্যদিকে শামসুর রাহমান হতাশায় নিমজ্জিত থেকেও রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রতিনিয়ত। এই কাব্যে বাম ভাবাদর্শের একাধিক চিহ্ন রয়েছে—'তারা ক'টি যুবা' কবিতায় 'লাল গোলাপের নতুন ইস্তাহারে'র কথা বলেছেন, তাছাড়া কাব্যগ্রন্থটি তিনি বিষ্ণু দে'কে এবং 'পোড়ো বাড়ি' নামক কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছেন। কবিতার ইতিহাসে তাকালে দেখা যায়, নজরুলের হাতে বাংলা কবিতার সাম্যবাদী চেতনার উদ্বোধন আর বিষ্ণু দে এই চেতনার দক্ষ কারিগর। শামসুর রাহমান এই যে বস্তুবোধে আক্রান্ত হচ্ছেন, কবিতার দৃশ্যপটে ঠাঁই করে নিচ্ছে জনজীবন, তৈরি হচ্ছে সমষ্টির জন্য কাতরতা, এই সমষ্টি-কাতরতার দুটো ভিন্ন মাত্রা আছে তাঁর কবিতায়—একদিকে সমাজতন্ত্রের তাড়না, অন্যদিকে দেশের জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনা গঠনের প্রয়োজনে সমষ্টিকে জমাটবদ্ধ করার তাগিদ। প্রথমটি বিশেষ একটি শ্রেণির জন্য, দ্বিতীয়টি শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের। রোমান্টিক, স্বপ্নবাজ কবি হিসেবে যাঁর যাত্রা, তিনি কেন গতিপথ বদলে জনজীবনের বাস্তবতার দিকে মুখ তুলে তাকালেন? আত্মস্থ করলেন বস্তুবাদী জগতের পাঠ?—যেখানে কবি হিসেবে তাঁর প্রয়াস ছিল ভিন্ন :

> স্বপ্নে বুঁদ হয়ে
> বস্তু জগতের প্রতি উদাসীনতার ডিঙি ভাসিয়ে
> ভাটিয়ালি গাওয়া অথবা বনবাদারে
> এক-একা ঘুরে বেড়িয়ে গোধূলির ঘন্টাধ্বনি শোনার কথা
> ছিল আমার।
>
> ('কথা ছিল না', *সে এক পরবাসে*)

বলেছিলেন, 'পদ্মপাতায় মাথা রেখে থাকবো শুয়ে,/ নানা রঙের স্বপ্ন দেখবো, ইচ্ছে ছিলো' ('স্বপ্ন গাঁথি', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*)। অথচ কলাকৈবল্যবাদী শিল্প-চেতনা থেকে তাঁকে ঘুরে দাঁড়াতে হলো সমাজ-রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খল চারিত্র্য ও সমকালের দিকে, সেইসঙ্গে ছিল তাঁর সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। কবিতার বিষয় বদলে গেল, দুঃসময়ের পীড়নে বদলে গেল বলার ভঙ্গি। স্বদেশকে যেভাবে আক্রান্ত হতে দেখলেন সেই দৃশ্যভাষকেই করে তুললেন কবিতা—ফলে কবিতা শৈল্পিক বিবর থেকে বেরিয়ে দুঃসময়ের শিকল ভাঙার হাতিয়ারে পরিণত হলো, অনেকটা নজরুলীয় ভঙ্গিতে। কবিতা দিয়ে ভাঙতে চাইলেন, গড়তে চাইলেন, রক্ষাও করতে চাইলেন। কবিতার শৈল্পিক বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ হলেও কবি কালের ক্ষত উন্মোচন করলেন অকপটে :

যখন অত্যাচারীর হিস হিস চাবুকের ছোবলে
নীল হয়ে যাচ্ছে আমার শহরের পিঠ,
যখন জালিমের সাঁড়াশি উপড়ে ফেলছে
আমার শহরের চোখ, যখন পালিশ করা বুটের লাথিতে
ভেঙে যাচ্ছে আমার শহরের পাঁজর,
তখনও কি আমাকে ভাবতে হবে বিশুদ্ধ কবিতার
আবৃত স্তনের কথা?

('কথা ছিল না', *সে এক পরবাসে*)

স্বদেশকে নিয়ে রাজনীতির নানা অপকৌশল বিষয়ে তাঁর সচেতন মন পরবর্তীকালে স্বদেশ সংক্রান্ত অসংখ্য কবিতার উদগাতা, *নিজ বাসভূমে* তাঁর সেই সচেতনতার প্রথম পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর। রোমান্টিকতা থেকে বাস্তবতার দিকে শামসুর রাহমানের ধীরলয়ে যাত্রার নেপথ্যে ছিল স্বদেশবীক্ষার গভীর সংশ্লেষ। পারিপার্শ্বিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে দেখেছিলেন দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা শঠতার শতমুখ। কবিতায় 'আত্মপ্রতিকৃতি' ধরতে গিয়ে *রৌদ্র করোটিতে* প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি, নিজের একান্ত পরিচয় অনুসন্ধানে উৎসুক কবির আত্মজিজ্ঞাসা ছিল—'আমি কে? কী করি সারাক্ষণ সমাজের চৌহদ্দিতে?' *নিজ বাসভূমে* তিনি এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন, পূর্বের সেই জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্তির অনাসক্তি কাটিয়ে সমাজ পরিবর্তনে, জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ঘনবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত করলেন কবিতাকে। এ শুধু কবিতার প্রয়োজন নয়, অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে প্রাণের ভেতর থেকে নিংড়ে আনা পঙ্‌ক্তিরা এ পর্বে তাঁর স্বদেশভাবনার প্রতিনিধি। তিনি এক ক্রমবিবর্তনের ভেতর দিয়ে এ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিলেন, সেই বিবর্তনের গ্রাফ তাঁর প্রথম দিকের চারটি কাব্যে সংবদ্ধ নয়, বিস্রস্তভাবে ছড়ানো রয়েছে। তবে, প্রথম চারটি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর মানস-বিবর্তন এবং স্বদেশাভিমুখে যাত্রার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

ক. আমার খামার নেই নেই কোনো শস্যকণা
আছে শুধু একটি আকাশ
তারই কিছু আলো-নীল আজো হে সুদূরতমা
ভালোবেসে তোমাকে দিলাম।।
(*প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

খ. আব্বা ও আম্মাকে

*(রৌদ্র করোটিতে)*

গ. জোহরাকে

ভীষণ অস্থির আমি, সম্প্রতি ক্ষমায় অপারগ। ...আজীবন যে নীলিমা ভালোবাসো তা-ও অবিরত সর্বত্র পড়েছে খসে ভয়ানক দ্রুত চাপ চাপ রক্তের মতো।

*(বিধ্বস্ত নীলিমা)*

ঘ. শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে শ্রদ্ধাস্পদেষু

*(নিরালোকে দিব্যরথ)*

ঙ. আবহমান বাংলার শহীদদের উদ্দেশ্যে

*(নিজ বাসভূমে)*

*নিজ বাসভূমে*র নামকরণ এবং উৎসর্গপত্রের ভেতরেই দেখা যায় এক বিশাল 'উল্লম্ফন'—যেটাকে উল্লম্ফন না বলে আরও গভীর বিশ্লেষণে বলা যায়—উত্তরণ। রোমান্সঘনতা ছেড়ে, আত্মকেন্দ্রিকতার বলয় ভেঙ্গে তিনি সংলগ্ন হয়েছিলেন বস্তুজগতের সঙ্গে, স্বদেশের সঙ্গে, যার প্রথম ধাপে ছিল ভাষা আন্দোলন।

**ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান**

শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে, যার আট বছর পূর্বে ঘটে গিয়েছিল ভাষা আন্দোলন। নিজেদের স্বরূপে চিনে নেবার জন্য বাঙালির জাতীয় জীবনে এ আন্দোলন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনে বাংলা ভাষা-বিষয়ক শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতাটি ছাপা হয়, অন্যদিকে ভাষা আন্দোলন-সংক্রান্ত কবিতা প্রথম গ্রন্থবদ্ধ হয় *নিজ বাসভূমে* কাব্যে, ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হবার ১৮ বছর পর। তিনি ভাষা আন্দোলনকে গ্রন্থবদ্ধ করতে কেন এতটা সময় নিলেন? এর পেছনে দু'টো কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে – প্রথমত, কাব্যচর্চার শুরুতে শিল্পের সাধনাকে জীবনসাধনার সঙ্গে একীভূত করে দেখার মতো জীবনদৃষ্টি শামসুর রাহমানের ছিল না। তিনি জীবনের বস্তুসত্যের সংসর্গ থেকে শিল্পকে পৃথক করে রাখতে চেয়েছিলেন। তখন শামসুর রাহমান কোন তত্ত্ব-তাড়িত নন, বাস্তবতা-শাসিত নন, 'আমি' নামক এক একক সত্তার আনন্দ-বেদনায়

কাতর, রোমান্সমুখর। দ্বিতীয়ত, যে-কোন ঘটনাকে কাব্যে পরিণত হতে প্রয়োজন হয় সময়ের রসায়ন, জমতে হয় উপলব্ধির গাঢ়তা :

> উপলব্ধির জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তথ্যকে, ঘটনাকে কোনো-এক সমগ্রের অংশরূপে দেখতে হয় তবে যদি জেগে ওঠে সেই সুর, যাতে আজকের কথাই চিরকালের কথা হয়ে ওঠে। যা-কিছু ঘ'টে যাচ্ছে শিল্পের ক্ষেত্রে তার কোনো মূল্যই নেই যতক্ষণ-না শিল্পীর মন সেটাকে উপার্জন করছে, সেই মানস-রসায়নের প্রতিক্রিয়াতেই সত্য ক'রে পাওয়া হয় তাকে, সত্য ক'রে প্রকাশ করা হয়। (বসু, ২০১৫: ১৫১-১৫২)

সেই 'অপেক্ষা'ই হয়তো শামসুর রাহমানকে দেরি করিয়ে দিয়েছে ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে কবিতায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে। *নিজ বাসভূমে* বিলম্বে স্থান পাওয়া কবিতাগুলো ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের মধ্যে অন্যতম, এ অর্জন হয়তো সেই 'রসায়নের' গুণে।[৩] ভাষা আন্দোলন তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, বাঙালি হিসেবে এ আন্দোলনকে নিয়ে তিনি গর্বিত এবং তাঁর কবিতার বাঁকবদলে এ আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৪৭ সালে দুটি পৃথক ভূগোলকে এক অভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে জঠরায়ণের যে ভ্রান্ত ও বিতর্কিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয় থেকেছে বাঙালির জাতীয় জীবনে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের পাশাপাশি কবি-শিল্পীদের জীবনও অস্থির এবং বিপন্ন হয়েছে, কবিতার ভেতরে থেকে গেছে সেইসব দিন-কালের ছায়ারেখা। দেশভাগের পর বাঙালির জাতীয় জীবনে সংঘটিত সবচেয়ে বড় সংঘাতটির নাম ভাষা আন্দোলন। ভাষার সর্বগ্রাসী ক্ষমতাকে ব্যবহার, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় যুগে যুগে নানা দেশে নানা মাত্রায় ভাষার রাজনীতি হয়েছে, তবে বাংলা ভাষার মতো এমন সক্রিয় আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বাঙালি জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ এই আন্দোলনে শামসুর রাহমান সরাসরি যোগ দিতে পারেননি, তবে এই আন্দোলনের উদ্দীপনা তাঁর কাব্যচর্চায় নতুন বাঁক সৃষ্টি করেছিল, ভাষা আন্দোলনে শরীরী উপস্থিতি না থাকলেও মানসিক সংযুক্তির ফলে এমনটি সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেছেন : 'অসুস্থতা আমাকে একুশে ফেব্রুয়ারির মিটিং ও মিছিলের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেছে সত্য, কিন্তু কেড়ে নিতে পারেনি বাংলা ভাষার প্রতি আমার প্রবল ভালবাসাকে, কবিতার প্রতি অকুণ্ঠ নিবেদনকে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস আমার কবিতা রচনায় একটি নতুন বাঁকের জন্ম দেয়' (রাহমান, ২০০৪ : ৯৬)।

ভাষা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকা একটি উপাত্ত। বর্তমান মানব সভ্যতায় ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের মাধ্যমই নয়, ভাষার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিসত্তাও পড়ে বিলুপ্তির মুখে, নষ্ট হয়

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, হুমকির মুখে পড়ে ব্যক্তিসত্তা, এ কারণে মাতৃভাষাকে রক্ষার সংকল্প মানুষের মজ্জাগত। বায়ান্নতে যে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয় সেখানে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পাশপাশি নতুন এক জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাঙালি। ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ 'পাকিস্তানি' হিসেবে যে পরিচয় নির্মাণ করেছিল, সেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ রূপান্তরিত হয় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে, ভাষা-সূত্রে নির্মিত হয় নতুন পরিচয়—'বাঙালি'। ভাষা আন্দোলন বলে আমরা যে সুনির্দিষ্ট সময় ও ঘটনাবলিকে চিহ্নিত করে থাকি, তার সূচনা ও নিষ্পত্তির কাল ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের প্রশ্নে যেসব প্রস্তাব ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল দীর্ঘমেয়াদী এবং সাংঘর্ষিক। বিতর্ক শুরু হয়েছিল ৪৭-এ, শেষ হয়েছিল ১৯৫৬ সালে, বাংলা ভাষাকে নিয়ে চক্রান্ত সক্রিয় ছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ব্যাপারটি প্রথমদিকে কাগজ-কলমে, ভাষণে-বক্তৃতায়-বিবৃতিতে ও স্মারকলিপিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও, পশ্চিম পাকিস্তানিদের অযৌক্তিক আচরণে তা সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। বাংলা ভাষা নিয়ে সংঘর্ষের প্রাথমিক সূচনা ঘটে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং ১১ মার্চ। এসময় ছাত্ররা পিকেটিং করলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। ১১ মার্চ ধরপাকড় ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এক বিবৃতিতে বলা হয়—'দেশের শতকারা ৬৮ ভাগ মানুষের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন দমন করার জন্য নাজিমুদ্দীন সরকার ফ্যাসিস্ট নীতি অবলম্বন করেছেন' (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০ : ৮৩)। এই ফ্যাসিস্ট নীতির নেপথ্যে ইন্ধনদাতা হিসেবে প্রধানত মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং ফজলুর রহমানকে চিহ্নিত করা যায়। ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি—রফিক, সালাম, বরকতের রক্তদানে, তাঁদের মৃত্যুতে এ আন্দোলন আর শুধু ভাষা-সচেতন বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সাধারণ মানুষও এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয় : 'ভাষা আন্দোলনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বস্তুত, ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষার যে-দাবি করেছিলেন, রক্তপাতের ঘটনার ফলে তা সাধারণ মানুষের দাবিতে পরিণত হলো' (মুরশিদ, ২০১০ : ৪২)। দেশবিভাগোত্তরকালে এ আন্দোলন ছিল বাঙালির প্রথম এবং সফল গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। ততদিনে বাঙালির ভেতরে স্বাতন্ত্র্যবোধ পুরো মাত্রায় জেগে উঠেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের বৈরী মনোভাবের মুখে তাদের ভাষাগত জাতীয়তাবাদ পরিণতির জন্য উন্মুখ। দীর্ঘ নয় বছরের ভাষা সংগ্রামের স্মৃতিকে সজীব করে রেখেছিলেন বাংলার কবিরা, এ সময় ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচিত কবিতা লেখেন হাসান হাফিজুর রহমান।[৪] *নিজ বাসভূমে* কাব্যগ্রন্থে শামসুর রাহমান লিখেছিলেন ভাষা ও বর্ণমালা

বিষয়ক একাধিক কবিতা—'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি বাংলা ভাষার সঙ্গে কবির নিবিড় আত্মিক সম্পর্কের মহাভাষ—'তুমি আর আমি/ অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় লীন' ('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', *নিজ বাসভূমে*)। তাঁর কাব্যযাত্রার ক্রমে 'নিজ বাসভূমে' পঞ্চম এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ; এ কাব্যে পূর্বের আত্মমুখীনতা ও রোমান্টিক বৃত্তায়ন থেকে বেরিয়ে এসে সমকালের স্বদেশ-পরিস্থিতিকে করেছেন কাব্যের অনুষঙ্গ। *নিরালোকে দিব্যরথে* বলেছিলেন 'অথচ আমরা আজো পরবাসী/ নিজ বাসভূমে' ('পোড়োবাড়ি')। সেই পরবাসী বাসভূমে পরদেশী- পরভাষী শাসকের কৃপাণের তলে বাংলা ভাষা। ভাষা আন্দোলনের বহু বছর পরে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি, ভাষা-চক্রান্তের পুরো ইতিহাস তখন সামনে খোলা পড়ে আছে। এই কবিতাটি যখন প্রকাশ হচ্ছে ততদিনে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছে, কবি উপলব্ধি করেছেন—বাংলাকে আরবি অথবা ইংরেজি হরফে লিখলে শুধু ভাষার অস্তিত্বই বিনষ্ট হয় না, কবির ব্যক্তিসত্তা হুমকির মুখে দাঁড়ায়, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তা সংকটের মুখে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকে তিনি কাব্যকলার আশ্রয়ে গেঁথে দিয়েছেন বাঙালি জনগোষ্ঠীর চেতনার গভীরতম প্রদেশে : 'কবিতাকে তিনি মুক্তবুদ্ধিচর্চার কালাকালবিস্তারী চারণভূমি হিসেবে জানতেন। তাঁর 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি পড়লে এ প্রত্যয়ই জন্ম নেয় যে, বাঙালি জাতি শামসুর রাহমানকে ভাষা আন্দোলনের বরপুত্র হিসেবে পেয়েছিল' (শাহরিয়ার, ২০০১ : ৫৩)। তিনি বাংলা ভাষা ও বর্ণমালাকে হৃদয়ে রেখে একাধিক কবিতার জন্ম দিয়েছেন, কারণ বাঙালি জাতিসত্তার বাঁক বদলের স্মরণাতীত এক পর্ব এই আন্দোলন, তাছাড়া বাংলা ভাষা তাঁর সত্তার সঙ্গী, এ ভাষাতেই সম্পন্ন হয়েছে তাঁর কবিতার কারুকর্ম :

> আজন্ম আমার সাথী তুমি,
> আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গ'ড়ে পলে পলে,
> তাই তো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে
> আমারই বন্দরে।
>
> ('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা')

শামসুর রাহমানের কবিতা এক সুতোয় অনেক মানুষকে গেঁথে দিয়েছে ভাষার সূত্রে—পলাশতলির কৃষক, মেঘনার মাঝি, চটকলের শ্রমিক, কুমোর, তাঁতি, কেরানি, ছাত্র, লেখক সবাই জীবনের আহ্বানে তাঁর কবিতায় সমবেত হয়েছে। সম্মিলিত জীবনচেতনার শ্লোগানধর্মী, চঞ্চল উচ্চারণ শেষে শামসুর রাহমানের কবিতা বায়ান্নোর ভাষা শহীদদের আত্মদানের বেদনায় ও গৌরবে বলে ওঠে :

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরেথরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়-ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।

('ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯', *নিজ বাসভূমে*)

'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতায় 'আমার' শব্দ দিয়ে ভাষার সঙ্গে যে ব্যক্তি-যোগের রেখাচিত্র এঁকেছিলেন, 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' এসে তা হয়ে গেল 'আমাদের'। বায়ান্নতে প্রাণ দেয়া সালাম ও বরকতকে আবারও জ্বলজ্বলে স্মৃতিরূপে উপস্থাপন করেন দেশের ক্রান্তিকালে :

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

(ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯; নিজ বাসভূমে)

বরকত ও সালামের রক্তদানের ইতিহাস ও স্বৈরাচারমুক্তির আন্দোলনকে এভাবে একই সুতোয় নিবিড় গ্রন্থি বেঁধে দেন। *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* কাব্যগ্রন্থের 'অভিমানী বাংলা ভাষা' কবিতায় জীবিত এবং জড়, মানুষ এবং নিসর্গ—সবকিছুর ভেতরেই দেখেছেন বাংলা ভাষার জন্য স্মৃতিকাতরতা। কবির নিজের স্মরণেও রাঙা রঙে আঁকা সেদিনের স্মৃতিরেখা—'নক্ষত্র দুলিয়ে/ অভিমানী বাংলাভাষা সে কবে বিদ্রোহ করেছিল'। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেননি, সে আক্ষেপ মুদ্রিত হয়েছে *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি* কাব্যের 'ভাষাশহীদের রক্তধারায় পুষ্পবৃষ্টি' কবিতায়। বাবার বয়ানে, বিছানায় শয্যাগত অবস্থায় তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় পেয়েছিল সেই আন্দোলনের ঝাঁঝালো স্বাদ—'প্রেস থেকে ফিরে বাবা বলেন জ্বলন্ত গোধূলিতে,/ "বাংলাভাষা রক্তচেলি পরে হাঁটে রাজপথে নক্ষত্রখচিত/ পোস্টার-শোভিত হাতে, হাওয়ায় উদ্দাম অগ্নিশিখা-কেশরাশি!" একুশ তাঁর কাছে কেবল আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, তাই ভাষা-আন্দোলন অতিক্রান্ত হবার অনেকদিন পর শামসুর রাহমান যখন মুখোমুখি হন বরকতের ফটোগ্রাফের, তার ফটোগ্রাফ 'ভর সন্ধেবেলা'য় আলোর সমুদ্র তৈরি করে, কারণ বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ বরকত :

নকশা ঘেরা কাচবন্দি বরকতের পুরানো ফটোগ্রাফ
সময়ের ছুটন্ত ক্ষুর থেকে ঝরে-পড়া ধুলোয় বিবর্ণ,
অথচ আমার মনে হলো, সেই ছবির
ভেতর থেকে জ্যোতিকণাগুলো
চক্রাকারে বেরুতে বেরুতে নিমেষে
ছড়িয়ে পড়ল সবখানে।

('বরকতের ফটোগ্রাফ', *হরিণের হাড়*)

একুশ পেরিয়ে ক্রমাগত আরও অনেক একুশ এসেছে কবির জীবনে। স্বাধীন বাংলাদেশে বসে তিনি একুশকে যুক্ত করে দিয়েছেন প্রিয়তমের স্মৃতি-কাতরতার সঙ্গে 'বর্ণমালা দিয়ে' (*তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*) শিরোনামের কবিতায়। বাংলা বর্ণমালা দিয়ে সাজাতে চেয়েছেন প্রিয় মানুষটিকে, ভাষাকে প্রিয় মুখের সঙ্গে জড়িয়ে সে স্মৃতিকে করে তুলেছেন আরও নিবিড়। অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী প্রায় পেরিয়ে যাবার পর কবি অদ্ভুদ এক বুকচেরা আর্তনাদ শুনতে পান ক্রমাগত কোনো এক 'ফাল্গুনের দুপুরে'। সেই আর্তনাদের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে কবি দেখেন 'বুলেটবেঁধা বাংলা ভাষা' :

বুলেটবেঁধা বাংলা ভাষার
রক্তস্নানে বিহ্বল আমি
ওর বুক থেকে সীসাগুলো তুলে নিয়ে সেখানে
গুচ্ছ গুচ্ছ পলাশ রেখে দিই নত মাথায়।

('কে আমাকে অমন ডাকে', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)

'আমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করে' কবিতা বাংলা ভাষার সঙ্গে শৈশবের আন্তরিক যোগ এবং যৌবনে কবির অগোচরে 'বাংলা বর্ণমালা কবিতার সাজে' কীভাবে এল কবির 'একান্ত ঘাটে' তার বিবরণে সমৃদ্ধ। কবি বারবার স্মরণ করেন বায়ান্নর সেই রক্তঝরা একুশকে, ভাষা শহীদদের, যাঁরা 'নিশ্চিত প্রাণভোমরা'রূপী বাংলার অস্তিত্বকে রক্ষা করেছিল নিজের প্রাণের বিনিময়ে। সেই স্মৃতি কেবল কবির একার নয়, 'জাতীয় স্মৃতি' হয়ে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়কে আলোড়িত করে। *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে* কাব্যগ্রন্থে কবি সুফিয়া কামালকে নিয়ে দুটি স্মরণ-কবিতা রয়েছে—'শ্রদ্ধেয়া সুফিয়া কামালের জন্যে পঙক্তিমালা' এবং 'কবির খাঁ খাঁ ঘর শুধু অশ্রুপাত করে' । সুফিয়া কামালের সময়ে শিক্ষা মানে ছিল উর্দু ভাষা শেখা, একজন মুসলিম নারীর জন্য নির্ধারিত কঠোর সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ভেতরে

থেকে গোপন চর্চায় বাংলা ভাষাকে আয়ত্তে এনে কবিতা লেখার মতো দুঃসাহসিক পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তিনি, তাঁর সেই উদ্যোগকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কবি বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন শামসুর রাহমানের খুব কাছের বন্ধু, তিনি *আর্ত শব্দাবলী* যে অন্ধ কালের গর্ভে বসে লিখেছিলেন তার যেন শেষ নেই। ইতিহাসের অনেক মহার্ঘ সময়ের স্মৃতিগাথা রয়েছে তাঁর সাথে শামসুর রাহমানের, ভাষা আন্দোলন এর মধ্যে অন্যতম—'মনে পড়ে বায়ান্নোর/ ভয়ংকর সুন্দর সে রক্তপদ্মে অধীর চুম্বন?' ('হাসান এবং পক্ষিরাজ', *এক ফোঁটা কেমন অনল*) তিনি উইলিয়াম কেরির প্রতিও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ তারই উদ্যোগে গদ্যরূপ নিয়ে বাংলা ভাষা নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছিল,[৫] যদিও কেরি পেশাগত প্রয়োজনে বাংলা গদ্য ভাষা প্রসারের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলন এমনকি স্বাধীনতার পরও বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার প্রতি শামসুর রাহমানের দরদ ছিল অটুট। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা প্রাপ্তির ঘটনা,[৬] আর সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ ছিল শহীদ মিনারে কবি ও শিল্পীদের অবাঞ্ছিত ঘোষণার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনা, 'হায়, এ কেমন কাল এল জন্মভূমিতে আমার' ('শহীদ মিনারকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে', *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে*)—উচ্চারণে বেদনার্ত আত্মার হাহাকারধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে কবিতায়। ভাষা শহীদদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর প্রেম তিনি আমৃত্যু লালন করেছেন সযত্নে।

ভাষা-যুদ্ধ জয়ের পর বাঙালি জাতিকে অবদমনের জন্য পরাজিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের কূট-বুদ্ধি আরও শতধারায় বিকশিত হলো, তৈরি হলো আর এক রক্তাক্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। আইয়ুবের সমরতন্ত্র, নিজের মসনদকে পাকাপোক্তকরণে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রহসন এবং দেশ বিভাগের পর থেকে পূর্ব বাংলা[৭] ও পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন অব্যাহত থাকার ফলে বাঙালি জনগোষ্ঠী আবার রণমূর্তিতে রাজপথে নেমে এল। ইতিহাসের এ পর্বের নায়ক ছাত্রনেতা আসাদ। শামসুর রাহমান আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে প্রতিবাদী মিছিল স্ব-চোখে দেখেছিলেন। সেই রক্তাক্ত শার্টকে তিনি 'প্রাণের পতাকা'রূপে উড়িয়ে দিলেন বাঙালির চেতনায় : 'আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা/সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;/আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা' ('আসাদের শার্ট', *নিজ বাসভূমে*)। এই প্রাণদান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মাঝখানে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেছিল। এভাবে ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে শামসুর রাহমানের কবিতা আরও বেশি সমকাল-আশ্রিত এবং স্বদেশ-সংলগ্ন হতে শুরু করে।

ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের শহীদদের কথা স্মরণে রেখে বাঙালি তাদের স্বতন্ত্র ভাষিক সত্তার ভেতরে লালন করতে শুরু করে একটি স্বাধীন ভূ-খণ্ডের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বুননের কাজে বাঙালি কবিরা ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়, শামসুর রাহমানও সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী হয়ে ওঠেন স্বদেশ-মুক্তির সাধক। এই সাধনায় তার কবিতার মোড় পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে নিজেকে মেলাবেন কিনা তা নিয়ে তিনি দ্বিধায় ছিলেন *নিজ বাসভূমে*র পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিধা উত্তীর্ণ কবি *নিজ বাসভূমে* কাব্য শুরু করেছেন ভাষা আন্দোলন দিয়ে, শেষ করেছেন স্বাধীনতার অনাগত ও আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের বাণী দিয়ে—'ভাবি, আজই পার্কের ভেতর/ নিজস্ব সুহাস চারা করব রোপণ, জল দেব, নাম দেব স্বাধীনতা' ('পার্ক থেকে যাওয়া যায়')। স্বাধীনতার 'নিজস্ব সুহাস চারা' রোপণ করে প্রত্যাশিত অথচ অনাগত এক ভবিষ্যতে প্রবেশ করে তাঁর কবিতা। এরপর তাঁর কবিতারা আর সুদূরের স্বপ্নমুখী 'নীলিমা সুহৃদ' হয়ে আবদ্ধ থাকেনি রোমান্টিকতার বলয়ে, কবিতা তখন স্বদেশ ও সমকালের গভীর বাস্তবতা-তাড়িত।

**যুদ্ধকালের দেশ**

হিন্দু-মুসলমান-বৃটিশ এই তিন জাতিসত্তার দ্বন্দ্বের ফলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মোহম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী পাশ করিয়ে নেন নিজের অনুকূলে, ফলে একাধিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় পাকিস্তান। জিন্নাহ পাকিস্তানকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনাকে আরও পরিপূর্ণতা দানের কৌশল হিসেবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার উদ্যোগ নেন। পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলায় রক্তপাতও ঘটানো হয়। উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমানদের মুখের ভাষা ছিল উর্দু, সেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা-দানের প্রবণতা ফিরিয়ে আনে মধ্যযুগের ইতিহাসকে, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা নির্ধারণে মধ্যযুগেই ভাষা-বিতর্কের সূচনা হয়েছিল এবং বাংলাকে স্বীকৃতি দানের ভেতর দিয়ে সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটে। বায়ান্ন সালে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের সংকটের সমাধান পূর্ব বাংলার মানুষেরাই করে নিয়েছিল, তাতে ঢালতে হয়েছিল বুকের তাজা রক্ত, ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ভাষা ও বর্ণমালাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের কাল। ভাষা বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে বাঙালির অনমনীয় চারিত্র্যের পরিচয় যেমন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা পেয়েছিল, তেমনি বাঙালি জনগোষ্ঠীও তাদের মুখোশের আড়ালের আধিপত্যকামী, উপনিবেশবাদী চারিত্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ৫২, ৬২, ৬৯—ইতিহাসের এই সংকটময় পর্বগুলোর ভেতর

দিয়ে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ রোপিত হয়, সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা—এভাবেই বাঙালি পৌঁছে যায় ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যখন সময় ফসল ঘরে তোলার। সেই কাজটিও বিনা রক্তপাতে করা সম্ভব হয়নি, কারণ জিন্নাহ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার মূল শক্তি হিসেবে সামরিক বাহিনীর ওপর আস্থাশীল ছিলেন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহকে তিনি এবং তার পরবর্তী শাসকেরা অস্ত্রের ভাষাতে, সমরতন্ত্রের ছায়ায় বসে সমাধান করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন, এই সেনা-নির্ভরতার মূলে ছিল শাসকসুলভ অদূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের হীন কৌশল। সেনানী আইয়ুব খানকে উৎখাত করে ইয়াহিয়ার আমলে বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের সুবিধাবাদী নীতিগুলোকে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়, ফলে ভেঙে যায় সংখ্যা-সাম্যের প্রহসন, ভেঙে পড়ে এক ইউনিটের চতুরালি, এতে ভাগাভাগির ন্যায্য হিস্যা দাঁড়ায় পূর্ব বাংলার ৫৬ শতাংশ। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে বঞ্চিত বাঙালির পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, যে বঞ্চনা এবং নিগ্রহ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব বাংলার ওপর করেছে, সংখ্যালঘু হিসেবে সেই নিগ্রহ-বঞ্চনার শিকার হবার সম্ভাবনায় তারা ভীত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসির মূল কারণ, তিনি হয়ে উঠেছিলেন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের জনপ্রতিনিধি; শিল্প কল-কারখানা, চাকরি, প্রতিরক্ষা—প্রতিটি খাতে ন্যায্যত পশ্চিম পাকিস্তানকে হতে হবে পূর্ব বাংলার অধস্তন। ফলে, ইয়াহিয়া খান দীর্ঘমেয়াদী এক নাটকের অন্তরালে প্রস্তুতি নিতে থাকে 'অপারেশন সার্চলাইটের', ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে পুনর্বহালের দূরভিসন্ধিতে অতর্কিতে পূর্ব বাংলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার বাহিনী।

জন্মের পর থেকে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন অভিন্নতা ছিল না। কারণ সাংস্কৃতিক অবদমনের ভেতর দিয়ে শাসকেরা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে উদ্যোগী হয়, ফলে এর প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এ দেশের সাংস্কৃতিক মহল, শিল্প-সাহিত্যে ধ্বনিত হয় প্রতিরোধের ভাষা। বাংলা কবিতার বিদেশী প্রভাবপুষ্ট কবিরাও দেশের সংকটকালে শিকড়মুখী হন : 'মাত্র কয়েক বছর আগে যে কবিরা নিজেদেরকে ইউরোপীয় অবক্ষয়ী ড্যান্ডি ও বীটনিকদের সবংশ বলে কল্পনা করে শ্লাঘাবোধ করতেন, ষাটের গণদেবতার রক্তচক্ষুর আলোতে তাঁরা নিজেদের অবস্থান শিকড়ে দৃঢ়মূল করে নেন। এই সময় অজস্র অসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ কবিতা লেখেন শামসুর রাহমান' (সিদ্দিক, ২০০৯ : ৯৭)। একাত্তরের যুদ্ধের সময়েও কবি-সাহিত্যিকদের সেই দায়বদ্ধ ভূমিকা-বিচ্যুত হবার অবকাশ ছিল না, তাঁদের হাতে

সবসময় সক্রিয় ছিল এক মহার্ঘ্য অস্ত্র—কলম, যে কলমের কল্যাণে তাঁরা পূর্ব থেকেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ঘনবদ্ধকরণে রেখেছিলেন সক্রিয় ভূমিকা। শামসুর রাহমান সশরীরে যুদ্ধে অংশ না নিয়েও অবতীর্ণ হয়েছিলেন সম্মুখযুদ্ধে, তাঁর কবিতার শাণিত কৃপাণ হাতে। তবে, হানাদারদের আক্রমণের ভয়াবহতায় প্রাথমিক পর্যায়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কবির কলম, এমনকি চিরাচরিত প্রেমিক সত্তাকে প্রশ্রয় দেবার মতো অবকাশ তাঁর ছিল না, নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন প্রেমের ব্যক্তিসুখ থেকে, সংলগ্ন করেছিলেন লক্ষ প্রাণের বিদীর্ণ বেদনার সাথে :

তোমার সলাজ
সান্নিধ্যে যাওয়ার মতো মন নেই। শহুরে বাগান
রাখুক দরোজা খুলে, তোমার ত্বকের মৃদু ঘ্রাণ
পারব না নিতে। ... ... ...
আমাদের বুকে জ্বলে টকটকে ক্ষত,
অনেকে নিহত আর বিষম আহত
অনেকেই। প্রেমালাপ সাজে না বাগানে
বর্তমানে আমাদের। ভ্রমরের গানে
কান পেতে থাকাও ভীষণ বেমানান
আজকাল। সৈন্যদল অদূরেই দাগছে কামান।

('প্রতিশ্রুতি', *বন্দি শিবির থেকে*)

শামসুর রাহমানের *বন্দি শিবির থেকে* শিরোনামের কাব্যগ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ায় ঠাসা, এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত জনপ্রিয় দু'টি কবিতা—'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' এবং 'স্বাধীনতা তুমি' ছাড়াও 'পথের কুকুর', 'কাক', মধুস্মৃতি', 'রক্তাক্ত প্রান্তরে', 'গেরিলা', 'উদ্বাস্তু', 'আমাদের মৃত্যু আসে', 'ধ্বস্ত দ্বারকায়' শিরোনামের কবিতাসমূহ এ কাব্যের মূল্যবান সঞ্চয়। এগুলো কেবল কবিতাই নয়, তাঁর আত্মভাষ্য; যখন কথা বলার মতো স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি নেই, নেই কোন বিশ্বস্ত মুখ, তখন এই কবিতাই ছিল তাঁর নির্ভরতা। মাতৃভূমির স্বাধীনতার প্রশ্নে বাঙালি ছিল যুদ্ধংদেহী, কিন্তু সেই যুদ্ধ কোনোরকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়া সবার অগোচরে রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র প্রতিপক্ষের ওপর অকস্মাৎ নেমে এসেছিল, যেন 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' (*মেঘনাদবধ কাব্য*); এ যুদ্ধ হানাদারদের কাপুরুষোচিত কীর্তির চূড়ান্ত নমুনা, ক্ষত্রিয় ধর্মের চরম অবমাননা। ইতঃপূর্বে সংগোপন ষড়যন্ত্রে নানা কায়দায় বারবার

বাঙালির অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে পশ্চিম পাকিস্তান, একাত্তরে সেই অবদমন প্রক্রিয়া রূপান্তরিত হলো প্রকাশ্য পীড়ণে। তখন বাঙালির প্রধান অপরাধ 'বাঙালি' হওয়াটাই :

ছাত্র নই, মুক্তিসেনা নই কোনো, তবু
হঠাৎ হ্যান্ডস আপ বলে বলে
পশ্চিমা জোয়ান আসে তেড়ে
স্টেনগান হাতে আর প্রশ্ন দেয় ছুড়ে ঘাড় ধরে—
বাঙালি হো তুম।

('প্রাত্যহিক', *বন্দি শিবির থেকে*)

বাঙালি হওয়া তখন হানাদারদের কাছে প্রকৃত অর্থেই অপরাধ ছিল। কারণ, পশ্চিমের পাঞ্জাবী শাসকদের অধিকাংশ ছিলেন দক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীল এবং কট্টোর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী। পূর্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সেকুলারিজম, সেকুলারিজম ছাড়াও বাঙালিয়ানার ভেতরে তারা পেয়েছিল ভারত-প্রীতির গন্ধ, এই বোধ-তাড়িত হানাদারেরা বুকের রক্ত ঢেলে অর্জিত বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল মর্মমূল থেকে। একাত্তরে আর একটি শব্দ হানাদারদের কাছে বিভীষিকাময় ছিল, 'স্বাধীনতা'—এই শব্দটির তীব্রতার কাছে অস্ত্রের আঘাতকেও যেন তারা কোমল মনে করত, কাজেই শব্দটি ছিল ভীষণভাবে নিষিদ্ধ, অথচ সে-সময় বাঙালির শব্দভাণ্ডারে উচ্চারণযোগ্য এর চেয়ে মূল্যবান শব্দ আর ছিল না। নারী-ফুল-পাখি-চাঁদের কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় শব্দ-ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষাতেও ঘটল রূপান্তর, সময়ের দাবিকে তিনি তুলে নিলেন কবিতার কণ্ঠে :

প্রকাশ্য রাস্তায় যদি তারস্বরে চাঁদ ফুল পাখি
এমনকি নারী ইত্যাকার শব্দাবলি
করি উচ্চারণ, কেউ করবে না বারণ কখনো।
কিন্তু, কিছু কিছু শব্দকে করেছে
বেআইনি ওরা
ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।
স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ করে বার বার
তৃপ্তি পেতে চাই।

('বন্দি শিবির থেকে', *বন্দি শিবির থেকে*)

*রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের 'দুঃখ' কবিতার দুঃখের মতো 'স্বাধীনতা' শব্দটিকেও তিনি সর্বব্যাপী করে দিতে চাইলেন। রাস্তাঘাট, অলি-গলি, মনন-চেতনার প্রতিটি অংশকে তিনি নিবিড় নিষ্ঠায় গড়ে তুলতে চাইলেন স্বাধীনতা শব্দটি চাষাবাদের উর্বর ভূমিরূপে। অথচ *বন্দি শিবির থেকে* কাব্যের পূর্বে প্রকাশিত আরও পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে শামসুর রাহমানের প্রিয় শব্দের তালিকায় নিশ্চিতভাবে ছিল 'চাঁদ', 'ফুল', 'পাখি', 'নারী'—যে শব্দগুলো মাত্র এক রাতের ব্যবধানে চলে গেল গৌণ শব্দের তালিকায়, সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠল একটিমাত্র শব্দ—'স্বাধীনতা'। *নিজ বাসভূমে* কাব্যে তিনি 'স্বাধীনতার সুহাস চারা' রোপণ করেছিলেন বাঙালি জাতিসত্তার মৌল আবেদনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদনের পূর্বে মার্চের এক গভীর রাত থেকে পরবর্তী নয় মাস ধরে বাঙালি পার হয়েছে এক বৈতরণী রক্তনদী। ২৫ মার্চের কালো রাতের অতর্কিত আক্রমণের সূচনাপর্বেই কবি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন—'আমি কি কখনো জানতাম এত দ্রুত/ শহরের চেনা দৃশ্যাবলি লুপ্ত হয়ে যাবে? একটি রাত্তিরে/ আমার সারাটা মাথা বিষম রুপালি হয়ে যাবে?' ('উদ্বাস্তু', *বন্দি শিবির থেকে*) এ রাতে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল মেধাবী বাঙালিদের, যাদের চিন্তা ও যুক্তির শক্তিতে বিতর্ক-বিভ্রান্তিতে দেশ খুঁজে পেয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মন্ত্রণা। পরিকল্পিতভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি রেখে, বুদ্ধিজীবীদের তালিকাবদ্ধভাবে হত্যা করে যুদ্ধকে নেতৃত্বশূন্য করে দিতে চেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি কূটনীতিকেরা। পূর্ব বাংলায় সে অর্থে সংগঠিত, প্রশিক্ষিত কোন সেনাবাহিনী ছিল না, প্রায় পঁচিশ হাজার অস্ত্রধারী প্রতিপক্ষের বিপরীতে ছিল আনুমানিক সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র, বিপন্ন বাঙালি; যারা নিরস্ত্র বটে কিন্তু চেতনা শাণিত—'চোখগুলো গ্রেনেডের চেয়ে/ বিস্ফোরক বেশি আর শূন্য কোটি হাত/ যতটা বিপজ্জনক, ক্রুর মারণাস্ত্র নয় ততটা' ('শমীবৃক্ষ')। নিয়মিত ও প্রশিক্ষিত সৈন্যের অভাবে প্রতিটি দেশপ্রেমী বাঙালি হয়ে উঠেছিল যোদ্ধা—গেরিলা যোদ্ধা; এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ...কে যে গেরিলা কে কৃষক তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। গেরিলারাই হয়তো কৃষক সেজে চাষবাস করছে, দেখা যেত। অথবা বিপদ দেখলে হাতের স্টেনগানটি ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দিয়ে নিরীহ কৃষকের মতো চাষবাসের কাজ শুরু করে দিত। দেখা গেছে অতিশয় কাহিল এক বৃদ্ধ ব্যাগভর্তি তরকারি নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু চ্যালেঞ্জ করলে ধরা পড়তো তাঁর ব্যাগের ভেতরে ফিউজ রয়েছে, সাজানো। নৌকা যাচ্ছে মৌসুমী ফল নিয়ে, কিন্তু ভেতরে লুকানো মাইন ও গ্রেনেড (চৌধুরী, ২০১৭ : ২৩)।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রশিক্ষিত নিয়মিত যোদ্ধার চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণের বেশি ছিল গেরিলা যোদ্ধা, তারা ত্রাতারূপে, মুক্তিদাতারূপে বাঙালির কাছে উজ্জ্বল প্রতীকের মতো হয়ে ওঠে। গেরিলা যোদ্ধাদের বিষয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, আল মাহমুদ তাঁর 'ক্যামোফ্লেজ' (*সোনালি কাবিন*) কবিতায়

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাকে 'হরিৎ পোশাক', 'সবুজ শাড়ি', 'সবুজ কামিজ' পরে লতাগুল্মের ছদ্মবেশ নিয়ে অস্তিত্বরক্ষার কথা বলেছিলেন। শামসুর রাহমান গেরিলা যোদ্ধাদের পরম আত্মীয় হিসেবে অনুভব করেছেন, তাদের বাইরের সাজসজ্জা পোশাকাদি নিয়ে সংশয়বিদ্ধ ছিলেন—'দেখতে কেমন তুমি? কী রকম পোশাক-আশাক/ পরে করো চলাফেরা?' ('গেরিলা', *বন্দি শিবির থেকে*) 'গেরিলা' শব্দটি স্প্যানিশ, এটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮০৮ সালে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভেতরকার যুদ্ধের চারিত্র্য সাদৃশ্যপূর্ণ, ভিয়েতনামের গেরিলা আক্রমণ ছিল বাঙালি যোদ্ধাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। শিক্ষা-দীক্ষা, বয়স, শ্রেণি-পেশা সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেশকে রক্ষার সংকল্পে এইসব গেরিলা যোদ্ধা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত, সংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে; অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ন্ত্রণকর্তা ছিল ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, ফরমান আলী, নিয়াজির মতো দুর্ধর্ষ, কপট চরিত্রসমূহ।[৮] ফ্যাসিস্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইয়াহিয়ার তুলনা পৃথিবীতে একমাত্র হিটলার, ইয়াহিয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শামসুর রাহমান জানিয়ে রেখেছেন :

> আপনারা এলে পথে ঘাটে নামাতে হবে না আর
> লাল গালিচার ঢল। ইয়াহিয়া, নব্য অবতার
> হিটলারের, আগেই রেখেছে মুড়ে বড় ক্ষিপ্রতায়
> কী এলাহি কাণ্ড, সারা বাংলাদেশ রক্ত গালিচায়!
>
> ('সংবর্ধনা', *বন্দি শিবির থেকে*)

521561

যুদ্ধ শুরুর সময় শামসুর রাহমান ঢাকায় ছিলেন, পরবর্তীকালে ঢাকা ত্যাগ করে পাড়াতলীতে চলে যান, আবার যুদ্ধের শেষ পর্বটি তিনি কাটান ঢাকাতে। ফলে যুদ্ধকালের ঢাকা তাঁর কবিতায় অনেক বেশি সত্যনিষ্ঠ চারিত্র্য নিয়ে অঙ্কিত হয়েছিল। তাঁর কবিতা সে-সময়ের বিভীষিকার টুকরো টুকরো ছবি। সেই বিভীষিকাকে শৈল্পিক অবগুণ্ঠনে রেখে উপস্থাপনের মতো পরিস্থিতি তখন ছিল না, এ কারণে শামসুর রাহমানের কবিতা কখনো কখনো ধারণ করেছে শ্লোগানের চারিত্র্য :

> সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান
> এবং চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র মরছে মানুষ
> পথে ঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর।
>
> ('পথের কুকুর', *বন্দি শিবির থেকে*)



ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

কবিকে পরিবারের সদস্যসহ 'মধ্যবিত্ত নিরাপত্তা'র ভেতরে বাস করতে হচ্ছিল, জাতীয় সংগ্রামে অংশ নেবার অপারগতা তাঁকে আমুল বিদ্ধ করেছিল। তাই পথের যে কুকুরটি জলপাইরঙ জিপ দেখে ডেকে ওঠে সশব্দে, বন্দি ঘরের শ্বাসজীবিতায় মানবেতরভাবে বাঁচার চেয়ে সেই প্রতিবাদী কুকুর হওয়াটাও তাঁর কাছে শ্রেয়তর মনে হয়েছিল। যুদ্ধকালের আরও অনেক চিত্র শামসুর রাহমান প্রত্যক্ষ করেছেন, যা তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে, এই বিষয়-নির্মাণে খুব বেশি কল্পনার অনুগামী হওয়া কবির জন্য সম্ভব হয়নি, কারণ বাস্তবতার ভয়াবহ রূপ কল্পনাকেও হার মানিয়েছিল, *বন্দি শিবির থেকে* কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায় রয়েছে সে সময়ের রেখাচিত্র :

ক.

মৌচাকে আগুন দিলে যেমন সশব্দে
সাধের আশ্রয়ত্যাগী হয়
মৌমাছির ঝাঁক
তেমনি সবাই
পালাচ্ছে শহর ছেড়ে দিগ্বিদিক। নবজাতককে
বুকে নিয়ে উদ্ভ্রান্ত জননী
বনপোড়া হরিণীর মতো যাচ্ছে ছুটে।[৯]
('তুমি বলেছিলে')

খ.

খাঁচার টিয়েটা
সবুজ চিৎকারে দিচ্ছে গুঁড়িয়ে অদ্ভুত
স্তব্ধতার ঘাঁটি; টবে উদ্ভিন্ন গোলাপ
ভীষণ ফ্যাকাশে ভয়ে। হঠাৎ কপাটে
বুটের বেদম লাথি, হাঁক-ডাক।
('শমীবৃক্ষ')

গ.

যেদিকে যাই,
ডাইনে অথবা বাঁয়ে, বিষণ্ন স্বদেশে বিদেশীরা
ঘোরে রাজবেশে। রেস্তোরায়, পার্কে, অলিতে-গলিতে
শহরতলিতে শুধু ভিনদেশী ভাষা যাচ্ছে শোনা।
('উদ্বাস্তু')

বাঙালি জনগোষ্ঠীর যৌক্তিক দাবিকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাস্তবায়িত করা হলে এত প্রাণ-দানের প্রয়োজন হতো না, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পাকিরা[১০] শুরু থেকেই রাজনৈতিক কূটকৌশলে বাঙালিদের দমন ও অধীন করে রাখার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এ প্রচেষ্টারই পরিকল্পিত অংশ যুদ্ধ—যা ওদের জন্য পররাজ্য দখলের পায়তারা আর বাঙালির জন্য স্বদেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ। সে-সময় রাজধানী হিসেবে ঢাকা প্রথম আক্রান্ত হয়, প্রাণের শহর রূপান্তরিত হয় যুদ্ধ-নগরীতে—'খাকির ছাউনি শহরের মোড়ে মোড়ে,/ মৃত্যু চালায় সুনিপুণ হারপুন' ('মৃতেরা', *বন্দি শিবির থেকে*)। এ যুদ্ধে শহর প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল, বাদ পড়েনি গ্রামও। ভাষা আন্দোলনসহ একাত্তরপূর্ব অন্যান্য আন্দোলন ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ভৌগোলিক বিস্তারে এসব আন্দোলন ছিল শহরকেন্দ্রিক; স্বাধীনতা সংগ্রাম পৌঁছে গিয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। শামসুর রাহমান ঢাকা থেকে পালিয়ে পাড়াতলী গ্রামে যাবার পথে এবং পাড়াতলীতে মাসাধিক কাল থাকার সুবাদে গ্রামীণ জনজীবনে যুদ্ধের স্বরূপ এবং তাঁদের প্রতিবাদ ও প্রত্যাশার ধরন বুঝে নিতে পেরেছিলেন হাতে-কলমে। ফলে, তাঁর এ পালিয়ে থাকাটাও শেষাবধি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রান্তের জীবন-প্রণোদনা ব্যাখ্যায়। সে সময় গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়েছিল যুদ্ধের তাণ্ডবে, তারই খুব সংহত প্রকাশ 'কাক' কবিতাটি :

> গ্রাম্য পথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গরু
> নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু
> আল খাঁ-খাঁ, পথপার্শ্বের বৃক্ষেরা নির্বাক
> নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।
>
> ('কাক')

গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক রূপটি এ কবিতায় নেই, 'নগ্ন রৌদ্র' আর 'কাক' দুঃসময়ের বার্তাবাহী। গ্রামীণ সংস্কারে 'কাক' পাখি পদবাচ্য নয়, কাকের আনাগোনায় দুর্ভাগ্য নেমে আসে বলে তাদের বিশ্বাস, শামসুর রাহমান চলমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় সেই গ্রামীণ সংস্কারকেই কাজে লাগিয়েছেন। গ্রামের পটভূমিতে লেখা 'গ্রামীণ' কবিতায় গ্রামের একজন অতি সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের যুদ্ধজীবনের বাস্তবতা শামসুর রাহমান তুলে এনেছেন কবিতায়, যার জীবনের সরল সত্যগুলো আবর্তিত হতো মুঠোয় ধরা লাঙলে, 'নতুন শস্যের ঘ্রাণে' আর 'আলথালু পরাণ বধূরে' কেন্দ্র করে, যুদ্ধ এসে তার হাতের লাঙল কেড়ে নিল, তুলে দিল অস্ত্র :

> আমিও হঠাৎ
> কেন গণ্ডগ্রামে অস্ত্রাগারে ক্ষিপ্র বাড়ালাম হাত?

কখনো শুনিনি কোনো নেতার বক্তৃতা, কোনো দিন
যাইনি মিছিলে, হাতে তুলিনি নিশান। গণচীন,
মার্কিন মুল্লুক কার কেবা শত্রু-মিত্র, এই তথ্যে
ঘামাইনি মাথা। আমার কী কাজ কূট তর্কে, তত্ত্বে?

('গ্রামীণ', *বন্দি শিবির থেকে*)

এইসব সাধারণ মানুষের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে, এ যুদ্ধ তাদের অস্তিত্ব-রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। গ্রামের একজন গৃহমুখী কৃষক, তাকে কেন হঠাৎ সরাসরি জাতীয় সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে ঢুকে পড়তে হলো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শামসুর রাহমান কৃষকের মুখে তুলে দিয়েছেন জীবনবাদী গল্প, এ শুধু তার একার গল্প নয়, সে-সময়ের অসংখ্য সাধারণ মানুষের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নেপথ্য-বাস্তবতা :

যাকে ভালোবাসি সে যেন পুকুরের ঘাটে ঘড়া রোজ
নিঃশঙ্ক ভাসাতে পারে, যেন এই দুরন্ত ফিরোজ,
আমার সোদর, যেতে পারে হাটে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বাজান টানতে পারে হুঁকো খুব নিশ্চিন্তে দাওয়ায়,
তাই মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এঁদো গণ্ডগ্রামে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কী দুর্বার সশস্ত্র সংগ্রামে।

('গ্রামীণ', *বন্দি শিবির থেকে*)

নিজেকে ঘিরে থাকা স্বজনমণ্ডলীর জীবনকে নিঃশঙ্ক করতে তার এই যুদ্ধ, দেশ মুক্ত হলেই প্রিয় জীবনগুলো সহজ-সাবলীলতায় ফিরে যেতে পারবে সেই প্রত্যাশা ছিল ব্যক্তিগত, আর সেই প্রত্যাশাকে পূরণের প্রক্রিয়াটি ছিল সমষ্টিগত, স্বদেশচৈতন্যের সঙ্গে সংলগ্ন। এছাড়াও গ্রাম এবং শহরের কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তীয় ভাবনাকে শামসুর রাহমান এক সুতোয় গেঁথেছেন 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' শিরোনামের বিখ্যাত যুদ্ধকবিতায়। আবেগের সারল্য কবিতাটিকে পাঠক-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল সহজেই, কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন পাড়াতলী গ্রামে বসে। মার্চের শেষের দিকে তাঁরা গ্রামের বাড়িতে চলে যান নিরাপত্তার আশায়, প্রত্যাশিত সেই নিরাপত্তা তিনি পেয়েছিলেন—'এই যে পাখির ডাক শুনে, গাছপালার সবুজাভা ও নীল আকাশের স্নিগ্ধ রূপ দেখে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল, এর কারণ নিরাপত্তার আশ্বাস। আমাদের গ্রামের অবস্থানই এমন যে এখানে পাক খুনিরা সহজে হানা দিতে পারবে না' (রাহমান, ২০০৪ : ২৭০)। শামসুর রাহমান বরাবরই নিসর্গপ্রেমী, পাড়াতলীর নিরাপত্তা নতুন করে তাঁর দৃষ্টি উন্মোচন করল, কেটে গেল মৃত্যুভয় তাড়িত

সময়ের পেষণে সৃষ্ট কবিতার আকাল, যুদ্ধ-তাড়িত মনের রাইটার্স ব্লক। পাড়াতলী গ্রামের পুকুর কবির 'শব্দ চাষের' সাক্ষী হয়ে রইল। এই পুকুর দু'টো কারণে কবির জীবনে স্মরণীয়, একটি নিরাভরণ দুঃখের, অন্যটি দুঃসময় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা আশার আনন্দের—তাঁর প্রিয় পুত্র এ পুকুরে ডুবেই মৃত্যুবরণ করেছিল, সেই ঘাতক পুকুর তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিল কবিতা লেখার প্রেরণা, তিনি এখানে বসেই স্বাধীনতা-সংক্রান্ত অবিস্মরণীয় যুগল কবিতার জন্ম দিলেন[১১]—একটি 'স্বাধীনতা তুমি', অপরটি 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'। 'স্বাধীনতা' নামক বহু আকাঙ্ক্ষিত শব্দবন্ধনীতে তিনি বেঁধে দিলেন কেন্দ্র ও প্রান্তের মানুষকে। সেইসঙ্গে বাঁধা পড়লেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল—বাংলা কবিতার দুটি উঁচু মিনার। 'স্বাধীনতা' শব্দের পুনরাবৃত্তিতে কবিতাটি পৌঁছে গিয়েছিল বাঙালির মর্মে। নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা দিয়ে যে কাজটি সম্পাদন করেছিলেন শামসুর রাহমানও তাই করতে সক্ষম হলেন, বিপুলভাবে নাড়া খেয়েছিল বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার তুলনায় 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' আরও বেশি পরিব্যাপ্ত, চেতনার গভীর স্তরে তার অনুরণন অনুভূত হয়। যুদ্ধ যেহেতু আপামর বাঙালির, কাজেই সচেতনভাবেই গ্রাম ও শহরকে তিনি সমান্তরালে রেখেছিলেন। স্বদেশ মানে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু শহর বা গ্রাম নয়, স্বদেশরক্ষার সংগ্রামেও থাকে না একক মাত্রা, এ এক যৌথ উদ্‌যোগ, তারই গভীরতম প্রতিধ্বনি এই কবিতাটি। স্বাধীনতার জন্য প্রতীক্ষারত অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই কবিতায়। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ছাড়া আর কারও স্বতন্ত্র পরিচয় উন্মোচিত হয়নি, 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতায় প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা পরিচয় ও অবস্থান নিয়ে উজ্জ্বল—সকিনা বিবি, হরিদাসী, শিশু, বুড়ো, বিধবা, কিশোরী, সগীর আলী, কৃষক, কেষ্টদাস, মতলব মিয়া, রুস্তম শেখ, তরুণ যোদ্ধা এবং একটি কুকুর। চরিত্রগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থান সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষণ ব্যবহারে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ, লিঙ্গ পার্থক্য অথবা বায়সিক ব্যবধান নেই, সব ধর্মের নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, তরুণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের ভেতরে একে একে প্রোথিত করেছেন অভিন্ন এক প্রতীক্ষা। সকিনা বিবি, হরিদাসী, সগীর আলী, কেষ্ট দাস—ইত্যাকার নামগুলো পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে এদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রতিমূর্তিত করেছে। অন্যদিকে দু-একটি শব্দের মিতব্যয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান —সগীর আলী কৃষক, কেষ্ট দাস জেলে, মতলব মিয়া মাঝি, রুস্তম শেখ রিকশাওয়ালা। সামাজিক স্তরায়নে এদের অধিকাংশই নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ এবং পেশাগতভাবে প্রান্তবাসী। নামের সঙ্গে উল্লিখিত বিশেষণ তাদের চারিত্রিক গুণাবলীও যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে—শিশু 'অবুঝ', বুড়ো 'থুত্থুরে', কিশোরী 'অনাথ' এবং 'হাড্ডিসার'; সগীর আলী 'জোয়ান', কেষ্ট দাস 'সাহসী', মতলব

মিয়া 'দক্ষ', তরুণটি 'তেজী'। প্রতিটি স্তরের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণের ভেতর দিয়ে শামসুর রাহমান প্রতীক্ষার কাতরতা ও ব্যাপ্তির নকশা তুলে ধরেছেন। ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে অবস্থান করে তারা অভিন্ন চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপেক্ষারত—থুত্থুরে বুড়ো বসে আছে উদাস দাওয়ায়, বয়সের ভারে ন্যুব্জ, তাই তার চোখে দুপুরের চকচকে রোদ নেই, আছে অপরাহ্নের দুর্বল আলোর ঝিলিক। মোল্লাবাড়ির বিধবা বউ দাঁড়িয়ে আছে পোড়া ঘরের নড়বড়ে খুঁটি ধরে, এই নড়বড়ে দগ্ধ খুঁটিটি কি তার নিরাবলম্ব, নিরাশ্রয়, দুঃখভারাক্রান্ত জীবনেরই মূর্ত প্রতীক নয়? এমন দুঃসময়েও সে প্রতীক্ষা করতে পারে, কেননা এই প্রতীক্ষার সফল সমাপ্তির ভেতরেই আছে তার আক্রান্ত জীবনের ক্ষতকে সারিয়ে তোলার সান্ত্বনা। এক অনাথ কিশোরী ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে, শূন্য থালা নিয়ে পথের ধারে বসে থাকে, তার জন্য আলাদা শব্দ খরচ করে পেশা নির্দেশের প্রয়োজন পড়ে না—ভিখিরি সে। স্বাধীনতার জন্য তারও প্রতীক্ষা আছে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন কতটা প্রান্তগামী হয়েছে তারই জ্বলজ্বলে উদাহরণ এই কিশোরী ভিখারি।

শহর পেরিয়ে শাহবাজপুর গ্রামের জোয়ান কৃষক সগীর আলী এবং জেলেপাড়ার সাহসী জেলে কেষ্ট দাসও অপেক্ষারত। দক্ষ মাঝি মতলব মিয়া মেঘনা নদীতে উদ্দাম ঝড়ের মুখে 'গাজী-গাজী' রব তুলে নৌকা চালায়, সেও অপেক্ষা করে, তার সঙ্গে এ তালিকায় আরও রয়েছে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, নতুন পৃথিবী সৃষ্টির ভার যার হাতে শামসুর রাহমান নিঃসঙ্কোচে সমর্পণ করেছেন। কবিতায় অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্রের অবস্থা, অবস্থান এবং অপেক্ষার বয়ান শেষে কবি ফিরেছেন নিজের দিকে, তিনি কীসের জন্য অপেক্ষারত?—

> পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত
> ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
> নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
> এই বাংলায়
> তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

কবির এ উচ্চারণে কোথাও অপেক্ষা নেই, বরং রয়েছে জোরালো দাবি। তাঁর এই কবিতাটি সমন্বয়ের একটি চমৎকার নিদর্শন, শহর ছেড়ে পাড়াতলী গ্রামে আশ্রয় নিয়ে কবি উপলব্ধি করেন জাতীয়তাবাদী চেতনার সমগ্র রূপকে, তাঁর কবিতা সেতুবন্ধ তৈরি করে দিয়েছিল শহর ও গ্রামে বিকশিত জাতীয়তাবাদী চেতনার উপরে।

*বন্দি শিবির থেকে* কাব্যগ্রন্থে শামসুর রাহমান দেখিয়েছেন যুদ্ধকালে সক্রিয় আন্তর্জাতিক শক্তিকে, যারা বাঙালির বিরুদ্ধে মদদ দিয়েছে প্রতিপক্ষকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশ বিভাগের পর থেকেই বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের উস্কানিদাতা। বৈদেশিক সম্পর্কের সূত্রেই মাওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ঐক্যে ফাটল ধরেছিল,[১২] যার মূল্য গুণতে হয়েছিল পূর্ব বাংলাকে দীর্ঘ সময় সামরিক শাসনের কব্জাগত থেকে। যুদ্ধে পশ্চিম অংশকে মানসিক সমর্থন এবং অস্ত্র সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এমনকি স্বাধীনতার পর দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সাহায্যপ্রার্থী জাহাজ মার্কিন মুলুকের দরোজা থেকে শূন্য হাতে ফিরেছে, এ ছাড়াও তারা আইয়ুব খানের সেনাবাহিনীর খরচ বহন করেছে। শামসুর রাহমান দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে 'চীনা ও মার্কিন কালোয়াতি' এবং বাঙালির ভেতরেও 'পাড়ায় পাড়ায় খাল কেটে/ কুমির আনছে কেউ কেউ' ('প্রাত্যহিক', *বন্দি শিবির থেকে*)। কবি কিন্তু তাদের চিনতে ভুল করেননি, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ইতিহাসের আরও একটি কালো চরিত্রের প্রত্যাবর্তন—'নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন' ('প্রাত্যহিক')। *বন্দি শিবির থেকে* কাব্যে আরও দু'টি কবিতা গুরুত্বপূর্ণ—একটি 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এবং অপরটি 'মধুর ক্যান্টিন'। যুদ্ধের সময় অপরাপর বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মুনীর চৌধুরীও নিরুদ্দেশ হন, শামসুর রাহমানের চোখে তিনি হয়ে ওঠেন রক্তাক্ত প্রান্তরের একজন। 'মধুর ক্যান্টিন' কবিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় মধুদার কথা বলেছেন কবি, যিনি পাখির ডানার মতো আগলে রাখতেন আন্দোলনরত ছাত্রদের, তার আনুকূল্যে অনেক রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনার ভ্রূণায়ন হয়েছে তার ক্যান্টিনে। মধুদা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বলেই ৭১-এ তাঁকে হারাতে হয়েছিল, এই হারানোর ক্ষতও কম গভীর নয় কবির কাছে, যুদ্ধ অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে বাঙালির প্রিয় তালিকা থেকে :

আমাদের প্রিয় যা কিছু সবই তো ওরা
হত্যা করে একে একে। শহীদ মিনার
অপবিত্র করে, ভাঙে মর্টারের ঘায়ে,
ফারুকের সমাধিস্থ লাশ খুঁড়ে তোলে
দারুণ আক্রোশে
ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে, কে জানে কোথায়।
বটতলা করে ছারখার।
আমাদের প্রিয় যা কিছু সবই তো ওরা
হত্যা করে একে একে।

('মধুস্মৃতি', *বন্দি শিবির থেকে*)

শহীদ মিনার কেবল স্মৃতির মিনার নয়, বাঙালি জাতিসত্তার ভ্রূণের প্রতীক, এ জন্য পাক বাহিনী বারবার আঘাত করে ভাঙতে চেয়েছে শহীদ মিনার। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে মাহবুবুল আলমের 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি, বাইরের আঘাতে বস্তুর বিনষ্টি ঘটে, চেতনার উৎপাটন অসম্ভব।

শামসুর রাহমান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেসব কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলো সেই সময়ের বিবরণ-সমৃদ্ধ, আবেগমুক্ত নয়, বরং আবেগঘন। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে এত বড় ঘটনা যে তাকে নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে কবিতায় তুলে আনা সত্যিই কঠিন ছিল, ফলে আরও অনেক কবির মতো শামসুর রাহমানের অনেক আবেগঘন কবিতা ডিঙ্গিয়েছে শিল্পের বেড়া, দায়বদ্ধ কবির পক্ষে এ সময় শিল্পসুষমার দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ ছিল না। যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে গভীরভাবে আক্রান্ত করেছিল, অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে থাকা কবির যুদ্ধ আর বাঙালি জাতির যুদ্ধ ছিল অভিন্ন সূত্রে ঐক্যবদ্ধ, কাজেই নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পসুদ্ধ কবিতা লেখা তখন সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের শুরুতে কবি তাঁর পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে পাড়াতলী গ্রামে চলে যান, আত্মগোপন পর্বে যেমন নেরুদার কলম থেমে থাকেনি, শামসুর রাহমানের কলমও ক্রমাগত লিখে গেছে শিল্পীর দায় থেকে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় কবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশে গিয়েছিলেন যৌথ চেতনার সঙ্গে, কবি যুদ্ধসম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে আলাদা করে দেখেননি, দেখেছেন : 'যৌথ রক্ত ঝরছে কেবল' ('কাঁটাতার')। অথচ শামসুর রাহমান ছিলেন 'রূপালি স্নানের' কবি, এই কবি শুধু জানতেন সর্বনামের যৌথতা। কাব্যযাত্রার শুরুতে কবি অনেক কবিতাতেই স্মরণ করেছেন কাব্যপ্রেয়সীকে, প্রকৃতিঘেরা জীবনের মাধুর্য অথবা রোমান্টিক বিষাদে আক্রান্ত হয়েছে তাঁর কবিতা, একসময় তিনি বলেছিলেন : যখন তোমার দিকে চাই, চোখ আর চোখ নয়,/ থরথর কম্পিত হৃদয়।/ দুপুরের ছায়া মনে, হালকা পর্দা তুলে/ তুমি এসে দাঁড়ালে কি পিঠ-ছাওয়া চুলে? ('জর্নাল, শ্রাবণ', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*) কিন্তু যখন শামসুর রাহমানের জন্মশহর ঢাকা যুদ্ধের তাণ্ডবে বদলে যাচ্ছিল রাতারাতি, অসংখ্য মানুষের অসহায় মৃত্যুতে শহর পরিণত হয়েছিল শবাগারে, নিজের শহরে নিজেকে উদ্বাস্তু মনে হত তাঁর; সেই পরিস্থিতিতে প্রেয়সীর সান্নিধ্য বর্জন তো করেছেনই, এমনকি বলেছেন : 'গ্রন্থে নেই মন, আপতত জ্ঞানার্জন বড় অপ্রয়োজনীয় *ঠেকে*' ('উদ্বাস্তু', *বন্দি শিবির থেকে*)। অথচ তিনি চিরকাল ছিলেন লোভী পাঠক, শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় তিনি ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ব্যবহার করে পড়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছেন, তিনি হঠাৎ কেন পাঠ এবং জ্ঞানার্জনকে বয়কট করলেন? কারণ যুদ্ধকালের সংকটে সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষার চেয়ে বড় আর কিছু ছিল না, স্বদেশ ও সমকাল তাঁকে

চেতনাগতভাবে উত্তরিত করেছে, গ্রন্থি বেঁধে দিয়েছে সমষ্টির সুখ-দুঃখের সাথে। ৭১'র দিনগুলো ভরে উঠেছিল স্বদেশে গৃহবন্দি হয়ে থাকার যন্ত্রণা, জন্মশহর ছেড়ে পালিয়ে কেবল নিজ প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার সঙ্কীর্ণতা, প্রতিনিয়ত আশঙ্কার কষাঘাত, প্রিয় মানুষ হারানোর দুঃসংবাদে। দেশের জন্য যাঁরা লড়েছে, তাঁরাই ছিল কবির সবচেয়ে কাছের স্বজন, তাঁদের রক্ত দিয়েই কেনা হচ্ছিল স্বাধীন একটি ভূখণ্ডের নিরাপদ জীবন। সুতরাং দেশের জন্য সংঘটিত প্রতিটি মৃত্যু শামসুর রাহমানের কবিসত্তাকে বেদনায় বিদীর্ণ করেছে। তাঁর *বন্দি শিবির থেকে* (১৯৭৩) থেকে ছাড়াও *দুঃসময়ে মুখোমুখি* (১৯৭৩) কাব্য যুদ্ধের বিবরণ সমৃদ্ধ। 'সে এক সময় ছিল' বলে সদ্য অতিক্রান্ত যুদ্ধ-স্মৃতিচারণার সূত্রে একাত্তর ইতিহাস হয়ে তাঁর দৃষ্টিপথে ভেসে উঠেছে :

> কোথাও নিস্তার নেই; খাকি
> সন্ত্রাসে আচ্ছন্ন হয় নদীতীর, সর্ষেক্ষেত, তাল-সুপুরির
> গাছ, বাঁশবন, বেতফল আর বাবুইপাখির বাসা। প্রহরে প্রহরে
> রাইফেল গর্জে ওঠে, যেন বদমেজাজী মোড়ল
> ভীষণ শাসাচ্ছে অধস্তন পাড়া-পড়শিকে। আবার গুটিয়ে
> পাততাড়ি ফিরে আসি বিকলাঙ্গ শহরেই যূথচারী লেমিং যেমন
> ছুটে যায় দুর্নিবার ধ্বংসের চূড়ায়।
>
> ('স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী কবিতার মতো', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

সময়ের নানা পর্বে এই দেশ বার বার আক্রান্ত হয়েছে, বলা হয়, দুঃসময়ে মুখোমুখি রূপসী নারীর মতো এদেশ প্রতিনিয়ত বিদেশী শাসক ও উপনিবেশবাদীদের আকর্ষণ করেছে। শামসুর রাহমান এই কথাটিই যেন বলতে চান মৃদু করে, বলেন : 'তোমার রূপের খ্যাতি পরাক্রান্ত প্রবাদের মতো' ('বহু কিছু থেকে ছুটি', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)। এর অনেক আগে আহসান হাবীব অভিযোগের আঙুল তুলে বলেছিলেন স্বদেশের রূপের বৈরিতার কথা; *'আপণা মাঁসে হরিণা বৈরী'*—চর্যাপদের সেই হরিণীর মতো দেশ তার প্রবাদতুল্য রূপের খ্যাতির কারণে বণিক, লুটেরা ও সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতার শিকার হয়েছে বারবার, যে দেশ নায়িকার ভূমিকায় ছিল, দীর্ঘদিনের শাসন-শোষণে তাকে আর চেনা যায় না—'কোথাও লাবণ্য নেই জেগে আছে ভয় ও বিস্ময়' ('ক্রান্তিকাল', *ছায়াহরিণ*)। শামসুর রাহমানের কাছের কবি শহীদ কাদরীও দেশের রূপের খ্যাতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[১৩] এই রূপ ও ঐশ্বর্যের লোভে ছুটে আসা পররাজ্যলোভী, উপনিবেশকামী, সাম্রাজ্যবাদী মানুষগুলোর হাতেই এদেশের মানুষের রক্তের দাগ লেগেছে। বায়ান্নতে, উনসত্তরে, একাত্তরে এবং একাত্তর-পরবর্তী কালে শোষণ-অবদমন ও হত্যাযজ্ঞের ধারাবাহিকতা প্রশ্নবিদ্ধ করে কবিকে : 'তবে কি আমার বাংলাদেশ শুধু এক

সুবিশাল শহীদ মিনার হয়ে যাবে?' ('বারবার ফিরে আসে', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*) এত প্রাণ দান, রক্তপাত, কবির সংবেদনশীল হৃদয়কে বিষাদাক্রান্ত করে ফেলে। মানুষের মৃত্যু নয়তো যেন ঝরেছে পঁচা ফল, তাই চেতনার দ্বারে 'বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট।' বাংলাদেশের ইতিহাস 'বুটের দাপট' মুক্ত হতে পারেনি দীর্ঘ সময়, দুঃসময়ের এইসব স্মৃতির ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে কবি বলেই ফেলেন : ' ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এবার আমি গোলাপ নেবো।' ('ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*) শামসুর রাহমানের সমসাময়িক শহীদ কাদরীও বাগান আর ফুলের কথা বলেছেন বারবার দেশ প্রসঙ্গে, এই বাগান ও ফুল আসলে শুভবাদী চেতনার প্রতিনিধি। তাঁরা কবিতায় ফুল ও বাগানের প্রতিরূপকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মতো শুভবাদী চেতনার আবাহন সম্পন্ন করেছেন; সেই সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের সঙ্গে স্বদেশকে মেলাতে চেয়েছেন ঐকান্তিক ব্যাকুলতায়। শামসুর রাহমান বলেছেন : 'আমার মনোভূমিতে যে বাগান রয়েছে, সেখানে সৌন্দর্য, কল্যাণ এবং প্রগতির সহাবস্থান বিদ্যমান, সেই বাগানের পরিচর্যার একটি প্রধান উপাদান হলো কবিতা' (রাহমান, ২০০৪ : ২২৫)।

১৯৭৪ সালে যখন 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা' প্রকাশিত হচ্ছে তখন যুদ্ধের অনেক ভয়াবহ ঘটনা পরিণত হয়েছে স্মৃতিতে। বিগত কয়েক বছরে মানুষের ভীতি, ক্ষত সব ধীরে ধীরে মুছে গেছে, কবির মন আরোগ্য লাভ করেনি। যুদ্ধ এসে বদলে দিয়েছে মানুষের মূল্যবোধ, সন্ত্রাস সৃষ্টি করাটা মানুষের অস্তিত্বের সাথে মিশে গেছে, সদ্য স্বাধীন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রের যে ধরনের পরিচর্যা পাবার কথা সেটি বাংলাদেশ পায়নি। বরং সন্ত্রাস, লুটতরাজ আর অব্যবস্থাপনা-বিশৃঙ্খলার ভেতরে ভেঙে পড়তে থাকে স্বাধীনতার স্বপ্নভূক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। শামসুর রাহমানের কবিতার বাস্তব-পরাবাস্তবতার সীমাজুড়ে চলে নানারকম ভীতি জাগানিয়া নাটকের মহড়া—প্রভুভক্ত কুকুর রক্তনেশায় কামড়ে ধরে কণ্ঠনালী, ভাই অনায়াসে কেটে ফেলে ভাইয়ের মাথা, উন্মাদিনী এক যুবতী মৌসুমী ফুল চিবিয়ে খেতে থাকে, আর এক নারী আত্মহত্যা করে কড়িকাঠে ঝুলে, মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের নকল দাঁতের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয় কিশোরীর স্তন।[১৪] শামসুর রাহমানের এই প্রত্যক্ষণকে শুধুই পরাবাস্তব বলে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে স্তরে স্তরে সংঘটিত নৈতিক অবক্ষয়ের ছায়াপাত ঘটেছে এইসব খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকল্পের ভেতর দিয়ে।

যুদ্ধ একদিকে মানুষের মুক্তির মতো মহৎ, উদার, শুভবাদী চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে রক্তপিপাসু, লুটেরাদের নৈতিক পতন ও স্খলনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। শামসুর রাহমানের যুদ্ধ-

কবিতাগুলো শুধু কবিতা নয়, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতিও বটে। ৭১-এ সবাই যোদ্ধা ছিল না, অধিকাংশ সাধারণ নিরীহ মানুষ পালিয়ে জীবন ও সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছিল, শামসুর রাহমান নিজেও সেইসব অভিজ্ঞতার সজীব শিকার ছিলেন বলেই তাঁর কবিতা যুদ্ধকালের প্রামাণ্য দলিল। কালে কালে মানুষভেদে যুদ্ধ নানা রকমের হয়ে থাকে। সেই ভয়াবহ সময়কে কবিতায় রূপান্তর করে ঢেলে সাজানো, হানাদার বাহিনী ও তাদের সমর্থকদের হাত থেকে সেসব পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার ভেতর সূচিত হয়েছিল অন্য রকমের এক যুদ্ধ। শামসুর রাহমান কবিতার বাইরে যোদ্ধার কাতারে দাঁড়াতে না পারার বেদনাকে মুখ্য করে দেখলেও পঞ্চাশের আরেক সতীর্থ সৈয়দ শামসুল হক অস্ত্রের যুদ্ধ এবং কলম-যুদ্ধকে সমান মূল্য দিতে চান—'পঞ্চাশের দশকের আমরা সেই আমাদের সাহিত্য-জীবনের সকালবেলায় হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ভেতরে কলমের যে কাজ করে যাচ্ছিলাম সেটি ছিল এক যুদ্ধ—আরেক যুদ্ধ পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীকে বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় ডেকে আনা এবং একই সঙ্গে আধুনিকতার তথা বৈশ্বিক উত্তরাধিকার ও সমকালীনতার সঙ্গে পূর্ববাংলার সাহিত্যচেতনাকে যুক্ত করা। এই যুদ্ধ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সমান বিজয়ের ও গুরুত্বের' (হক, ২০০০ : ১৭৩)।

## যুদ্ধপরবর্তী দেশ

*ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* থেকেই মুক্তিযুদ্ধ এক অনির্বাণ স্মৃতির নাম, একজন সচেতন কবির কাছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তুলনায় স্মৃতিও কম মূল্যবান নয়, স্মৃতি-রোমন্থনের ভেতর দিয়ে ইতিহাস পুনরাবিষ্কৃত হয়। শামসুর রাহমানের কবিতায় যুদ্ধ-স্মৃতি দুভাবে কাজ করেছে—ভয় ও বেদনা এবং গৌরব। কখনো কখনো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও ছিল মৃত্যুর আশঙ্কামাখা সময়, ঘাতকের আক্রমণে প্রাণনাশের ভয় কখনো পুরোনো হয় না, অভিশপ্ত সময়ের প্রান্তে কেবল হিংসা, বিদ্বেষ আর মৃত্যুর মুখোশ পরা আততায়ী, তাই কবি এ শহরে আর নতুন জন্ম চান না—'চাই না এখানে কোনো শিশু কখনো ভূমিষ্ঠ হোক,/ হলে সে নিশ্চিত আঁতুড়ঘরেই হবে ভীষণ দণ্ডিত' ('আঘাটায়', *এক ধরনের অহংকার*)। কারণ যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাঙালির মূল্যবোধ, রক্তের ভেতরে যেন থেকে গিয়েছিল যুদ্ধকালের জিঘাংসা। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি হয়ে পড়ে শোচনীয় :

> অনভ্যস্ত ও অসংগঠিত প্রশাসন এবং তার বিপরীতে অনিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি স্বাধীনতার ফলটিকে রাতারাতি বিস্বাদ করে তোলে। মুষ্টিমেয় লুম্পেন সুবিধাবাদী চক্র, উচ্চবিলাসী

আমলাতন্ত্র ও ক্ষমতালোভী ফড়িয়া রাজনীতিকরা স্বাধীনতা নামক গন্ধম ফলটিকে ভাবাবেগে আত্মসাৎ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বাংলার গণমানুষের দু'চোখের উপর বাদুড়ের কালো ডানা সেঁটে বসে। সেই অদ্ভূত আঁধারে বাংলাদেশের কবিতায় শান্তি-স্বস্তি-প্রত্যয়-আরাম আবার হারাম হয়ে ওঠে। এই দিনগুলোতে তাঁদের মুখের কণ্ঠস্বর অনুচ্চ বিলাপে পর্যবসিত' (সিদ্দিক ২০০৯ : ৯৮)।

সদ্য জন্ম নেয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনর্গঠনে শেখ মুজিবুর রহমান সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত করতে পারেননি প্রশাসনকে। স্বাধীনতার বিজয় আনন্দ পানসে হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। স্বাধীনতা-উত্তর বিপন্ন স্বদেশে আর প্রতিবাদ বা দ্রোহ নয়, কবিতার বিষয় দখল করে নিয়েছিল হৃদয় নিংড়ে আনা বিলাপ :

এ দেশের প্রতিটি গোলাপ আজ ভীষণ মলিন,
প্রতিটি সবুজ গাছ যেন অর্ধ-নমিত পতাকা,
আমাদের বর্ণমালা হয়ে গেছে শোকের অক্ষর,
আমাদের প্রতিটি শব্দ কবরের ঘাসের ভেতরে
হাওয়ার শীতল দীর্ঘশ্বাস;
আমার প্রতিটি চিত্রকল্প নিষ্প্রদীপ ঘর আর
আমার উপমাগুলি মৃতের মুঠোর শূন্যতায় ভরপুর,
আমার কবিতা আজ তুমুল বৃষ্টিতে অন্ধ পাখির বিলাপ।

('অবিরল জল ভ্রমি', *অবিরল জলভ্রমি*)

স্বাধীন স্বদেশে স্বৈরশাসনের বৈরীতায় নির্মলেন্দু গুণ কাব্য-পথ বদলে আত্মমুখী হয়েছিলেন, শামসুর রাহমানও সেরকমই চেয়েছিলেন, তাই কবিতায় ঘোষণা দিয়েছিলেন : 'আবার আমার মন নীলিমামাতাল ঈগলের মতোই চঞ্চল হয়ে ওঠে, পর্বতের এক চূড়া থেকে দূরবর্তী অন্য চূড়ায় স্বপ্নের দীপ্র গুঁড়া/ ব্যাকুল ছড়িয়ে দিতে চায়' ('ডন জুয়ান', *নায়কের ছায়া*)। আলোহীন, দিশাহীন কালের গর্ভে নিমজ্জিত কবির চেতনা এবং কবিতা, এজন্য কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ লাভের লড়াইয়ের ময়দানে আর যেতে চান না কবি, সব সংঘাত থেকে অবসর নিয়ে হতে চাইলেন শুদ্ধ চৈতন্যের অভিসারী :

আর পারি না, দাও ছড়িয়ে পদ্মকেশর
বাংলাদেশে।
ঘাতক তুমি সরে দাঁড়াও, এবার আমি
লাশ নেবো না।

নই তো আমি মুর্দাফরাশ। জীবন থেকে
সোনার মেডেল,
শিউলিফোটা সকাল নেবো।
ঘাতক তুমি বাদ সেধো না, এবার
আমি গোলাপ নেবো।

('ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

শুভ চৈতন্যের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে সুসময়ের ভেতরে বাস করার প্রত্যাশা ও দাবি কবি তুলেছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশ ও সমকাল কি সেই প্রত্যাশার অনুকূল আবহ দিয়েছিল কবিকে? যুদ্ধ এবং দেশের অরাজক পরিস্থিতি কবিকে এই স্বপ্ন থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুদ্ধ-পরবর্তী আরেকটি বাস্তবতা—নিত্যনতুন বধ্যভূমি আবিষ্কারের বেদনা, যা পুরোনো ক্ষতকে খুঁচিয়ে সতেজ করে তুলেছিল : 'প্রতিদিন ঘন ঘন দেখেছি কবর, এখনও তো/ গণকবরের খাঁ-খাঁ প্রতিবেশ সত্তা জুড়ে রয়' ('মহররমি প্রহর, স্মৃতির পুরাণ')। *সৌন্দর্য আমার ঘরে* কাব্যের 'কবির ডায়েরি' কবিতায় রয়েছে ঘাতক সময়ের অতীত বিভীষিকা : 'চোখ বুজলেই দেখি কালো বধ্যভূমির উপরে/ একটি রহস্যময় পাখি উড়ে উড়ে গান গায়/ সারারাত।'

শামসুর রাহমান আজন্ম যুদ্ধকে ঘৃণা করেছেন, যুদ্ধে যেমন রক্তপাত, লুটতরাজ, সম্মানহানি রয়েছে তেমনি 'মারী আর মন্বন্তর লোকশ্রুত ঘোড়সওয়ারের/ মতোই যুদ্ধের অনুগামী' ('উদ্ধার', *বন্দি শিবির থেকে*)। তাঁর এই বাস্তব-অভিজ্ঞতা নিঃসৃত ভবিষ্যৎ-ভাবনা যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে নিদারুণভাবে ফলে গেছে। তাছাড়া 'মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ-আন্দোলন মধ্যবিত্ত চরিত্র অতিক্রম করলেও স্বাধীনতার পরে আবার মধ্যবিত্ত নেতৃত্বেরই পুনর্বাসনের তোড়জোড় চললো। এবং এই নেতৃত্ব তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই সারা দেশে যে নব্য ধনী ও মুৎসুদ্দি শ্রেণী গড়ে তুললো—তা যেমন নির্দয় তেমন স্বার্থপর। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় যখন সমগ্র বাংলাদেশে দিন-রাত্রির প্রভেদ নিশ্চিহ্ন, তখন এঁরা বিলাস-বহুল জীবনের আবেশে বিহ্বল' (কামাল, ২০০৯ : ১০৯)। যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে ঘনিয়ে আসা দুর্ভিক্ষ শামসুর রাহমানের *আমি অনাহারী* কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় বিষয়রূপে বিন্যস্ত হয়েছে। নতুন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরুর বিশৃঙ্খলা এবং আন্তর্জাতিক মহলের কূটচালে যুদ্ধের অল্পকাল পরে দেশ হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষ এবং ষড়যন্ত্রের সহজ শিকার :

শহরের আনাচে-কানাচে ফেরেশতার ভাঙা
ডানা পড়ে থাকে; কত বিষণ্ন করোটি ফুটপাতে, ঝোপঝাড়ে

কালোবাজারির বন্ধ গুদামের আশেপাশে লুটায় কেবলি।

('এই নবান্নে', *আমি অনাহারী*)

নবান্নে নতুন ফসলের ঘ্রাণ আর উৎসবে ভরে ওঠার পরিবর্তে বাংলার ঘরে ঘরে অনাহারে মৃত শিশু, দুঃসংবাদ আর 'বাংলাদেশের কত উনুন হাঁ-করা কবরের মতো/ শূন্যতাকে লালন করছে' ('বিদ্রোহী বলে শনাক্ত করে')। একাত্তর-পরবর্তীকালে প্রশাসন, অর্থনীতি, শিল্প-কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাগোগ-ব্যবস্থা সবই ছিল ভঙ্গুর, বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায়। সেই পরিস্থিতিতে গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে এ দেশের এক শ্রেণির মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের মহড়ায় অংশ নেয়, যার পেছনে ছিল আন্তর্জাতিক মহলের মদদ, 'এর সঙ্গে যুক্ত হয়, একটানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য নিয়ে মার্কিন রাজনীতি এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় হু হু করে। জ্বলন্ত অভিশাপের মতই দেশবাসীর ওপর নেমে আসে চুয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তর। মারা যায় অগণিত লোক' (মনসুর, ১৯৯৩ : ১৩৩)। ভয়াবহ সেই দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে মানুষের মৃত্যু, বিচলিত করে শামসুর রাহমানের স্পর্শকাতর মনকে। 'এই নবান্নে', 'বিদ্রোহী বলে শনাক্ত করে', 'বন্ধুকে বললাম', 'এখন আমার শব্দাবলি', 'জলের এমনই রীতি', 'একটি কান্না'— কবিতাসমূহে দুর্ভিক্ষতাড়িত দেশ এবং অনাহার-পীড়িত মানুষের ভাষ্য খোদিত হয়েছে। স্বাধীনতা পাবার পর কবিতায় সেই উৎসব উদ্‌যাপনের সুযোগ পাননি এদেশের কবিরা, বরং অপ্রাপ্তির বেদনায় হয়ে উঠেছেন ক্ষুব্ধ, সেই ক্ষুব্ধতার খানিকটা উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে শামসুর রাহমানের খেদোক্তিতে—'হে আমার গিল্টি করা নকল সোনার বাংলা তুমি ক্ষেতে ক্ষেতে/ বুনে যাচ্ছো ড্রাগনের দাঁত, ওষ্ঠে নিচ্ছো তুলে বিষাক্ত শিশির' ('এই নবান্নে')। বহু বছর ধরে আগলে রাখা 'সোনার বাংলা' মিথকে যেন তিনি কটাক্ষ করলেন, যদিও স্বদেশের প্রতি তাঁর মমতার ঘাটতি ছিল না, *দুঃসময়ে মুখোমুখি* কাব্যের 'বহু কিছু থেকে ছুটি' কবিতায় 'সোনার বাংলা' মিথকে তিনিই সহজ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, বহুকিছু থেকে ছুটি নিলেও স্বদেশভাবনা থেকে, স্বদেশ-সংলগ্নতা থেকে কবির ছুটি নেই, এ কবিতায় দেশকে প্রবাদতুল্য করেই দেখেছিলেন কবি :

তোমার রূপের খ্যাতি পরাক্রান্ত প্রবাদের মতো
এখনও ছড়িয়ে আছে হাটে মাঠে ঘাটে; এখনও তোমার মুখ,
সর্ষে ক্ষেতের মতো মুখ,
সোনালী আঁশের মতো চুল,
জেলের ডিঙ্গির মতো ভুরু,
মেঘনার মতো কালো টলটলে চোখ

('বহু কিছু থেকে ছুটি', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

জীবনানন্দকেও এ প্রসঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, যেহেতু 'রূপসী বাংলা', 'আবার আসিব ফিরে' অথবা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'র মতো সৃষ্টিকর্মসমূহ তাঁকে দিয়েছিল স্বদেশপ্রেমের প্রবাদতুল্য খ্যাতি। শামসুর রাহমান নিজেও তাঁর পথের পথিক।[১৫] তবে স্বদেশের জন্য তাঁর কবিতায় আয়োজন একবারে অনাড়ম্বর, তিনি দেশকে 'লৌকিকতাহীন মা' সম্বোধন করেন এবং জানিয়ে দেন তাঁর অন্তরে উদগত প্রেমের কথা সরল আবেগে 'ভালোবাসি তোমাকেই হে দেশ আমার' ('বহু কিছু থেকে ছুটি')। পরবর্তীকালে কী এমন ঘটল যে 'সোনার বাংলা' মিথকে তাঁর দেখতে হলো অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে? এ প্রশ্নের উত্তর আছে ইতিহাসে, তিনি দেখেছেন দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অনাহারী মানুষের মুখ, চক্রান্ত ও হামলা; দেখেছেন 'রুক্ষ বুভুক্ষায় জেগে' ওঠা 'একটি হাভাতে পশু' ('রুক্ষ্ম বুভুক্ষায়', *আমি অনাহারী*), দেখেছেন 'ইতিহাসের চুলে বিলি কাটছে/ বয়স্ক অন্ধকার।' ইতিহাসের সেই তমসা বেয়েই নেমে আসে আরেকটি বিয়োগান্তক অধ্যায়, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সাল : 'সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিধন শুধু নয়, বাংলাদেশের রক্তার্জিত গণতন্ত্র নিধনবর্ষ হিশেবে কুখ্যাত হয়ে থাকবে এই ১৯৭৫। আমাদের সংবিধানের প্রায় সব ক'টি মূল শর্ত উপ্‌রে চষে সমভূমি করে দিল এক দাঁতাল দানব। এই দানবটির গায়ে জলপাই লেবাস, বসত ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকে। এর পোশাকি নাম মার্শাল ল তথা সমরতন্ত্র, প্রচ্ছন্ন নাম ফ্যাসিতন্ত্র' (সিদ্দিক, ২০০৯ : ৯৯)। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু দেশের ইতিহাসকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দূর অতীতে, পাকিস্তান আমলের মতো স্বাধীন বাংলাদেশ স্বৈরতন্ত্র-কবলিত হয়েছিল আবার, এবার আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য। বাঙালির জাতীয়বাদী চেতনা গঠন, বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রূপ দান এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য, শামসুর রাহমানের কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে তাঁর অবস্থান :

> আমি এমন এক তরুণের কথা জানতাম,
> যে তার কবিতায় আলালের ঘরের দুলাল, মেনিমুখো শব্দাবলি ঝেড়ে ফেলে
> অপেক্ষা করত সেদিনের জন্যে,
> যেদিন তার কবিতা হবে মৌলানা ভাসানী
> এবং শেখ মুজিবের সূর্যমুখী ভাষণের মতো।
>
> ('বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো', *আমার কোনো তাড়া নেই*)

কবিতায় বর্ণিত এই তরুণ কবিই শুধু নন, শামসুর রাহমান নিজেও শক্তি অর্জন করতে চেয়েছেন 'শেখ মুজিবের উদ্যত তর্জনী থেকে'। 'আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা', (*কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*), 'ধন্য সেই পুরুষ' (*অবিরল জল ভ্রমি*), 'যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতি-বলয়' (*হেমন্ত*

*সন্ধ্যায় কিছুকাল*), 'অস্বীকৃত তোমার মৃত্যু' (*ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*), 'ইতিহাসের মোড়ে দাঁড়িয়ে ডাকছি' (*মেঘলোকে মনোজ নিবাস*), 'এত অন্ধকারময়' (*নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*) কবিতাসমূহে বঙ্গবন্ধুর নির্মম মৃত্যু, বাঙালি জাতির অপূরণীয় ক্ষতি এবং শোক উঠে এসেছে। শামসুর রাহমানের কবিতা প্রেরণা সংগ্রহ করেছে সেই ঘাতক দিনের শোকাবহ স্মৃতি থেকে :

> এই লেখা উঠে এসেছে সেই সিঁড়ি থেকে,
> যেখানে পড়েছিল ঘাতকের গুলিবিদ্ধ তোমার লাশ,
> এই লেখা উঠে এসেছে তোমার বুক জোড়া রক্তাক্ত গোলাপ থেকে
> বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া নব পরিণীতার
> মেহদি-রাঙা হাত এবং
> শিশুর নেকড়ে খোবলানো শরীর থেকে।
>
> ('তোমারই পদধ্বনি', *হরিণের হাড়*)

নতুন একটি দেশ জন্মের পরপরই আক্রান্ত হয়েছে দুর্ভিক্ষে, তার কিছুকাল পরেই এদেশ হারিয়েছে তার জাতির পিতাকে নির্মমভাবে। মুসলিম লীগের ব্যর্থতার পর বাঙালি আওয়ামী লীগের হাত ধরে দেশ দেখেছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন, ৬ দফা দাবি পেশ করে বঙ্গবন্ধু মূলত স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক আহ্বানে বাঙালি জাতীয় চেতনায় আরও শক্তিশালীভাবে সংঘবদ্ধ হয়। শামসুর রাহমান স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, '৭৫ পরবর্তীকালের একাধিক কবিতায় তিনি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন বঙ্গবন্ধুর প্রতি। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর 'ইলেকট্রার গান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে পিতৃহারা সন্তানের হাহাকার।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঢাকা শহরের কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, সেইসঙ্গে উদিত হয়েছে নতুন নাগরিক চৈতন্য, বদলে গেছে আর্থ-সামাজিক অবস্থান। সেই নাগরিক চৈতন্যের নতুন রূপের ভেতরে কবি সৃষ্টির চেয়ে বিনষ্টির ছবিই বেশি দেখতে পেয়েছেন, দেখেছেন নৈতিক অবক্ষয়, আত্মস্বার্থপরায়নতা। যুদ্ধ যেন রক্তের ভেতরে বিকারের বীজ রোপণ করে দিয়ে গেছে, যেমন বৃটিশ শাসনপর্বে ভারতের দুটি সম্প্রদায়ের চেতনার ভেতরে রোপিত হয়েছিল ভ্রাতৃহত্যার মন্ত্রণা, স্বাধীন বাংলাদেশেও পূর্বপুরুষদের সেই আগুনমুখা হিংস্র শ্বাপদ সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ ছড়িয়েছে। দেশবিভাগের পূর্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছিল নিদারুণভাবে, যার পেছনে মদদদাতা হিসেবে

শনাক্ত করা হয়েছিল বৃটিশ শাসকদের। পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন সম্প্রীতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যেখান থেকে ভ্রূণায়িত হয় বাংলাদেশের বীজ। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ দেশেও ছড়িয়ে পড়ে, রাজনৈতিক স্বার্থে এর পেছনে মদদদাতা ছিল আইয়ুব খান ও মোনায়েম খান। এ দেশের সাধারণ বাঙালি বেসরকারি উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের উদ্যোগ নিলেও পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গা প্রতিরোধে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে চায়নি। দেশবিভাগের পরও যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ দেশে ছিল, তারা দেশত্যাগ করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সামরিক শাসন ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত মুক্ত থাকার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, বাহাত্তরের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি সংযুক্ত হয় চার মূলনীতির একটি অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাবসানের পর বাংলাদেশের রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে, সামরিক শাসনও প্রত্যাবর্তন করে। নব্বইয়ের দশকে ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তাপ ও আগুন এ দেশে ছড়িয়ে পড়ে, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও বাংলাদেশের অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক জিঘাংসার জের চলতে থাকে। এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নীরবে দেশত্যাগ অব্যাহত রেখেছিল, সমাজ সচেতন ও মানবতাবাদী কবি শামসুর রাহমান তাদের অসহায় পরিস্থিতি এবং অস্তিত্বের সংকট উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রত্যয় নিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুক শুভবাদী মানুষেরা। এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন 'সুধাংশু কোথাও যাবে না' (*ধ্বংসের কিনারে বসে*), 'মিহিরের উদ্দেশে' (*উজাড় বাগানে*), 'হরিনাথ সরকার বলছেন' (*আকাশ আসবে নেমে*), 'বেঁচে থাকতে চাই' (*হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*), 'শুষে নেয় পোড়ামাটি' (*ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*) কবিতাবলি। এ দেশের জল-হাওয়া-মাটির অনুদানে যে জীবন হরিনাথ সরকারের, সাম্প্রদায়িক বিষ সেই পোক্ত এবং নিশ্চিন্ত জীবনের শেকড় নাড়িয়ে দেয়। সোমত্থ মেয়েসহ পালাতে পালাতে উন্মুল হরিনাথের বুকচেরা আর্তনাদ ধ্বনিত হয়—'আমার দেশের মাটি, ধূলিকণা আলো-হাওয়া জল/ কেন আজ এমন নিষিদ্ধ হবে আমারই সংসারে?' *উজাড় বাগানের* 'তোমরা আমাকে আর' কবিতায় কবি দেখেছেন বহু ঘরবাড়ি পুড়েছে দুর্বৃত্তদের আক্রমণে। এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে শামসুর রাহমান ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক লালসা আর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিভ্রষ্টতাকে দায়ী করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মহাব্রতের আলোয় আলোকিত কবিহৃদয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি এমন আঘাত হানে, যেন আবার আর এক একাত্তর ফিরে আসে, তাই বিজয় দিবসে বিপন্ন মানুষের হৃদয় আনন্দের পরিবর্তে আশঙ্কায় ভরে থাকে। শামসুর রাহমানের মনন-দর্শন ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা-স্নাত, সেই পঞ্চাশের দশকে যে সতীর্থদের সঙ্গে কবিতার রূঢ়ভূমি চাষের

দায় কাঁধে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ শামসুল হক, তাঁকে সাক্ষী রেখে *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল* কাব্যের 'সৈয়দ হকের উদ্দেশে' কবিতায় বলেছেন :

ধর্মীয় উন্মাদনার ঢাকের প্রবল আওয়াজ কখনো
আমাদের টানেনি, সাম্প্রদায়িকতার
দন্ত-নখর ভাঙার শপথ আমরা নিয়েছিলাম
যাত্রালগ্নেই, জঙ্গি পুরুত আর মোল্লাদের হিংস্র চিৎকার
আর প্রাণ সংহারের হুমকি উপেক্ষা করে
আমরা ভালোবেসেছিলাম লালন ফকির এবং রবীন্দ্রনাথের গান।

আমৃত্যু শামসুর রাহমান দেশের কল্যাণ ও মানবতাকে লালন করেছেন চেতনায়, এ দেশে সমঅধিকার নিয়ে সবার সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছেন, তাই সাম্প্রদায়িক হামলায় ভীত-সন্ত্রস্তদের সাহস যুগিয়েছেন দর্পিত উচ্চারণে, জানিয়েছেন এখনও এ দেশে অবশিষ্ট আছে 'সম্প্রীতির চন্দ্রাতপ' :

আকাশের নীলিমা এখনো
হয়নি ফেরারী, শুদ্ধাচারী গাছপালা
আজো সবুজের
পতাকা ওড়ায়, ভরা নদী
কোমর বাঁকায় তন্বী বেদেনীর মতো।
এ পবিত্র মাটি ছেড়ে কখনো কোথাও
পরাজিত সৈনিকের মতো
সুধাংশু যাবে না।

('সুধাংশু কোথাও যাবে না', *ধ্বংসের কিনারে বসে*)

সুধাংশু, মিহির, সুতপা, প্রমীলা, অবিনাশ—এরকম অনেক চরিত্রকে তিনি এ দেশেই থেকে যাবার আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছেন প্রতিনিয়ত। তিনি নিজেও বহুবার বহু সংকটের মুখে পড়েছেন, কিন্তু দেশত্যাগের পরিকল্পনা করেননি। জাতিসত্তার সন্ধানে দেশের বাইরের কোন মাটিতে শিকড় খোঁজার মতো প্রহেলিকাগ্রস্ত ছিলেন না তিনি, এ দেশেই তাঁর শিকড় প্রোথিত সে-কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৬] তবে, কবি হিসেবে তাঁর ভেতরে প্রবল ছিল কসমিক চেতনা, এজন্য কোন নির্দিষ্ট ভূগোলের সীমায় নিজের চেতনাকে আটকে না রেখে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তাঁর স্বদেশভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে কসমিক চেতনার দ্বৈততায় :

কখনো-বা স্বদেশ ভাবনা ব্যেপে আসে।
বাংলাদেশ আমার আপন দেশ, তবু আমি নই
বাঁধা এই ভৌগোলিক সীমায় কখনো;
*(এক ফোঁটা কেমন অনল)*

এ কারণে শামসুর রাহমানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক বলেন : 'স্বদেশ-স্বভাষার প্রতিনিধি হয়েও কবি একজন বিশ্বজনীন মানুষ। ...স্বদেশকে প্রগাঢ়ভাবে বুকে ধারণ ক'রেই তার কবিতা বিশদে সমগ্র বিশ্বের কথা বলে; সমকালের হাটেই ফেরি করে মহাকালের পসরা' (শাহরিয়ার, ২০০১ : ৩৮)।

**মধ্যবিত্ত ও নাগরিক জীবন**

স্বদেশের কথা বলতে গিয়ে শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন সমকালীন মধ্যবিত্ত ও নাগরিক জীবনভাবনাকে। অধিকাংশ আধুনিক কবির একটি করে শহর আছে, বোদলেয়ারের প্যারী, এলিয়টের লন্ডন, বিষ্ণু দে-সমর-সুভাষের কলকাতা, আর শামসুর রাহমানের ঢাকা। ঢাকা শুধু তাঁর জন্মনগরী নয়, বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। ঢাকা প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের কবিতায় নগরের জনজীবন, পেশা-প্রবৃত্তির অনেক চিত্রই খুঁজে পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে সন্ধান পাওয়া যায় নাগরিক চৈতন্যের; যে চৈতন্যে গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে আধুনিক ব্যক্তিমানুষের নৈঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, মধ্যবিত্তের চারিত্র্য। বিভাগ-পরবর্তীকালে ঢাকার নগর-কাঠামোর ভেতরে বিকশিত মধ্যবিত্ত-চরিত্র দেশবিভাগপূর্ব কালের পাকিস্তানবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া মধ্যবিত্তের তুলনায় চিন্তা-চেতনায় স্বতন্ত্র, এ শ্রেণিটি বিকশিত হয়েছিল উদার মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শে। নতুন বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে সমর্পিত হয়েছিল পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিনির্মাণে মধ্যবিত্তের রয়েছে শক্তিশালী ভূমিকা, শামসুর রাহমান নিজেকে মধ্যবিত্তের বলয়ভুক্ত করেছেন এবং কাব্যচর্চার শুরু থেকেই এই শ্রেণির জীবন-জীবিকা, মনন-চৈতন্যের সন্ধান অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর* আগে কাব্যগ্রন্থটিকে অনেক সমালোচক বস্তুজগৎ ও সমকাল থেকে দূরের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁর এ কাব্যে মধ্যবিত্তের যে জীবনচিত্র পাওয়া যায়, তার নেপথ্যে সক্রিয় সমকালকে অস্বীকার করার উপায় নেই। *রৌদ্র করোটিতে* এই শ্রেণি ভীষণ সুবিধাবাদী, আত্মকেন্দ্রিক এবং নিষ্ক্রিয়। ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হবার পর স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়-অবসাদে-সুবিধাবাদে নিমজ্জিত হয়ে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার কালে তারা নীরব। ভাষা আন্দোলনে, উদার মানবতাবাদী জাতীয়বাদ প্রতিষ্ঠায় যারা তৎপর ছিল তারাই 'মেষতন্ত্রে' গা ভাসিয়ে দিয়েছিল :

দিনদুপুরে ডাকাত পড়ে
পাড়ায় রাহাজানি,
দশের দশায় ধেড়ে কুমির
ফেলছে চোখের পানি।
পৃথিবীটা ঘুরছে ঘুরুক
মানুষ উড়ুক চাঁদে,
ফাটায় বোমা সাগর তলায়
পড়ছে পড়ুক ফাঁদে।
তোর তাতে কি?

('মেষতন্ত্র', *রৌদ্র করোটিতে*)

সমাজ-স্বদেশের প্রশ্নে এ শ্রেণি নির্বিকার, নির্লিপ্ত, মনোযোগ ছিল কেবল নিজের জীবন ও জীবিকার প্রতি। দেশবিভাগোত্তরকালে বিকশিত নগরসভ্যতা অনেকাংশে ছিল পাকিস্তানবাদের বিকার-বিজড়িত, নামে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের চাপে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা নগরসভ্যতার প্রতিটি স্তর ছিল ক্লেদাক্ত : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উত্তরসূরী শোষক, পরজীবী আমলা-মুৎসুদ্দী ও স্রেফ সাম্প্রদায়িক সাদৃশ্যের সুবাদে বুকে চেপে বসা বিজাতীয় শাসক; এই সবের পাথুরে চাপে এখানে যে নগরসভ্যতা গড়ে উঠল, তার পদনখে কুষ্ঠের কীট, মাথার চুলে উকুনের বিকার' (সিদ্দিক, ২০০৯ : ৯৪)। এ ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দায় কতটুকু সমাজ-পরিবেশ বদলানোর ক্ষেত্রে? নগরসভ্যতার ধুলো জমা, ঘুণে ধরা, অবক্ষয়িত চেতনার বাহক হয়ে ওঠে তারা : 'ধুলো গিলে ভিড় ছেনে উকুনের উৎপাত উজিয়ে/ ক্লান্তি ঠেলে রাত্তিরে ঘুমোতে যাই মাথাব্যথা নিয়ে।/ না জ্বেলে ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি স্বপ্নচারী বিছানায়/ গড়াই, লড়াই করি ভাবনার শত্রুদের সাথে—' ('খুপরির গান', *রৌদ্র করোটিতে*)। উপনিবেশবাদের প্রচ্ছন্ন দাসত্বে শৃঙ্খলিত, মার্কিনী অর্থের প্রলোভনে আক্রান্ত, যৌনবিকৃতির উপাচারে বিভ্রান্ত—সব মিলিয়ে এ পর্বে মধ্যবিত্ত তার দ্রোহী চারিত্র্য থেকে বিচ্যুত, আত্মপরায়ণ : 'একটি প্রখর পাখি ঠুক্‌রে ফেলে দেয় অবিরত/ পোকা-খাওয়া মূল্যবোধ। আমরা যে যার মতো পথ চলি' ('ছুঁচোর কেত্তন', *রৌদ্র করোটিতে*)। আদি-অন্তহীনতার মাঝখানে ঊর্ণনাভের মতো ঝুলে থাকা মধ্যবিত্তের কণ্ঠে ছিল না গঠনমূলক ভাষা, তার কণ্ঠে বেজে উঠেছিল দেশ-কাল বিবিক্ত 'ছুঁচোর কেত্তন' :

যদি মুখ আদপেই খুলি বলব কি এপ্রিলের
উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘেমে ঘেমে রোজ হচ্ছি নাজেহাল,

ব্লাউজ পিস্‌টা চমৎকার... তোমাকে মানাবে ভালো
পরো যদি খয়েরি শাড়ির সঙ্গে
... ... ... ...
বলব কি টাইয়ের নিখুঁত নট শিখলো না বাঁধতে বেচারা
আজ অব্দি, বলব কি তিনটি সরলরেখা মিলেই ত্রিভুজ...
ঘরে বসে *ছুঁচোর কেত্তনে* আজ মেটাব কি সাধ,

তবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সক্রিয়তায় যেহেতু সমাজ-স্বদেশের গতিধারা বদলায়, এ কারণে অনেক কূট-কৌশল প্রয়োগ করেও কালের সংঘাত থেকে শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণিকে বিযুক্ত রাখা যায়নি, স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে তাদের চেতনা জাগ্রত হবার ফলেই সংঘটিত হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থান, পূর্ব বাংলা শক্তি সঞ্চয় করেছিল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাদবাকি জাতীয় আন্দোলনের উৎসভূমি ছিল ঢাকা, নেতৃত্ব দিয়েছিল নাগরিক মধ্যবিত্ত। শামসুর রাহমান *নিজ বাসভূমে* থেকে মধ্যবিত্তের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর আবারও মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী, আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বপ্নভঙ্গের উদাসীনতায় উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। স্বৈরশাসন কবলিত বাংলাদেশে তাদের কিছুই করার থাকে না, নিজেকে নিষ্ক্রিয় মধ্যবিত্তের কাতারে রেখে উদাস দর্শকের ভূমিকা পালন করেন শামসুর রাহমান নিজেও : 'মধ্যবিত্ত মেজাজে চায়ের কাপে ঠোঁট রেখে দেখি/ আশির দশক মাদী ঘোড়ার মতন পাছা দোলাতে দোলাতে/ চলে যাচ্ছে' ('স্মৃতিতে ধারণযোগ্য কিছু নয়', *হোমারের স্বপময় হাত*)। নব্বইয়ের গণ আন্দোলনে নূর হোসেনের মৃত্যুর পর নাড়া খেয়ে আবার জেগে ওঠে মধ্যবিত্তের দ্রোহ, প্রতিরোধী চেতনা। শামসুর রাহমান কবিতা এবং কবিতা পরিষদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এ আন্দোলনে, ফলে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনের ভেতরে সূচিত হয় সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের যৌগপত্য।

ঢাকার নাগরিক জীবনচাঞ্চল্য শামসুর রাহমান দেখেছেন, দেখেছেন অবক্ষয়িত সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, সমর সেনের মতই তিনি নিজেকে মধ্যবিত্তভুক্ত করে কবিতায় খুঁজেছেন এই শ্রেণির জীবনজিজ্ঞাসা। আর্থ-সামাজিক স্তরায়নে দারিদ্র্য এবং বিত্তের মাঝখানে উর্ণনাভের মতো ঝুলে থাকে মধ্যবিত্ত, লাগামবাঁধা ঘোড়ার মতো প্রতিদিনের একঘেয়ে কর্মক্লান্তি দখল করে রাখে তাদের মনের প্রদেশ, জীবন ও জীবিকার ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থাতেও তাদের 'হৃদয়ে প্রহরে প্রহরে মেঘবিস্তার,/ এবং মোহন চন্দ্রোদয়' ('মধ্যজীবনের বৃত্তান্ত', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*) ঘটে থাকে। দেশবিভাগের পর দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে মধ্যবিত্তের ভূমিকা থাকলেও মধ্যবিত্ত

মনের দ্বিধা-দীর্ণতা এবং সময় বিশেষের নিষ্ক্রিয়তা ও সুবিধাবাদী অবস্থানকে সমর সেনের মতই বিদ্রূপ-বিদ্ধ করেছেন শামসুর রাহমান :

মোরগের মতো গলাটা ফাটিয়ে দিইনি স্লোগান,
যাইনি যুদ্ধে একাত্তরে।
অবশ্য শত রাজা উজিরের শব উড়ে যায়
চায়ের কাপের তুমুল ঝড়ে।

('মধ্যজীবনের বৃত্তান্ত', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

মধ্যবিত্তের জীবনবৃত্তান্তে তিনি এই শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছেন অকপটে, কেন্দ্রে রেখেছেন 'আমি'কে : 'মধ্যবিত্তের প্রতিরোধী অবস্থান বা ভূমিকাটিকে শামসুর রাহমান গুরুত্বের সঙ্গে কবিতায় উপস্থাপন করেননি; যেহেতু তাঁর ভেতরের দ্বন্দ্বগুলো থেকে গেছে অমীমাংসিত।...নিজের ও নিজের শ্রেণির সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই নিজের ও নিজের শ্রেণির প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছেন বিদ্রূপ' (সাজ্জাদ, ২০১০ : ২৫৫)। সমর সেনের মতো শামসুর রাহমানের কবিতাতেও আত্মসমালোচনার সাহস দেখা যায়, মধ্যবিত্তের রোমান্টিক অন্তঃসারশূন্যতার ভেতর তিনি নিজেকেই দেখতে পেয়েছেন : 'আমিও নিজেকে দেখি করেছি ঢালাই মাঝারির স্পষ্ট ছাঁচে' ('তিনশো টাকার আমি', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)।

নগরের জীবনঘানিতে বাঁধা মধ্যবিত্ত জীবনের ছক যদিও ভীষণ একঘেয়ে, পীড়াদায়ক; তারা সুযোগ বুঝে দেশত্যাগের জন্য 'বাক্স প্যাঁটরা' তৈরি রাখলেও, শামসুর রাহমান নিজে এই দেশ, এই শহরের কোন বিকল্প খুঁজতে চাননি। চৈতন্যে যে ক্লেদ জমা হয় নাগরিক জীবন থেকে, সেই নগরের কাছেই তিনি আরোগ্য কামনা করেন : 'জ্যোস্নায় ভাসছো তুমি ঢাকা বেসামাল পূর্ণিমায়।/ যাবো না স্বাস্থ্যের লোভে কোনো শৈলাবাসে,/ তুমি আছো, থেকো তুমি আমার অসুখ সেরে যাবে' ('জ্যোস্নায় ভাসছে ঢাকা', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*)। নগরে বসবাস-সূত্রে, 'নাগরিক কবি' উপাধি প্রাপ্ত শামসুর রাহমানের অভিজ্ঞতায় যুক্ত হয়েছিল নগর-চৈতন্য, যা তাঁর কবিতার বিষয় নির্মাণে এবং নিহিতার্থ গঠনে বড় ভূমিকা পালন করেছে : 'কবির সাথে তাঁর শহরের যে সম্বন্ধ তার দুটো মাত্রা আছে; একটা নেহাত ভৌগলিক ও পরিবেশগত, আরেকটা দার্শনিক, নান্দনিক, চিন্তাগত' (শিরাজী, ২০১০ : ৩৩)। ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থানকে বস্তুগতরূপে প্রতিমূর্তিত করা যায়, কিন্তু দার্শনিক, নান্দনিক বা চিন্তাগত অবস্থা এক ধরনের বিমূর্ত ধারণা, যার সন্ধান পাওয়া যায় বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের

অন্তরালে। শামসুর রাহমানের কবিতায় ক্রমশ বিবর্তিত ঢাকার নগরচৈতন্য ও নাগরিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে 'ঘোড়া'র ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

## ঘোড়া

ঘোড়ার সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক অনেক পুরোনো, ঘনিষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক। ইতিহাস বলছে, ঢাকার নগর-সভ্যতা একসময়ের প্রয়োজনীয় কিছু পেশাকে ধীরে ধীরে জনজীবন থেকে বাতিল করে দিয়েছে, ভিস্তিওয়ালা, বাতিওয়ালা এবং ঘোড়ার সহিস—এই তিন পেশাজীবী সম্প্রদায় আধুনিক ঢাকা থেকে ক্রমশ বিলীন হয়ে গেছে। ইলেকট্রিক বাতির ব্যবহার, পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন এবং ইঞ্জিনচালিত মোটরকার নগরজীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে। শামসুর রাহমানের কবিতায় এই নতুন সময় এবং বদলে যাওয়া পুরোনো সময়ের নাগরিক জনজীবনের সন্ধান পাওয়া যায়, বিশেষ করে আদি ঢাকার পুরোনো দিনের বিবরণে-বর্ণনায় 'ঘোড়া ও ঘোড়ার প্রতীক ফিরেফিরে আসে তাঁর কবিতায়' (আজাদ, ১৯৮৩ : ৩৫)। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যগ্রন্থের বেশ আলোচিত একটি কবিতা 'সেই ঘোড়াটা', এ কবিতার ঘোড়াকে নানা প্রেক্ষণবিন্দু থেকে যাচাই-বাছাই করেছেন সমালোচকবৃন্দ। ভালো কবিতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, সেই কবিতার ভেতরে পাঠক নানা প্রান্ত থেকে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং কবিতার একাধিক মাত্রা আবিষ্কারে সক্ষম হয়, 'সেই ঘোড়া'টায় 'বাস্তবে পরাবাস্তবতা' (আজাদ, ১৯৮৩ : ৩৫) বা 'অলৌকিক আর লৌকিকের পরস্পরিতা' (কামাল, ২০১৪ : ৩৫) দেখেছেন অনেক সমালোচক, আবার অনেকেই দেখেছেন বোদলেয়ার ও এলিয়টের ব্যাপক প্রভাব। ঢাকায় বসবাসসূত্রে নাগরিক জীবনের কিছু ক্লেদ-গ্লানি, স্বপ্ন-হতাশা শামসুর রাহমানের অভিজ্ঞতাতেও স্থান করে নিয়েছিল, কাজেই নাগরিক-চৈতন্যের অবক্ষয়িত রূপের বর্ণনায় বোদলেয়ার ও এলিয়টের প্রভাবকে অস্বীকার না করেও বলা যায় :

> শামসুর রাহমানের নাগরিকতা দ্বিমাত্রিক—এক. অভিজ্ঞতা-অর্জিত দুই. পূর্বজ কবি ও পাশ্চাত্যের প্রভাবজাত। বহু বছরের পুরোনো নগর ঢাকাকে শামসুর রাহমান প্রকাশ করেছেন আত্মীকরণের মাধ্যমে, যেভাবে কলকাতাকে প্রকাশ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ-বিষ্ণু দে-সমর সেন। তাঁর এই নাগরিক হয়ে-ওঠা কোনোভাবেই আকস্মিক নয়; কারণ বাংলাদেশের এক পুরোনো ও কেন্দ্রীয় নগর হিসেবে ঢাকা পঞ্চাশ-ষাটের দশকে অনেকাংশেই বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। আর শামসুর রাহমান তো বেড়ে উঠেছেন এই নগরের অভিজ্ঞতাতেই (সাজ্জাদ, ২০১০ : ২৫৯)।

নাগরিক জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা শামসুর রাহমানের 'ঘোড়া তাঁর ধনযৌবনমদমত্ত সামন্তশ্রেণীর স্মৃতি-অনুষঙ্গ—যার ক্ষয়িত রূপ তিনি দেখেছেন কৈশোরে—পুরোনো ঢাকায়' (কামাল, ২০১৪ : ৩৫)। 'সেই ঘোড়াটা' কবিতায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দানুষঙ্গ বিশ্লেষণ করলে অবক্ষয়িত, বিগত সময়ের রূপরেখা পাওয়া যায়। এ কবিতার সহিস 'ক্লান্ত', 'নিঃসন্তান', এবং উপর্যুপরি 'বিপত্নীক', ফলে তার পক্ষে উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া অসম্ভব, যেন সে বন্ধ্যা সামন্তকাল, যার কোন উত্তরসূরী নেই। একটি বিগত-প্রায় কালের অন্তিম স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে কবিতাটি, যার আরেকটি পরম্পরা খুঁজে পাওয়া যায় 'জনৈক সহিসের ছেলে বলছি' কবিতায় :

ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে, আমি একা
খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
মুমূর্ষু পিতার কথা, যার শুক্‌নো প্রায়-শব প্রায়-অবাস্তব
বুড়োটে শরীর
কিছুকাল ধরে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা
বিছানায়।

('জনৈক সহিসের ছেলে বলছে', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

এখানেও ঘোড়ার অনুষঙ্গে পুরোনো ঢাকা এবং তাঁর ক্ষীয়মান ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে, একসময় ঢাকার নগর-সভ্যতার কেন্দ্রে ছিল পুরোনো ঢাকা। ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় সে সময় আধুনিক জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িয়ে ছিল। শামসুর রাহমান যখন কবিতাচর্চা শুরু করেন এবং কবি হিসেবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে থাকেন তখন পুরোনো ঢাকার ঘোড়া-সংক্রান্ত অনুষঙ্গগুলো কখনো যাপিত জীবনের অংশ, কখনো বিলীয়মান সময়ের প্রতিকৃতি আবার কখনো স্মৃতিকাতরতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। জনৈক সহিসের ছেলের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কবিতায় উঠে এসেছে দুটি কালের অবস্থা—একটি কাল পিতার অন্যটি পুত্রের, পুরোনো কালের অন্তিম সত্তার ওপরে নতুন কালের অবশ্যম্ভাবীতার কথা বলেছে কবিতাটি। রেসের ঘোড়ার সহিস 'মুমূর্ষু' পিতার স্মৃতিচারণে উঠে আসে তাঁর 'জকির শার্টের মতো' উজ্বল রঙিন দিনযাপনের কাহিনি—'কখনো মুমূর্ষু পিতা ঘোড়ার উজ্বল পিঠ ভেবে/ সস্নেহে বুলোন হাত অতীতের বিস্তৃত শরীরে।' সহিসের পুত্রের কাল স্বতন্ত্র, স্বপ্নও স্বতন্ত্র—যেখানে রয়েছে 'চিমনি', 'টালি', 'ছাদ', 'যন্ত্রপাতি', আর 'ফ্যাক্টরির ধোঁয়া'র ভিড়' অর্থাৎ যন্ত্রসভ্যতার দাপট। পিতার পূর্বে বারবার 'মুমূর্ষু' বিশেষণ ব্যবহার শুধু তার শারীরিক

অবস্থার দিকনির্দেশক নয়, বরং ঘোড়ার রেস এবং সহিস পেশার বিপন্নতার ইঙ্গিতবাহী—'এই পিতা এখানে শুধু পিতৃতান্ত্রিক সংস্কারের অচলতাই নয়, হারিয়ে ফেলা শৌর্যবীর্যেরও দ্যোতক' (কামাল, ২০১৪ : ৩৭)। পুরোনো ঢাকার নগরসভ্যতার পট-পরিবর্তনের আরেকটি উজ্জ্বল কবিতা 'কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি' :

> গলির মোড়ে হুমড়ি-খাওয়া ঘোড়াটাকে দেখে তোমার বুক
> কেঁপে উঠেছিল। তুমি দেখলে, ঘোড়ার পায়ে একটা ক্ষত
> ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো বালবের মতো আর সেই মুহূর্তে
> ঘোড়ার চোখে অন্য কিছু নয়, শুধু গোধূলি, শুধু অস্তরাগ।
>
> ('কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

উদাহরণটিতে ব্যবহৃত 'হুমড়ি-খাওয়া ঘোড়াটা', 'ঘোড়ার পায়ে ক্ষত' এবং ঘোড়ার চোখের 'গোধূলি' ও 'অস্তরাগে'র যৌগপত্য কবির কিশোর কালের ঘোড়ার রমরমা ঐতিহ্যের পতনের আলেখ্য রচনা করেছে। 'গলির মোড়ে মুমূর্ষু ঘোড়ার শোকে বিহ্বল কিশোর' কবিরই কিশোরকালের প্রতিকৃতি, তার চোখ দিয়ে তিনি দেখেছেন প্রবহমান কালের গতি। যে কাল বয়ে যায় তাকে আর ফেরানো যায় না, তাই শত আহ্বানেও নিরুত্তর কবির কিশোর-প্রতিকৃতি। পুরোনো ঢাকার স্মৃতি-আক্রান্ত শামসুর রাহমানের চেতনায় কোনো সুস্থ ঘোড়ার প্রতিমূর্তি নেই, আছে মুমূর্ষু এবং বেতো ঘোড়া। জীবনের শেষ প্রান্তে পুরোনো ঢাকা ছেড়ে নতুন ঢাকায় আবাস গড়ে তোলা কবির স্বপ্নে হানা দেয় 'জীর্ণ আস্তাবল' এবং 'বেতো ঘোড়া'—'তুমি কোনো কোনো ভোরে/ স্বপ্নে জীর্ণ আস্তাবল, বেতো ঘোড়াদের ঘ্রাণ নিয়ে/ জেগে ওঠো বিছানায়' ('শহুরে সংলাপ', *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)। পুরোনো ঢাকায় তাঁর শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের বহুদিন কেটেছে, পুরোনো ঢাকার শরীর ঘেষে থাকা বুড়িগঙ্গা নদীর রূপ বদলে গেছে দূষণে-দখলে, বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী ঢাকার নগরসভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে অন্যান্য অঞ্চলে, কালের বদল কবির চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি, তিনি দেখেছেন : 'পুরোনো এ শহর কীভাবে/ ঈষৎ বদলে যাচ্ছে নতুন যুগের আলিঙ্গনে।' পরিবর্তনকে অনিবার্য মেনেই তিনি স্বীকার করেছেন 'এই অতি-পুরাতন/ মাটিতেই রোদে জ্বলে, জলে ভিজে আমার শিকড়।' একসময় কবি সরে এসেছিলেন পিতৃনিবাস পুরোনো ঢাকার মাহুতটুলি থেকে শ্যামলীতে, পুরোনো ঢাকার একাধিক এলাকায় বসবাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে কবির, তাই কেবলি পিছুটান, পুরোনো ঢাকার যা কিছু আপাত পুরোনো তার সবই উজ্জ্বল দিনকালের স্মৃতিমথিত। ঢাকার পুরোনো সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি মাহুতটুলির প্রাচীন বাড়িতে বেশ ভালো ছিলেন, তখনকার নাগরিক জীবনাবহও স্মৃতিচারণার সূত্রে উঠে এসেছে

কবিতায়। সমর সেন যেমন কলকাতার নাগরিক জনজীবন ও তাদের জটলার রূপটি দেখে নিয়েছিলেন প্রাত্যহিক অভ্যস্ততায়, শামসুর রাহমানও পুরোনো ঢাকার জনজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বাদ নিয়েছেন 'কুট্টি' জীবনের, যে জীবনের সাথে মিশে ছিল 'কলতলার জটলা', 'মাতালের চিৎকার', 'ফিল্মি গানের ভেসে আসা কলি', 'তেহারির ঘ্রাণ' ('এমন *ঠেলতে ঠেলতে*', *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার*)।

সুদিনের জন্য অপেক্ষারত শামসুর রাহমানের কবিতায় ঘোড়া কখনো কখনো দুঃসময়ের প্রতীক হিসেবে এসেছে। ঘোড়া শহর ও গ্রামে গজিয়ে ওঠা দস্যু সময়ের প্রতিমূর্তিতে চিত্রিত হয়েছে, তার অশ্বশক্তির জোরে দুঃসময়কে সওয়ারি করে ছুটে বেড়ায় দেশের কেন্দ্র থেকে প্রান্ত :

> দুঃসময় ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে ছোটে ইতস্তত,
> তার চাবুকের ঘায়ে আর্তনাদ করে এ শহর
> বাংলার রূপসী নদী, গ্রাম, শস্যক্ষেতসমুদয়;
> মেঘের কিনার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে অবিরল বিষাদের জল
> এবং সন্তানহারা জননীর মতো শোকস্তব্ধ মুখে আজও
> বসে আছে রাত্রিদিন আমার এ দেশ।
>
> ('অলৌকিক আলোর ভ্রমর', *হরিণের হাড়*)

অথবা,

> ভাবিনি এমন ভয়ঙ্কর অন্ধকার তীক্ষ্ণ দাঁত
> বের করে দেশকে করবে গ্রাস। ঢ্যাঙা, ক্ষিপ্ত ঘোড়া
> চারপায়ে করে তছনছ দেখি দেশজোড়া
> চলে কুশাসন লম্বকর্ণদের, ভীষণ সংঘাত পথে পথে
>
> ('ভাবিনি এমন', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সওয়া'রের থেকে এই সওয়ারি আলাদা, ঘোড়ার পিঠে আসীন এই দুঃসময় শহর থেকে গ্রামব্যাপী কালো ছায়া ফেলে, তার দুঃশাসনে বাড়ে লঘুমতি বামনের দল, আর এই দুঃসময়ের দাপটে গণতন্ত্রের পথে রক্ত ঢেলে দেয়া নূর হোসেনের মৃত্যু বৃথা হয়ে যায়, মুক্তিযুদ্ধ বন্দি হয় 'শকুনের চঞ্চুতে'। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেন : 'সম্ভবত সুসময় দেখা আর হ'লো না আমার' ('অলৌকিক আলোর ভ্রমর', *হরিণের হাড়*)। এই কালো সময়ের প্রতীক হিসেবে তাঁর কবিতায় এসেছে পিকাসোর চিত্র প্রসঙ্গ—'পিকাসোর গার্নিকা ম্যুরাল মনে পড়ে/ ক্রুদ্ধ সেই ঘোড়াটার আর্তনাদ

যেন/ আমাদের কাল' ('বামনের দেশে', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)। ১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল স্পেনের গুয়ের্নিকাতে (Guernica) জার্মান নাৎসি বাহিনির হামলার পর পাবলো পিকাসো 'গুয়ের্নিকা' শিরোনামে যে দেয়ালচিত্রটি আঁকেন সেটি ছিল যুদ্ধ এবং অনাচারক্লিষ্ট সময়ের প্রতিচিত্র, সেখানে বিপন্ন মানবতার ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে। মৃত শিশু কোলে মা, মৃত সৈনিক এবং অন্যান্য প্রাণীর পাশাপাশি চিত্রটির কেন্দ্রে ছিল আর্তনাদরত এক ঘোড়ার অংশবিশেষ। সেই নষ্ট এবং দুঃসময়ের ঘোড়ার প্রতীকে ফিরে এসেছে শামসুর রাহমানের সমসাময়িক কাল। পিকাসোর 'গুয়ের্নিকা' ভয়াল এক সময়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে, শামসুর রাহমানের স্বদেশ ও সমকাল যেন সেই ঘোড়ার আর্তনাদে ভেঙে পড়ছে, মানবতা এবং শ্রেয়োবোধ যখন লুপ্ত, চারিদিকে কেবল সহিংসতা এবং পাশবিকতা সেরকম মুহূর্তে ধ্বংসের প্রতীক হয়ে ঘোড়া আসে কবিতায়। এছাড়া ঘোড়া তাঁর কবিতায় এসেছে শিল্পের মগ্নচৈতন্যরূপে—'যখন সে লেখে', (*প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*), 'ভালোবাসা তুমি', (*নিরালোকে দিব্যরথ*), 'কে আসে এমন ধু ধু অবেলায়', (*প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*) কবিতাসমূহ এর উজ্জ্বল উদাহরণ। এছাড়া *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখের* 'স্বপ্নের খোয়ারি', *ইকারুসের আকাশের* 'আরাগঁ তোমার কাছে', *বিধ্বস্ত নীলিমার* 'ঘৃণায় নয়' কবিতাসমূহে দেশ-কাল, বাস্তবতা এবং ঢাকা শহরের অনুষঙ্গে ঘোড়া প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর কবিতার এইসব ঘোড়া একদিকে ঢাকার প্রতিইতিহাসের উপাদান, অন্যদিকে ব্যক্তিস্মৃতি-মথিত নগর ঢাকার নস্টালজিক ইতিবৃত্ত।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদকে কেন্দ্র করে, পুঁজিবাদের প্রভাবে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, অবক্ষয়িত মানস এবং যৌনচেতনা মিশে গিয়েছিল নগরচৈতন্যের সঙ্গে। সমর সেন যেমন কলকাতার কলতলায় গণিকাদের হট্টগোল দেখেছিলেন, দেখেছিলেন কলকাতার বেকার যুবকেরা প্রাণপনে দেখে 'ফিরিঙ্গি নারীর নরম উদ্ধত বুক'; জীবনানন্দও নগরচৈতন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন যৌনতা, বিকার ও অবক্ষয়কে। শামসুর রাহমানের কবিতাতেও বেকার যুবকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেহেতু পাখির 'ঠোকরে' ঝরে গেছে 'পোকা-খাওয়া মূল্যবোধ', তাই নগরচৈতন্যে সঞ্চিত অন্যান্য অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শামসুর রাহমান এ খবরও দিয়ে রাখেন যে, 'উল্কি-পরা সরু গলি চমকায় নগ্ন ইশারায়,/ বেকার যুবক দৃষ্টি দেয় সিনেমার প্ল্যাকার্ডের/ রঙচঙে ঠোঁটে, মুখে বুকে আর মদির উরুতে' ('ছুঁচোর কেত্তন', *রৌদ্র করোটিতে*)। বৃটিশ উপনিবেশে কর্মহীন বেকারের যে দুর্দশা ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানহীনতা একইভাবে তাদের সুস্থ গার্হস্থ্য জীবনের পরিবর্তে যৌনবিকারের ঘনান্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল। সে-সময়ের পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, কেন শামসুর

রাহমানের বেকার যুবক সিনেমার রঙচঙে পোস্টারে রাখে লালসার চোখ। এই বেকারত্ব দেখানোটা কেবল বোদলেয়ার, এলিয়ট অথবা তিরিশি কবিতা-তাড়িত পরম্পরা নয়, তার একটা বাস্তব ভিত্তিও ছিল, সেটি তাঁর নিজস্ব নগরবীক্ষণের অভিজ্ঞতাজাত।

নতুন এবং পুরোনো ঢাকার মিশ্রণে সৃষ্ট শামসুর রাহমানের নাগরিক চৈতন্য, নগরের নানা সংকটে বিপর্যস্ত বোধ করলেও ঢাকা ছিল তাঁর প্রিয় শহর। এজন্য অরণ্যকে ভালোবেসেও তিনি থেকে গেছেন ঢাকার নাগরিক কোলাহলে। ইচ্ছে হলে অরণ্যে যেতে পারতেন, যাননি, কারণ 'অর্ধেক মানব' আর 'অর্ধেক যন্ত্র' হয়ে থাকা নগরজীবন আবার এক অর্থে মাদকতাময়, অরণ্যে যাবার ইচ্ছেকে তাই প্রত্যাখান করেন, প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকায় থাকার তাৎপর্য :

> কিন্তু আমি যাইনে সেখানে, থাকি শহরে, আমার শহরে।
> উর্ধ্বশ্বাস ট্রাফিকের ব্যস্ততায় বিজ্ঞাপনের মতো
> ঝলমলিয়ে ওঠা হাসি
> শিরায় আনে আশ্চর্য শিহরণ:
> মনে হয় যেন ঢক করে গিলে ফেলেছি
> এক ঢোক ঝাঁঝালো মদ। আর প্রহরে প্রহরে
> অজস্র ধাতব শব্দ বাজে আমার রক্তে
> যেন ভ্রমরের গুঞ্জন।
>
> ('যদি ইচ্ছে হয়', *রৌদ্র করোটিতে*)

ধাতব শব্দগুলো যেমন শ্রবণে 'ভ্রমরের গুঞ্জন' তোলে তেমনি প্রাণহীন ধাতব আকারগুলোও চোখে ধরা পড়ে অন্যরকম মাধুর্যে, হয়ে ওঠে নগর-সৌন্দর্যের অঙ্গ—'...রাত্রির ফুটপাতের ধারে এসে জমে/ সারি সারি উজ্জ্বল মসৃণ মোটর,/ যেমন গাঢ়-সবুজ ডালে ভিড় করে/ পাখির ঝাঁক সহজ অভ্যাসে।' এক সাক্ষাৎকারে বিদেশিনী ক্যারোলিন যখন বলেছিলেন, 'ঢাকায় খুব বেশি যানজট। সশব্দ নগরী।' তখন শামসুর রাহমানের প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম—'আমি এই ঢাকাতেই বেড়ে উঠেছি। তবে প্রকৃতিও ভালবাসি' (শাহরিয়ার, ২০০১ : ৯৬)। 'তবে প্রকৃতিও ভালবাসি' বলে ঢাকাকে হৃদয়ে রেখে তাঁর ইঙ্গিতকে প্রসারিত করেছেন নিসর্গনিবিড় বাংলাদেশের বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলের দিকে। জন্মগতভাবে নাগরিক জীবনযাপনের অভ্যস্ততা তাঁর ভেতরে সঞ্চিত করেছে নগরচেতনা। শামসুর রাহমানের কবিতার বাইরের অবয়বে শহরের একটা সাধারণ রূপের গ্রাফ সহজেই ধরা পড়ে। যদিও বিশ্বের অধিকাংশ শহরের চারিত্র্য প্রায় একইরকম, কবিতায় কোলাহলময় শহরের উৎপ্রেক্ষা তিনি

তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন ঢাকার প্রত্যক্ষ নাগরিক অভিজ্ঞতা থেকে। জন্ম ও বেড়ে ওঠার শহর ঢাকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আন্তরিক বলেই 'হে শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার' (*ইকারুসের আকাশ*) কবিতায় নানাভাবে সম্ভাষণ করেছেন প্রিয় শহর ঢাকাকে : 'হে শহর, হে প্রিয় শহর', 'হে মোহিনী আমার', 'হে শহর, হে আমার আপন শহর', 'হে বিশ্বাসঘাতিনী', 'হে শহর, হে আমার আদরিণী বেড়াল'—এসব সম্ভাষণের পৌনঃপুনিকতায় ঢাকার প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান, আবেগের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। শপথ করে ঢাকাকে আবার বলেছেন : 'তোমার সৌন্দর্যের শপথ, আমার আগে অন্য কেউই/ এমন মজেনি তোমার সৌন্দর্যে।' তবে প্রিয় এ শহর সবসময় ইতিবাচক রূপ নিয়ে তাঁর কবিতায় হাজির হতে পারেনি, ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতার সমন্বয়ে ঢাকা প্রাণের শহর। এই শহর থেকে নির্বাসনের সম্ভাবনা কবিকে অস্থির করে তোলে, যে কোনো পরিস্থিতিতে তাঁর জন্মশহরেই চিরকাল থাকতে চান বলে কবিতায় বারবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, যেমন তিনি যে কোনো পরিস্থিতিতে দেশত্যাগ করবেন না বলেও প্রতিশ্রুত ছিলেন। কত সংকট, কত ক্রান্তিকালকে অনতিক্রমের বেদনা নিয়ে চলে গেছেন কাছের অনেকে, যারা কবির মতই প্রতিশ্রুত ছিলেন দেশত্যাগী হবেন না বলে। ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের মুখেও তিনি রয়ে গেলেন কণ্ঠে রক্ত তুলে কোকিলের মতো সুদিনের প্রত্যাশাময় সুর ধ্যান করতে করতে। স্বদেশের দুর্দিনের ভয়াবহ চিত্রমালা খোদিত হয়ে আছে তাঁর কবিতার অক্ষরে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাসে : 'প্রলয়ে হইনি পলাতক,/ নিজস্ব ভূভাগে একরোখা/ এখনও দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার' ('এক ধরনের অহংকার', *এক ধরনের অহংকার*)। শামসুর রাহমানের *এক ধরনের অহংকার* প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের শুরুতে, তখন নতুন দেশ দুর্ভিক্ষের করাল থাবা থেকে বেরিয়ে এসেছে কেবল, তখনও বুকের মধ্যে রয়ে গেছে নতুন দেশ গড়ার জেদী প্রত্যয়। 'নিজস্ব ভূভাগ' বলে যাকে চিহ্নিত করছেন সেটি কবির চেতনভূমি আবার তাঁর স্বদেশের প্রতিকল্প। দেশ-কালের বিচিত্র গতি-প্রকৃতির কারণে কবি নিজ দেশেই বহুবার পেয়েছেন নির্বাসনের স্বাদ, কিন্তু তিনি নিজে কখনো দেশত্যাগের জন্য উদ্যোগী হননি, যদিও চারপাশে দেখেছেন নানা কারণে মানুষেরা হচ্ছে বিদেশমুখী : 'ইদানীং সুটকেস' (*আমি অনাহারী*), 'অন্ধকারের কেল্লা হবে বিলীন' (*গোরস্তানে কোকিলের করুণ আহ্বান*), 'নিজের শহর ছেড়ে' (*তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*), 'কারো একলার নয়' (*মঞ্চের মাঝখানে*), 'ঘরে ফেরানো গানের জন্যে' (*ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*), 'স্বদেশে ফেরার পর' (*মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*), 'তবুও বাঁচতে চাই' (*ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*) কবিতাসমূহে প্রবাসের বেদনা, স্বদেশে ফেরার আর্তি এবং স্বদেশেই চিরকাল থেকে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। শামসুর রাহমানের কখনো সুটকেস গোছানো হয়নি, কারণ তিনি এদেশের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ, তাঁর অন্তিম ইচ্ছে

: 'এই আমি এখানে/ স্বদেশের সোঁদা মাটি আর/ ঘাসের সুঘ্রাণ নিয়ে থাকি যেন আমরণ প্রিয় স্বদেশেই' ('এই ডামাডোল, এই হট্টগোল', *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে*)।

এই দেশকে এবং দেশের প্রাণকেন্দ্র শহর ঢাকাকে তিনি স্বদেশভাবনার কেন্দ্রে রেখেছিলেন। চূড়ান্ত নিগ্রহের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি ঢাকার নগরজীবনের স্বাদ নিতে চেয়েছেন, নতুন কোন শহরের স্বপ্ন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। নিউইয়র্কের উডসাইডে সাময়িকের জন্য বসবাসরত কবির কাছে স্বদেশের স্মৃতি ধরা পড়েছিল ক্ষণে ক্ষণে *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই* কাব্যের 'আমাকে বাঁচায়' কবিতায়। পুরোনো এবং নতুন ঢাকার নানা অঞ্চলের স্মৃতি-নির্যাসে ভরা তাঁর কবিসত্তা, প্রবাস থেকে দেশে ফিরে আসার অথবা দেশে থেকে যাবার এই দুর্নিবার আকর্ষণের নেপথ্যে আছে প্রকৃতির নস্টালজিক হাতছানি, জন্মভূমির সঙ্গে নাড়ির বন্ধনে জড়িয়ে থাকার ধ্রুবতা :

> হন্তারকের বিকট উল্লাস ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত এখানে
> সেখানে; স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাওয়া উচিত ছিল, অথচ
> যেতে পারি না এই চেনা প্রকৃতির কোমল রূপ, মাটির
> মাতৃসুলভ মমতা ছেড়ে।
> ('মহাকাশে ধ্বনিত বাংলার জয়গান', *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুকছে*)

যে দেশের সঙ্গে তিনি নাড়ির টানে বাঁধা সেই স্বাধীন স্বদেশে কবির অস্তিত্ব নানা সময়ে বিপন্ন হয়েছে, চারপাশের জিঘাংসামুখর সময় এবং হন্তারকের হুঙ্কারের বিরুদ্ধে কবির একমাত্র অস্ত্র তাঁর কবিতা, কিন্তু কবিতা কতদূর নিরাময় করতে পারে কালের সংকটকে? তাই কবির আক্ষেপ : 'এখন যাবে কি রোখা তাকে, হায় কাব্যের কৃপাণে?' *('রুক্ষ বুভুক্ষায়', আমি অনাহারী)* দুঃসময়ে তাঁর কবিতা মনন-চিন্তনের বুনন-গভীরতা ছেড়ে ধরেছে সমকালের সরল পথ, কবিতার শব্দে শব্দে ছড়িয়ে পড়েছে 'জান্তব নিশ্বাস'। পারিপার্শ্বের রুক্ষ বুভূক্ষা থেকে কবিতাকে সযতনে রক্ষা করতে গিয়ে কবি বলেন : 'মাঝে মাঝে ভালোবেসে/ সুস্নিগ্ধ গোলাপজল দিই কবিতার চোখে, তবু তার চোখে/ রক্তজবা লেগে থাকে সারাক্ষণ' ('রুক্ষ বুভুক্ষায়', *আমি অনাহারী*)। মূলত কবিতার চোখ—কবিরই দৃষ্টি, সে দৃষ্টি বিনষ্টি দেখতে দেখতে পরাক্রান্ত। তবুও এই কবিতার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, কবিতা 'আকৈশোর সহচরী' *('হে আমার স্বপ্নের প্যাগোডা', নায়কের ছায়া)*, কবিতার কাছে তিনি অলৌকিক ক্ষমতা-প্রার্থী, দেশের সব সংকট ও সময়ের সব ক্ষত সারিয়ে তুলতে কবিতার কাছেই তিনি নতজানু।

সময়ের বিবর্তনে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ঢাকার কোমল সুশ্রিতার অনেকটাই ছেঁটে দিয়েছিল। এ নিয়ে কবিতায় অনেক আক্ষেপ করেছেন কবি। কৈশোরে তিনি পরিবারের সঙ্গে ইস্কাটনে ছিলেন কিছুদিন। সেই বাড়িতে থাকার সময় বাংলা মোটর এলাকা রীতিমতো ঘন জঙ্গলঘেরা ছিল। এমনকি কবি সেখানে ছিপ ফেলে মাছ ধরার কথাও উল্লেখ করেছেন আত্মজীবনীতে। ঢাকার সেই স্মৃতিময় অংশগুলো তাঁর চোখের সামনে রাতারাতি বদলে যায়, উধাও হয় বন-জঙ্গল, পুকুর-খাল, ভরাট করা নতুন মাটিতে আকাশচুম্বী অট্টালিকারা বসত শুরু করে। কালের এই পরিবর্তন, জনজীবন ও শহরের চারিত্র্য পাল্টে যাবার চালচিত্র একজন কবির চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না, শামসুর রাহমান শহরের এই বদলে যাওয়ার চিত্র ধারণ করেছেন কবিতায় দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে : 'আপাতত মারাত্মকভাবে/ ছেঁটে-ফেলা নিসর্গের কাছাকাছি/ ষড়জে নিখাদে বাঁচি' ('আমার দুঃখের ভারে', *ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*)। এছাড়া 'দালান', (*হোমারের স্বপ্নময় হাত*), 'এ কেমন কৃষ্ণপক্ষ' (*ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে*), 'হায় এ কেমন জায়গায়' (ঐ) কবিতাসমূহে পরিচিত, পুরোনো ঢাকাকে ক্রমশ মেট্রোপলিটানসুলভ চারিত্র্য নিতে দেখেছেন চোখের সামনে, নিরিবিলি শহর পুঁজির দাপটে রাতারাতি বদলে গেছে, গড়ে উঠেছে আকাশমুখী স্থাপনা, কাটা পড়েছে বৃক্ষের দল, শপিং মল আর মোটরকারের ভীড়ে নষ্ট হয়েছে নীরবতার সৌন্দর্য :[১৭]

ক্রুদ্ধ এরোস্পেস খাবে গিলে
সভ্যতার হাড়গোড়, অনন্তর হিসেব নিকেশ যাবে চুকে।
চূর্ণ এরোড্রোম আর হাইরাইজ বিল্ডিং-এর
স্তূপ থেকে না-মানুষ, না-জন্তু বেরিয়ে ইতস্তত
চরে বুঝি হারানো স্মৃতির মোহে শারদ জ্যোস্নায়।
('একজন কবি দেখছেন', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

অথবা,

ইট, পাথর, লোহা, সিমেন্ট, সিমেন্ট, লোহা
পাথর, ইট ডানে বামে
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সব দিকে
চেপে বসেছে।
(কোন্ কালবেলায়, *গন্তব্য নাই বা থাকুক*)

নগর ও নিসর্গের সম্পর্ক আদি থেকেই সংঘাতপূর্ণ। মধ্যযুগে কালকেতু দেবীর আদেশক্রমে বন-জঙ্গল, পাহাড় কেটে নগর পত্তন করেছিল, বাংলা সাহিত্যে নিসর্গ-বিনাশের প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় এখানেই, গুজরাট নগর নির্মাণের প্রয়োজনে হনুমান নখ দিয়ে খান খান করেছিলেন 'শিলাতরু পর্ব্বত সঞ্চয়'। মানব-সভ্যতার ক্রম-উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিসর্গ-সংকোচনের নিষ্করুণ ইতিহাস। নগর হিসেবে ঢাকার যাত্রা শুরু বহুপূর্ব থেকে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর পূর্ব-বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিকশিত হতে থাকে তার নাগরিক স্বভাব, পুঁজিবাদ ও যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসী আধিপত্যে ক্রমাগত ঢাকা এগোতে থাকে মহানগর হয়ে ওঠার সম্ভাবনার দিকে। ঢাকার নগর-অবকাঠামো তৈরি এবং ব্যবহারিক জীবনের চাহিদাসমূহের উপকরণ যোগাতে ক্রমাগত শূন্য হয়েছে বৃক্ষশোভা, খোলা প্রান্তর, আর প্রতিদিন একটু একটু করে সংকুচিত হয়ে এসেছে তার উদার আকাশ।

**নিসর্গ ও গ্রামীণ জীবনানুষঙ্গ**

নাগরিক সভ্যতার চাপে স্পৃষ্ট হয়ে প্রকৃতি যখন বিপন্ন, তখন শিকড়সন্ধানী কবি শামসুর রাহমান পিতৃ-গ্রাম পাড়াতলীর জন্য স্মরণ-বেদনায় কাতর হয়ে উঠেছেন, তাঁর অতীত-আর্ত মন আশ্রয় খুঁজেছে গ্রামীণ প্রকৃতির নিবিড়তায়। জন্মসূত্রে তিনি ঢাকার সঙ্গে নাড়ির টানে যুক্ত ছিলেন, শিকড়ের টানে তিনি বাঁধা পড়েছিলেন পাড়াতলী গ্রামের সঙ্গে। এ কারণে শামসুর রাহমান যখন নিজের ভেতর ও বাইরের দুটো সত্তাকে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করেন, সেখানে শহর ও গ্রাম নিবিড় প্রীতিতে সহাবস্থানে থাকে। দোষে-গুণে ঢাকা তাঁর 'প্রাণের শহর', পাড়াতলী গ্রামও তাঁর প্রিয় গ্রাম, তাঁর কবিতায় শহর ও গ্রামের অনুষঙ্গগুলো সহজ ও সুপরিচিত। এই দেশ, এ দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, দেশের মানুষ ও জনজীবন, তাদের লড়াই ও টিকে থাকার ধরন বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক কবিতাতে তিনি গ্রাম ও শহরের সমন্বিত চেতনাকে রূপদান করেছেন, এ কারণে তাঁর কবিতায় একসুতোয় গাথা হয় 'সুদূর গাঁয়ের কুয়োতলা আর শহরের কোনো পার্কের মৃদু ঘাস' ('মনে মনে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। তবে গাঁয়ের কুয়োতলা আর পার্কের ঘাসকে মেলালেও এগুলো তাঁর জীবনের খণ্ডিত অভিজ্ঞতা, গ্রামীণ জনজীবন, আর্থ-সমাজ ও তাদের অস্তিত্বের গাথা হয়ে ওঠেনি তাঁর কবিতা, তাঁর কবিতায় গ্রাম ও শহরের সমন্বয় মূলত নৈসর্গিক বীক্ষণের ফলাফল, জীবনকে খুঁড়ে দেখার প্রবণতা নয়, কারণ শামসুর রাহমানের নাগরিক অভিজ্ঞতায় সে গ্রাম জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপের ছবি ধারণ করা সম্ভব ছিল না। প্রতিদিনের জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা কবির সঙ্গে এদেশের নৈসর্গিক পরিবেশের সম্পর্ক

ছিল গভীর, অনেক কবিতাতে রয়েছে কবির সঙ্গে প্রকৃতির সরাসরি কথোপকথন, নিসর্গ তাঁর কবিতায় অনেক সময় জৈবসত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত, প্রকৃতিরও রয়েছে বিপুল ব্যক্তিত্ব, বিশাল অস্তিত্ব।

শামসুর রাহমান স্বদেশের নৈসর্গিক শোভায় বিমুগ্ধ কবি। তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের জন্ম কেবল কবিতার প্রয়োজনে নয়, কবিত্বশক্তি বিকাশের পূর্বে, শৈশবকালে তাঁর ভেতরে জন্ম নিয়েছিল প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দরদ, বিশেষ করে বৃক্ষপ্রেম।[১৮] মাহুৎটুলিতে কবির বাবা যখন দোতলা বাড়ি নির্মাণ করছিলেন সে-সময় কাটা পড়ে বেশ কিছু গাছ, এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গেছিল গাছগুলোর উপর। বিশেষ করে খেজুর গাছকে ঘিরে লতিয়ে উঠত আমার বালক মনের নানা খেয়াল।..খেজুরের রসের প্রতি তেমন লোভ ছিল না, তবে গাছের রুক্ষ শরীর এবং পাতাগুলো আমাকে আকর্ষণ করত। গাছের পাতায় যখন ঝিলমিল করত কিংবা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ত জ্যোস্না তখন আনন্দ আমাকে দুলিয়ে দিত ঢেউয়ে ঢেউয়ে' (রাহমান, ২০০৪ : ১১)। ১৯৪০ সালে কবির পরিবার 'পল্লীপ্রতিম' মাহুৎটুলি ছেড়ে ইস্কাটনে থাকতে শুরু করেন, ইস্কাটন তখন নগর-যান্ত্রিকতায় আক্রান্ত ছিল না, ফলে প্রকৃতির বেশ নিবিড় সান্নিধ্য এখানে তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়েছে : 'মন আমার দিনরাত্রি, বলা যেতে পারে, প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় ছিল ভরপুর। বাড়ির চৌহদ্দিতেই ঘুরে বেড়ানোর মতো যথেষ্ট জায়গা। কত সময় কাটিয়ে দিয়েছি লিচু গাছের ডালে বসে, নেবুতলায় শুয়ে রসালো নেবু পেড়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছের দিকে আস্তে সুস্থে হেঁটে যেতে যেতে কখনও কখনও প্রজাপতিদের উড়াউড়ি দেখে মুগ্ধ হয়েছি' (রাহমান, ২০০৪ : ২৮)। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রকৃতিপ্রেম, নিসর্গনিবিড়তা ক্রমশ বেড়েছে, তাঁর প্রসারিত দু'চোখে স্বদেশের অবারিত রূপ নেমে এসেছে অসংকোচে। শামসুর রাহমানের নিসর্গ-সচেতন দৃষ্টিকোণ তৈরিতে পাড়াতলী গ্রামের বিশেষ ভূমিকা ছিল—শৈশব থেকে বাবার সঙ্গে গ্রামে যাতায়াতের সূত্রে তিনি দেখেছেন মেঘনার উত্তাল রূপ, চারপাশের ঘন সবুজ গ্রামীণ প্রকৃতি, পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতা-সূত্রে নস্টালজিক হয়ে কবি বলেছেন :

> বনতুলসীর গন্ধ, হঠাৎ হাঁসের চই চই শব্দ আর
> ধানের সবুজ ক্ষেতে ধ্যানী সাদা বক, দোয়েলের শিস, ফিঙে
> পাখিটির নাচ, কুটিরের ধোঁয়া, আর মফস্বলী স্টেশনের রাত,
> চিলেকোঠা আমাকে ফিরিয়ে দেয় আমার শৈশব।
>
> ('যৌবনোত্তর বিলাপ', *উজার বাগানে*)

পরিণত বয়সে যোগাযোগহীনতায় পাড়াতলীর সঙ্গে নৈকট্য যত কমেছে, তত বেশি নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।[১৯] শামসুর রাহমানের কবিতার উন্মেষ ও ক্রমপরিণতির যাত্রাপথে নিসর্গ কেবল সৌন্দর্যানুভূতির দ্যোতক হিসেবে আসেনি, কবিতার বিষয় ও নির্মাণকলা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে তাঁর নিসর্গকে উপস্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গি। কাব্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ের নিসর্গের মায়ালোক, রোমান্টিক উন্মুলতা-বিজড়িত নৈসর্গিক বয়ান থেকে বেরিয়ে গ্রন্থি জুড়েছেন কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে, যেখানে নিসর্গ কখনো পটভূমি, কখনো ঘটনার প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ, কখনো পারিপার্শ্বিকতার প্রতীকায়ন। শামসুর রাহমানের কবিতায় নিসর্গ থেকে আহরিত কিছু শব্দের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, যে শব্দগুলোকে প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করাই যথার্থ, এইসব অনুষঙ্গ যেমন প্রকৃতির উপাচার তেমনি তাঁর দেশভাবনার প্রতীকী উপস্থাপনার প্রধান উপকরণও বটে। প্রকৃতি তাঁর কবিতায় শুধু কাব্যসৌন্দর্যের সামান্য উপকরণ নয়, নৈসর্গিক-বোধের অন্তরালে যুক্ত হয়েছে এ দেশের জনজীবন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি। শামসুর রাহমানের কবিতায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নৈসর্গিক অনুষঙ্গ হচ্ছে চাঁদ, এক চাঁদকে তিনি বহু কবিতায় বহুরূপে দেখেছেন, চাঁদের রূপকল্পে কবিতায় উঠে এসেছে দেশ-কাল-জনজীবনের নানা প্রসঙ্গ।

### চাঁদ

পশ্চিমবঙ্গের কবি অশোক বিজয় রাহা লিখেছিলেন, 'আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে'—একবার কলকাতায় গিয়ে সেই চাঁদের কবির স্মৃতিময় সান্নিধ্য লাভ করেন শামসুর রাহমান,[২০] সুকান্তর চাঁদ সংক্রান্ত একটি পঙ্‌ক্তি কবিতার সীমা পেরিয়ে প্রবাদের খাতায় নাম লিখিয়েছিল—'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি', চাঁদ নিয়ে এমন কোনো প্রবাদপ্রতিম কবিতা শামসুর রাহমান লেখেননি, তবে তাঁর কবিতার সঙ্গে শর্তহীন সদ্ভাবে জড়িয়ে পড়লে দেখা যায়, তিনিও 'চাঁদে'র কারিগর। কবিতার বিষয় নির্বাচন, নির্মাণকলা ও বৈচিত্র্যগামী হওয়া প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শহীদ কাদরী বলেছিলেন : 'ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি 'চাঁদমুখ'। মহিলাদের মুখের সৌন্দর্যের সঙ্গে চাঁদের তুলনা করে বলা হয় 'চাঁদমুখ'। তারপর আমরা দীনেশ দাসকে পেলাম। তিনি লিখলেন, 'চাঁদের এই বাঁকা ফালিটি তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে/ এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে'। এর কিছুদিন পর পেলাম আমরা সুকান্তকে 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। প্রায় ওই ধরনেই আমরা পেয়েছি আল মাহমুদের কবিতায় 'হলুদ পিঠার মতো চাঁদ'। আর বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' কবিতায় চাঁদের অসংখ্য উপমা আছে।... এরপরে কবিদের যদি চাঁদ ব্যবহার করতে হয় তাঁকে নতুন কিছু করতে হবে' (দত্ত, ২০১৩ : ৩৯)। এরকম কোন অভিজ্ঞান থেকে হয়তো শামসুর

রাহমান তাঁর চাঁদ বিষয়ক কবিতা নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাছাড়া অশোক বিজয় রাহাকে যে চাঁদের অভিনব কুশলীরূপে স্মরণে রেখেছিলেন, সে বিষয়টিও হয়তো তাঁকে চাঁদের নতুনতর রূপ নির্মাণে আগ্রহী করেছিল। আকাশে চাঁদের উপস্থিতি থাকা না থাকার সঙ্গে প্রকৃতির আবর্তনের সত্য তো রয়েছে, সেইসঙ্গে শামসুর রাহমান যোগ করেছেন প্রতীকী তাৎপর্য, এই প্রতীকী তাৎপর্যের সঙ্গে দেশকালের স্বভাব-গতি সম্পৃক্ত। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' বলে জীবনানন্দ দাশ যেমন সময়ের পরম্পরা ভেঙে আপেক্ষিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, অথবা 'নক্ষত্রেরও মরে যেতে হয়' বলে যেমন বিজ্ঞানমনস্কতাকে তিনি রেখেছিলেন কবিতা-কোঠরে, শামসুর রাহমান এককালের জীবনানন্দ-মথিত কবি হলেও এখানে তাঁদের পথ ভিন্ন। চাঁদকে তিনি মহাজাগতিকতায় স্থাপন করে বিজ্ঞান বা দর্শনের দ্বারস্থ হননি, বরং তাঁর পরিপার্শ্বের বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে চাঁদের যথার্থ উপমা সৃষ্টি করেন জাগতিক উপকরণ দিয়ে। তিনি সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের উপমায় বিন্যস্ত করেছেন চাঁদের নৈসর্গিক রূপশোভা, এক চমৎকার চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে কবির নিসর্গ-নিবিড় প্রত্যক্ষণে মূর্ত হয়ে ওঠে চাঁদ, যখন তিনি বলেন :

দিগন্তের চিবুকের নিচে চাঁদ ডোবে
অন্ধকারে-মনে হলো, জহুরীর নিপুণ আঙুল
কালো মখমল-বাক্সে বন্ধ করে রাখে মুক্তোটিকে
('আমি হই বর্তমান', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

শামসুর রাহমান তাঁর সত্তার দ্বৈততাকে চিহ্নিত করতে চাঁদ প্রসঙ্গ টেনে আনেন, জন্ম ও বেড়ে ওঠা এবং কবিতাচর্চার সূত্রে নাগরিক কবি হিসেবে খেতাব পেলেও চেতনাগতভাবে গ্রাম ও শহরের উত্তরাধিকার তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন, স্বীকার করেন এক ঘুমভাঙ্গা শেষরাতে চাঁদকে সক্রিয় ভূমিকায় রেখে :

শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি চাঁদ
হাসছে কৌতুকে এই শহুরে লোককে দেখে, যার
সমস্ত শরীর ফুঁড়ে কী সহজে বেরুচ্ছে গ্রামীণ রূপ।
আমার অন্তর জুড়ে শহুরে-গ্রামীণ সুরধারা
('আমার অন্তর জুড়ে শহুরে-গ্রামীণ সুরধারা', *অন্ধকার থেকে আলোয়*)

তাঁর কবিসত্তায় গ্রাম ও শহরের কমবেশি যৌথতা ছিল, এ কারণে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গগুলো অভিজ্ঞতার নির্যাসবিহীন এবং আরোপিত বলে মনে হয় না। চাঁদ যে কেবল

শামসুর রাহমানের কবিতায় নিসর্গের প্রতিনিধিত্ব করে গেছে, তা নয়। চাঁদের অনুষঙ্গে তিনি তুলে এনেছেন দেশ-কালের কথকতা, যেখানে চাঁদ তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বাইরে আরও কিছু, বিশেষ কিছু। *ঝরনা আমার আঙুলের* 'এখন কোথায় আমি' কবিতায় চাঁদকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রোমান্সপ্রবণ মনের সন্ধান দিয়েছেন তিনি। *হোমারের স্বপ্নময় হাতের* 'কড়া নেড়ে যাবে' কবিতায় কেরাণির পেশাজীবী চারিত্র্য, *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের 'রৌদ্র করোটিতে' কবিতায় বেদে সম্প্রদায়ের বোহেমিয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে চাঁদের প্রতিতুলনায় সমাজে তাদের শ্রেণি-অবস্থানগত পরিচয় উদ্ধার করা যায়। চাঁদকেন্দ্রিক রোমান্সঘনতার ভেতরে তিনি শ্রেণি-ব্যবধানের হিসেব-নিকেষ যুক্ত করে দিয়েছেন, 'কণ্ঠস্বর অন্ধকারে রটায় প্রেম' কবিতাটিতে দু'টি শ্রেণি উপস্থিত, একটি শ্রেণির জীবনে 'জয়তু বিলাসিতা, জয়তু ধনসম্পদ'/ শ্লোগান দিতে-দিতে ঢের আয়েশি মোটরকার ছোটে মসৃণ' (*কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে*), অন্যদিকে দুর্দশাগ্রস্ত মহল্লা, দারিদ্র্যের করুণ আঘাতে বিপর্যস্ত আরেকটি শ্রেণি। সেইসব পর্ণ কুটিরে লঘু কৌতুক ও ঝগড়ার মিশেলি হল্লায় সুনসান রাত্তিরে রোমান্সঘন হয়ে চাঁদ ওঠার কথা ছিল না। কিন্তু শামসুর রাহমান জীবনবাদী কবি, তাই দুর্দশার চিত্র এঁকেই ক্ষান্ত হন না, দারিদ্র্যঘেরা জীবনের ভেতরে অকস্মাৎ হাজির হওয়া প্রেমকে রোমান্টিক আবহ দিতে সুনসান রাত্তিরে আকাশে নিয়ে আসেন চাঁদ, সেই চাঁদকে আবার 'যুবতীর স্তনের মতো' বলে ভাষায় বুনে দেন বাসনা-বিলাস। রাত যখন সুনসান, আকাশে যখন যুবতীর স্তনের মতো চাঁদ, তখন—'কখনো, কখনো দারিদ্র্যঘেরা কুটিরে/ মধ্যরাতে মোটা মিহি কণ্ঠস্বর আন্ধারে প্রেম রটায়'। আবার 'বস্তুত ঘৃণায় নয় জানি/ প্রেমেই মানুষ বাঁচে। চিরদিন বিমুগ্ধ নিষ্ঠায়/ তাই সাদা চাঁদ কাফ্রি-রাত্রির প্রেমিকা পৃথিবীতে' ('ঘৃণায় নয়', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)—উচ্চারণমালায় বর্ণবাদে বিবাদী পৃথিবীর সামনে দারুণ এক উদাহরণ নিয়ে হাজির হন শামসুর রাহমান। প্রকৃতির ভেতরে কোনো বিভেদের কৃত্রিমতা নেই, কালো রাত আর উজ্জ্বল চাঁদের নিয়ত মিলনে সে সত্য প্রতিষ্ঠা পায়। অবশ্য চাঁদকে এভাবে দেশকাল ও বৈশ্বিক বাস্তবতা-সংলগ্ন করে দেখার পরিবর্তে শুধুই রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের দিকে অনেক বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর শুরুর দিকের কাব্যচর্চায় : 'আকাশের বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে/এসেছে তো রক্তকরবীর ডালে শব্দহীন চাঁদ :/সে-চাঁদ দু'জনে মিলে দেখেছি অনেক/সপ্রেম প্রহরে' ('আজীবন আমি', *রৌদ্র করোটিতে*)। পরবর্তীকালে কাব্যচর্চার পরিণত পর্যায়ে শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় চাঁদের রূপকল্পকে প্রেম ও রোমান্টিকতার বাইরে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, এদেশের মানুষের জীবন ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলেন, বিচিত্র সব রূপকল্পে চাঁদকে দেখেছেন তিনি। দেশকে রক্ষার জন্য, সুস্থ-স্বাধীন দেশের জন্য বারবার রক্ত ঝরেছে বাংলার মাটিতে। যে অসংখ্য প্রাণ নানা সময়ে ঝরে গেছে সুঘ্রাণ বকুলের মতো, আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁদের স্মরণে গেঁথে নিয়েছেন

কবি। বন্ধু ফয়েজ আহমদ শ্রেণিহীন মানুষের সহমর্মী ছিলেন, তাঁর মতো প্রতিশ্রুতিশীল, দেশপ্রেমী মানুষের কারাগারে বন্দি হবার পর এমন এক চাঁদের গল্প তিনি বলেন—'যে-চাঁদ শহীদের/ রক্ত মাখা মাথা' ('বন্ধু তোমাকে', *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*)। এক আলোকোজ্জ্বল পাথরখণ্ডকে তিনি শহীদের রক্তমাখা মাথার প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন, দেশের জন্য আন্দোলন-সংগ্রামে নিহত সব শহীদের প্রতীক হয়ে ওঠে এই 'রক্ত মাখা মাথা'।

শামসুর রাহমান জীবনে ও মননে আলোর প্রার্থী ছিলেন,[২১] নিজেকে একা আলোকিত করতে চাননি, বরং প্রমিথিউসের মতো আলো এনে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন প্রতিটি মানুষের চেতনায়। তাঁর কবিতায় আলো তাই শুভ, আলো চেতনা-জাগানিয়া, চাঁদ সেই আলোর প্রতীক।[২২] দেশ যখন দুঃশাসনের অধীন, সেই অন্ধকার সময়ের প্রেক্ষাপটে আলোর উৎস চাঁদকে তিনি আক্রান্ত হতে দেখেন—দেখেন 'চাঁদকে পনির ভেবে অগণিত ধেড়ে ইঁদুর/ কুট কুট খেয়ে ফেলছে অবিরত' ('তোমরা আমাকে আর', *উজাড় বাগানে*)। আরও দেখেন 'ডাগর ক্ষতের মতো চাঁদ' ('রাতের ক্লিনিক', *খুব বেশি ভালো থাকতে নেই*), 'কুষ্ঠ রোগীর মুখের মতো চাঁদ ('এত পথ পেরুনোর পর', *গন্তব্য নাই বা থাকুক*), 'জ্বরতপ্ত রোগীর মতো কাঁপতে' ('সত্যি কি গিয়েছিলাম', *গন্তব্য নাই বা থাকুক*) থাকা চাঁদ। রোমান্সঘনতা ছেড়ে সময়ের সঙ্গে এবং বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চাঁদকে প্রত্যক্ষণের বোধ বাংলা কাব্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য দিয়ে গেছেন । স্বদেশকে প্রত্যাশিত রূপে দেখতে ব্যর্থ হয়ে পরিপার্শ্বের সংঘাতময় পরিস্থিতিকে চাঁদের প্রতীকে শামসুর রাহমান উন্মুক্ত করেন এক প্রতীকভুবন :

> প্রবীণ আঁধারে
> হঠাৎ উদিত হ'ল চাঁদ,
> ঠোকরে ঠোকরে তাকে কাচের পাত্রের মতো গুড়ো
> করে ফেলে হিংসুটে দানব এক, মানবগন্ধী অন্ধকার নেমে
> আসে ত্রিভুবনে
>
> ('এ কেমন কৃষ্ণপক্ষ', *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে*)

ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের প্রতিমূর্তিতে উঠে এসেছে স্বদেশের অশুভ অবস্থা, আলোহীন কাল।[২৩] যাপিত জীবনে বারবার তিনি দুঃসময়কে চিহ্নিত করেছেন, কবিতায় তার ছায়া ধরেছেন। কী কারণে দুঃসময় চারপাশে এমন প্রবল পরাক্রমে জেঁকে বসেছিল? তাঁর কাব্য-চর্চার কালের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, দেশভাগ অথবা স্বাধীনতা কিছুই বদলে দিতে পারেনি এ দেশের ভাগ্য, দেশ স্বাধীনতা-পূর্ব

সময়ের মতো সমরতন্ত্রের অধীনে থেকেছে দীর্ঘকাল, গণতন্ত্র এলেও সুফল আসেনি। তাহলে সুসময় কী পরাক্রান্ত, আর কখনো সুসময় আসবে না কবির স্বদেশে? শামসুর রাহমানের কবিতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—প্রতিটি নেতিবাচক সময়ের বয়ান শেষে তিনি রেখে যান ইতিবাচকতায় উত্তরণের আশ্বাস। তাই সেই চাঁদের প্রতীকায়নেই তিনি বলেন প্রত্যাশার কথা :

অন্ধকার আকাশের বুকে প্রত্যাশার পূর্ণচাঁদ
জেগে উঠলেই জানি ভোগান্তি-বিদীর্ণ জনগণ
হাত ধরাধরি করে যাবে
মিলনমেলায় আর স্বাগত জানাবে শুভ আর কল্যাণকে

('ক্যালেন্ডার পাল্টে গেলে', *কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে*)

হতভাগ্য এবং বারবার প্রতারিত এদেশের মানুষের ভেতরে আবারও ফিরে আসবে সুদিন, যদিও এই প্রত্যাশার ভেতরে দুলতে থাকে আশঙ্কা। পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে কবি জানেন 'মনের কত প্রত্যাশার আলো মালা হতাশার ঝড়ে/ নিভে গিয়ে লুটোপুটি খেয়েছে ভাগাড়ে' ('ক্যালেন্ডার পাল্টে গেলে', *কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে*)। একবার তিনি বাংলার অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠতে দেখেছিলেন পূর্ণচন্দ্রোদয় : 'অন্ধকার/ ভেদ করে বাংলাকে চুমো খায় পূর্ণিমার চাঁদ' ('অন্ধকার ভেদ করে', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)। শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে নানা সময়ে কলম ধরেছেন তিনি, শেষ জীবনে এসে আরও একবার মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন প্রগতিশীল চেতনাধারায়, প্রত্যাশার শেষ পালকটি গুঁজে দিয়েছিলেন বিপ্লবী উজ্জীবনে। তাই অনেকদিন ধরে চাঁদের ক্ষতবিক্ষত রূপের ছবি আঁকতে থাকা কবি পূর্ণ চাঁদের রূপকল্প আঁকলেন :

শোষিত, বঞ্চিত
যারা, ভুগে ভুগে একদিন গনগনে
আগুনের মতো জ্বলে ওঠে দিকে-দিকে
প্রাপ্য-আদায়ের দীপ্ত নিশান উড়িয়ে।

('অন্ধকার ভেদ করে', *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন*)

শোষিত-বঞ্চিত মানুষেরা চেতনাগতভাবে উজ্জীবিত হওয়ার ফলেই 'অন্ধকার/ ভেদ করে বাংলাকে চুমো খায় পূর্ণিমার চাঁদ।' তাঁর এই বিপ্লবী চেতনা, শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্লান্ত জীবন এবং তাদের সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে শামসুর রাহমান 'এই সড়কে অনেক হাত' কবিতায় লিখেছেন—'এইসব হাত

সূর্যকে স্পর্শ করতে চায়, অন্ধকার রাতে/ হয়ে উঠতে চায় কালপুরুষ' (*সৌন্দর্য আমার ঘরে*)। কাব্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি রাজনীতির ছুঁৎমার্গে আক্রান্ত ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবন ও কবিতার অঙ্গনে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল, তিনি নিজেই বলেছেন : 'কাব্যক্ষেত্রে পদার্পণের পর কিছুকাল কবিতার ত্রিসীমায় দরিদ্র সাধারণজনের কোনও সমস্যা, বাস্তবের ছায়াকে ঘেঁষতে দেইনি। কিন্তু কিছুকাল পর সমাজের অস্থিরতা, নানা সমস্যা আমার কবি-সত্তার ঘাড় ধরে বাস্তবতার মুখোমুখি নিয়ে এলো। বুঝতে আমার অসুবিধা হলো না যে, শুধু কল্পনার মায়াজালে আটকে থাকলে চলবে না, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের কাছেও হাত পাততে হবে কবিতার সারবত্তা অর্জনের উদ্দেশে' (রাহমান, ২০০৪ : ২২৫)। পরবর্তীকালে এই 'অচ্ছুৎ' রাজনীতির নানা বাঁকবদল, বাঙালির সংগ্রামের সন্ধিক্ষণগুলো তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রাজনীতির সঙ্গে কখনো সরাসরি জড়িয়ে পড়েননি, তবে বামপন্থী ধ্যান-ধারণার প্রতি তাঁর কাতরতা ছিল। আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রক্ষণশীলতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দুটি পক্ষকে তিনি কবিতায় যথাক্রমে 'বাম' এবং 'ডান' শব্দে নির্দেশ করেছেন, তাঁর অনেক কবিতাতে বামের প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> খাপখোলা তলোয়ারের মতো
> কাঁধে ঝোলা বামঘেষা, নিষ্ঠাবান
> রাজনৈতিক কর্মীর আনাগোনা।
>
> ('কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

'খাপখোলা তলোয়ার' এবং 'নিষ্ঠাবান' শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, শব্দকে কবিতার মৌল উপাদানের স্বীকৃতি দিলে শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভেতরেই ধরা পড়ে কবিতার প্রকৃত গতিবিধি। কবিতার যেখানে যাত্রা, সেটি কবিরও চূড়ান্ত গন্তব্য, কারণ কবিতা কেবল উন্মূল ভাষাবুনন নয়, কবির চেতনায় যে প্রত্যক্ষণ ঘটে, অভিজ্ঞতায় যার আশ্রয় ঘটে, অবচেতনের গোপন প্রকোষ্ঠে যাকে লালন করেন তাই কবিতারূপে বেরিয়ে আসে। 'আশৈশব এক আলোকাতরতা' কবিতায় রয়েছে বন্ধু-সমাচার। পুঁজিবাদী বিলাসিতায় মগ্ন বন্ধু অথবা লেখক বন্ধুর প্রাণহীন লেখার চেয়ে শ্রেয়তর সেই বন্ধু, যে বন্ধু 'অন্ধকার এই দেশে/ ঘরে ঘরে আলো পৌঁছে/ দেবার ব্রত নিয়ে তিনি রৌদ্রজলে হেঁটেছেন বাম দিকে' ('আশৈশব এক আলোকাতরতা', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থা রাখা বন্ধুর পরিণতি হয়েছে করুণ, তার সেই করুণাঘন জীবনবেদনার সঙ্গে দেশের ভাগ্যকে একাত্ম করে দেখেছেন এবং তারই চেতনাবাহিত আলোয় আলোকিত করেছেন কবি নিজেকে :

অন্ধকার সেলে অষ্টপ্রহর
ধুঁকছেন তিনি স্বদেশের মতো,
অথচ তাঁর জীবন থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে
অলোকসামান্য যে-আলো
তাতেই আলোময় হয়ে উঠেছে আমার হৃদয়।[২৪]

('আশৈশব এক আলোকাতরতা', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)

এছাড়া আরও কিছু কবিতায় তাঁর শ্রেণি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় :

নর্দমার ধারে ব'সে একজন গুম নাম হাভাতে ভিখিরি
ফেলে-দেয়া লাঞ্চ বক্স থেকে কেমন বিচ্ছিরি
ঢঙ্গে তুলে নিয়ে প্রলায় পচে-যাওয়া একটি কমলালেবু খায়,
পাশে তার খাদ্যান্বেষী কুকুর হাঁপায়।'

('হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে', *খুব বেশি ভালো থাকতে নেই*)

এ যেন জয়নুলের ছবি, এখানে কবি প্রবলভাবে শ্রেণিসচেতন। শ্রেণিবৈষম্য ঘোচাতে হলে সমাজতন্ত্রের শরণ ভিন্ন উপায় নেই, যুগসংকটকে কাটাতে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনকে স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজন বামপন্থা—'আনতেই হবে শান্তি/ ডানে নয় জানি বামে চলাটাই শ্রেয়/ অনেক হেঁটেছি, কত পথ আর বাকি?' ('আনতেই হবে শান্তি', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*) বামের দিকে যে পথের কথা বলেছেন, অনেক সময় প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থীদের নিগ্রহে সে পথ হয়ে উঠেছে কণ্টকাকীর্ণ।[২৫]

চাঁদ ছাড়াও শামসুর রাহমান নিসর্গ ছেঁকে তাঁর কবিতায় গোলাপ, ফণিমনসা, কোকিলের শব্দানুষঙ্গ তুলে এনেছেন। এসব শব্দ ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি এবং এদের অর্থতাৎপর্যের ভেতরে দেশ-কাল ও জনজীবনের রূপছবি আঁকতে গিয়ে তৈরি করেছেন শব্দের বিশেষ প্রতীক-ভুবন। গোলাপ, কোকিল, ফণিমনসা, চাঁদ ইত্যাদি নিসর্গগামী শব্দকে ব্যক্তার্থ থেকে বিযুক্ত না করে তাতে আরোপ করেছেন গুঢ়ার্থ, প্রতীকী তাৎপর্য। শব্দে নতুন অর্থ-প্রয়োগে শব্দের স্বাধীনতা বেড়েছে, এই স্বাধীনতা তৈরির নেপথ্যে ছিল কবির পরিপার্শ্বে বৈরী ও পরাধীন সময়, এজন্য শব্দের অর্থসীমা বাড়িয়ে বক্তব্যকে রেখেছেন প্রতীকের অন্তরালে। দেশভাগ পরবর্তী পাকিস্তান শাসনামলে এবং একাত্তর পরবর্তী স্বাধীন স্বদেশে কবির মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করা হয়েছে, চোখ-কান-মুখ—উপলব্ধিকে ধারণের

এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের ইন্দ্রিয়সকলকে বিকল করে চেতনাহীন মানুষ তৈরিই ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা। ফলে জিম্মি হয়ে থাকা কবিকে অনিবার্যভাবে প্রতীকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে, কবিতার প্রয়োজনে। প্রতীকের আশ্রয়ে অবাধে পল্লবিত হয়েছে কবির চেতনাজগৎ, যে চেতনাজগৎ তৈরি হয়েছিল বাস্তবতার অভিঘাতে।

### গোলাপ

শামসুর রাহমানের কবিতায় অন্যান্য ফুলের চেয়ে গোলাপের উল্লেখ অনেক বেশি পাওয়া যায়। গোলাপের কবি ছিলেন লোরকা, তাঁর কবিতায় গোলাপ যেমন গোলাপের চেয়ে বেশি কিছু, শামসুর রাহমানের গোলাপও তার প্রচলিত অর্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় স্পন্দিত হতে চেয়েছে। শামসুর রাহমান সেই দুর্ভাগা কবি, যিনি তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে বারবার প্রত্যাশার বীজ বুনেও দেখে যেতে পারেননি কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ। স্বদেশকে পেতে চেয়েছিলেন সাজানো বাগানের মতো করে, এজন্য তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরে গোলাপ এবং বাগানের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে—'বাগান তাঁর কবিতায় অনেকটা বিশুদ্ধ বিশ্বের প্রতীক' (আজাদ, ১৯৮৩ : ৬১)। শামসুর রাহমানের প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলোতে 'বাগান' ও 'ফুলে'র প্রসঙ্গ এসেছে 'সৌন্দর্য', 'মহত্ত্ব', 'সত্য' আর 'সদ্‌গুণে'র ('ঘৃণায় নয়', *বিধ্বস্ত নীলিমা*) প্রতীক হিসেবে। ফুল ও বাগানকেন্দ্রিক চেতনা যেমন কবির শিল্পচৈতন্যকে নির্দেশ করেছে তেমনি বিশ্বপ্রসারী মানবপ্রেমকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। *বিধ্বস্ত নীলিমা* কাব্যের 'ঘৃণায় নয়', 'সম্পাদক সমীপেষু', 'বামনের দেশে', 'শুধু একটি ভাবনা' কবিতাসমূহে বাগানের উল্লেখ এবং বাগানের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যে বাগান বিশুদ্ধ শিল্পচৈতন্যের প্রতীক, পরবর্তীকালের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে বাগান এবং গোলাপের প্রতীকায়নে উঠে এসেছে স্বদেশের সার্বিক পরিস্থিতি।

*নিরালোকে দিব্যরথ* কাব্যে শামসুর রাহমান দেখেছেন পণ্যবাদী সময়ের গর্ভে 'রাত্রিদিন চলে বেচাকেনা' ('নিজস্ব সংবাদদাতা'), এই পুঁজি-প্রলুব্ধ সময়ের থাবা 'গ্রাম-গ্রামান্তরে', 'শহরতলীতে', 'অলিতে-গলিতে' বিস্তৃত। এ কাব্যের 'পোড়ো বাড়ি' কবিতায় তিনি প্রথমবারের মতো জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধ স্বরে নজরুলকে সাক্ষী রেখে বললেন, 'আমরা আজো পরবাসী/ নিজ বাসভূমে।'[২৬] এই সময় তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন একটি নতুন দেশের জন্য বিশুদ্ধ চেতনাচর্চার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, একটি সুন্দর বাগানের রূপকল্প দখল করেছিল বিশুদ্ধ চৈতন্যের জায়গা। দেখেছেন স্বদেশের মানুষের চেতনা শৃঙ্খলিত হয়েছে আগাছার আগ্রাসনে, পেনিলোপির ভূমিকায়

মাতৃভূমিকে রেখে অপেক্ষা করেছেন কাঙ্ক্ষিত পিতার, অপেক্ষার ব্যর্থতার সম্ভাবনায় তিনি নিজের কাঁধেই যেন তুলে নিতে চেয়েছেন সেই গুরুদায়িত্ব—'বাগানের আগাছা নিড়ানো / তবে কি আমারই কাজ?' ('টেলেমেকাস', *নিরালোকে দিব্যরথ*) কবি দেশনেতা নন, কবির কাজ নয় দেশরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন, তবে দেশের মানুষের চেতনাকে আগাছামুক্ত করে সেখানে নতুন ফুল-ফসলের ক্ষেত্র প্রস্তুতে কবি রাখতে পারেন সক্রিয় ভূমিকা, যেমনটি পূর্বে রেখেছিলেন মাইকেল এবং নজরুল। তিনি আমৃত্যু চেতনায় লালন করেছেন সুস্থ স্বদেশের আকাঙ্ক্ষা, সমুন্নত রেখেছেন হাতের অস্ত্র। এক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের অস্ত্র প্রথাগত অস্ত্রের মতো হিংস্র আঘাত হানতে পারেনি, তবে চেতনার দরোজায় তীব্র করাঘাত করেছে তাঁর কবিতাস্ত্র। দেশকে মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য চৈতন্যের সংগঠন ছিল খুব জরুরি, তাঁর কবিতা সীমিত পর্যায়ে হলেও সে ভূমিকা পালন করেছে সে সময়।[২৭] অস্ত্রে বিশ্বাসহীন শামসুর রাহমানের রণকৌশল নিতান্তই নির্বিবাদী, অথচ দেশের কল্যাণে দৃঢ়—'আমার লড়াইয়ের রীতি/ নদীর ফেরীর মতো; ফুল আর সুরের মতো/ পবিত্র' ('অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। যেহেতু হিংস্র অস্ত্রে তিনি আস্থাহীন, কাজেই কবিতায় অন্যরকম এক যুদ্ধের ঘোষণা দেন স্বদেশ ও মানবতার বিরুদ্ধে ধেয়ে আসা সব ধরনের অপচেতনার বিরুদ্ধে :

আমার রথের চাকা ধ্বংসের প্রান্তরে
করবে কর্ষণ মৈত্রী বৈরিতার কালে,
স্বপ্নের কেয়ারি হবে তৈরি দিকে দিকে। নিত্য ফুল
ফোটাবো ব্যাপক শূন্যে, সে পুষ্পশোভায়
অন্ধ হবে রক্তজবা-চোখে এবং বাঁচার গানে
স্তব্ধ করে দেবো প্রতিপক্ষের হুঙ্কার।

('অন্যরকম যুদ্ধ', *নায়কের ছায়া*)

শহীদ কাদরীর মতো তিনি বদলে দিতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজি,[২৮] প্রশাসনিক কাঠামো থেকে, দেশের চৌহদ্দি থেকে অস্ত্রের হুঙ্কারের পরিবর্তে খুঁজেছেন ফুলের সুরভিত সমাধান :

কখন আসবে সেই প্রহর;
যখন অশুভের হুঙ্কার স্তব্ধতায় হবে লীন,
যুদ্ধবাজদের হাতে রাইফেলের বদলে থাকবে
সুরভিময় ফুলের তোড়া?

('সভ্যতার কাছে এই সওয়াল আমার', *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*)

পরবর্তীকালে শামসুর রাহমানের কবিতায় 'বাগান' এবং 'ফুল' বিশেষত 'গোলাপ' দেশ এবং স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রতিমা হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যচর্চার ধরন বদলেছে, ঘটেছে চেতনার রূপান্তর। বিশুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে দেশ ও দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি মিশে গেছে এক অভিন্ন রেখায়, তখন তিনি দেশকে দেখেছেন ফুলের প্রতিমায় :

তোমার সৌন্দর্য, হে স্বদেশ, আকৈশোর মুগ্ধ আমি
অনিন্দ্য ফুলের মতো তোমার এ মুখ
উন্মীলিত, যেখানেই যাই
তোমার মুখশ্রী সঙ্গী আমার এবং
দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণের ঘোর কেটে গেলে
তোমার রূপের টানে ফিরে আসি তোমার কাছেই।

('কারো একলার নয়', *মঞ্চের মাঝখানে*)

শামসুর রাহমানের স্বদেশপ্রেম আপতিক নয়, তাই যুদ্ধ-বিক্ষোভ, দুর্ভিক্ষ-দুর্যোগ পেরিয়ে গিয়েও তিনি স্বদেশকে তাঁর কবিতাচর্চার কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নেননি, যুগের পর যুগ তিনি দেশকে নিয়ে ভেবেছেন। দেশের রূপ অর্থাৎ দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ, এই রূপমুগ্ধতা বাইরের জিনিস। অন্যদিকে অন্তরের ভেতরে রয়েছে সুগভীর স্বদেশচৈতন্য, যে চৈতন্যে ধরা পড়ে দেশের বিরুদ্ধে পেট্রোডলারের ষড়যন্ত্র, ভুখা শিশুদের কান্না আর স্বৈরাচারের প্রতি ঘৃণা।[২৯] যেহেতু স্বাধীনতার এক যুগ পরেও দেশ স্বৈরাচার-কবলিত হয়ে থেকেছে, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সেই স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের 'দুখিনী' তকমা স্বদেশের শরীর থেকে মুছে ফেলা যায়নি। এই দুস্থ স্বদেশকে ছেড়ে নির্বাসনে তো দূরে থাক, সাময়িক বিচ্ছেদও তাঁর চির অসহনীয়। তাঁর চৈতন্যে প্রতিনিয়ত ফুটে থাকে স্বদেশচেতনার রঙিন ফুল, স্বদেশপ্রেমের সেই প্রগাঢ় উচ্চারণ ধ্বনিত হয় শহীদ নূর হোসেনের মায়ের স্মৃতিচারণায় :

ফুটেছে গোলাপ এক বুকের ভেতরে
মা, তোমার মমতার মতো।
তোমার মুখেই দেখি
প্রতিদিন স্বদেশের মুখ

('একজন শহীদের মা বলছেন', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া নূর হোসেনের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে মা এবং দেশকে সমার্থক করে তোলেন তিনি। প্রকৃতি ও নারী এবং জন্মদাত্রী ও প্রতিপালক ভূগোলকে একাকার করে দেখার প্রবণতা বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের সঙ্গে, বাঙালির চেতনার সঙ্গে মিশে থাকা এক ব্যাপক প্রবণতা। শামসুর রাহমান নিজেও অনেক কবিতায় দেশ ও মাকে এবং প্রেয়সীকে একাত্ম করে দেখেছেন। নারী তাঁর কবিতায় নিতান্তই প্রেমের দ্বৈততার সূত্রে আসেনি, নারী তাঁর কবিতায় ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় সক্রিয়। তাঁর কবিতাচর্চার শেষের দিকে 'গৌরী' নামক এক কাব্যনায়িকার সরব উপস্থিতি রয়েছে, কবির চৈতন্যে তার অবস্থান উজ্জ্বল। সেই গৌরীকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখতে বসলে গৌরী তাঁকে আঙুল তুলে দেখায় সমকালের তামসিক ঘটনাবলী, কবিকে করে তোলে সময়-সচেতন।[৩০] অনেক সময় নারীকে কেন্দ্র করে শামসুর রাহমানের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকা মাতৃপ্রেম ও প্রিয় নারীর প্রতি প্রেম৩ স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে লীন হয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। ফলে, তাঁর অনেক কবিতাতে রয়েছে মা-মাতৃভূমি-প্রেয়সী—এই ত্রিকৌণিক প্রেমের অভিভাষণ ও মিথষ্ক্রিয়া।[৩১]

বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ, সে যুদ্ধে বীভৎস মৃত্যুর থাবা যাদের কেড়ে নিয়েছিল তাদের জন্য শামসুর রাহমানের মর্শিয়া শোক নেই, বরং তাদের সেই আত্মদানকে অনুপম গোলাপের মতো চেতনার গহীনে সংরক্ষণ করতে চান :

> জীবিতের চেয়ে তোমরা বেশি জীবন্ত এখন। তোমাদের
> রক্তসেচে আমাদের প্রত্যেকের গহন আড়ালে
> জেগে থাকে একেকটি অনুপম ঘনিষ্ঠ গোলাপ।
>
> ('রক্তসেচ', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

কবি যখন নিজের টেবিলে গোলাপ দেখতে পান, সেটি তাঁর নিজস্ব সত্তার প্রতীক, আয়ুর আকালে বিমর্ষ গোলাপ। নিজেকে ছাড়িয়ে গিয়ে এবং ছড়িয়ে দিয়ে যখন দেখেন তখন কবিতার খাতা ফেলে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ভেঙে সে গোলাপ হয়ে ওঠে সমগ্র স্বদেশে প্রসারিত চেতনার ধ্রুবক :

> আমার টেবিলের গোলাপটি
> যখন পাপড়ি ঝরাতে থাকে, তখন আমি
> চৌচির মাঠে উবু-হয়ে-বসে-থাকা কৃষক,
> বেতফলের স্বাদে ভরপুর কিশোরী,
> নতুন চরে পড়ে-থাকা লাঠিয়ালের ভেজা শরীর,
> পালকির পর্দা সরিয়ে-তাকানো নতুন বউ,

অন্ধকারে জেলে ডিঙ্গির ছিপছিপে গতি দেখতে পাই
এবং দেখি
চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে ফুটে থাকে কোটি কোটি রক্তগোলাপ।

('একটি গোলাপ যখন', *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই*)

বাঙালির জনজীবন ও ঐতিহ্যকে ঘিরে থাকা অতীত-আর্তি মাখা গ্রামীণ অনুষঙ্গ ব্যবহার করে তিনি ব্যক্তিসত্তাকে বিস্তৃত করেছেন সামষ্টিক চেতনার ব্যাপক পরিসর জুড়ে। দেশের সঙ্গে শামসুর রাহমানের সংযুক্তি আত্মিক, বাইরে তার প্রগলভ প্রকাশ নেই। তিনি 'পেশাদার প্রেমিকের মতো টেরি কেটে' দেশপ্রেম প্রচারে নামেননি। নিভৃতে, নিবিড় আনুগত্যে দেশকে বলেছেন—'তোমার উদ্দেশে নিত্য ফোটাই গোলাপ' ('দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)। তিনি দেশের কল্যাণ-সাধনায় চৈতন্যের প্রহরায় সতর্ক থাকলেও এই দেশেই আরও অনেক মানুষ আছে যারা সংকট বাড়িয়ে তুলেছে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার চতুর অভিপ্রায়ে, স্বদেশের 'গোলাপে যারা ছড়িয়েছে কীট' তারাই কপট প্রণয়ে বিমুগ্ধ প্রেমিকের ভূমিকায় সফল অভিনেতা। শামসুর রাহমান আরও দেখেছেন—'কালজয়ী বাগানকে ভাগাড় বানাবে বলে যারা তারা নিজ/ গর্ভধারিণীকে কলঙ্কিত করে দ্বিধাহীন প্রহরে প্রহরে' ('ভাষাশহীদের রক্তধারায় পুষ্পবৃষ্টি', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*)। অন্যদিকে এদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনে যারা প্রাণ দিয়েছে, যাদের অনেকেই পরবর্তীকালে শারীরিক পঙ্গুত্বে বিপর্যস্ত জীবনযাপন করেছেন, সেইসব সত্যিকার দেশপ্রেমিকের যথার্থ মূল্যায়নে স্বদেশ ব্যর্থ হয়েছে,[৩২] কবিতায় তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন 'বস্তুত এখানে জন্মান্ধেরা পথপদর্শক'। জীবনানন্দ যখন নারী, প্রেম ও প্রকৃতিকে অতিক্রম করে পারিপার্শ্বিকের দিকে নজর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও দেখেছিলেন 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা', আরও দেখেছিলেন, 'যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,/ এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়/ মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/ শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়' (অদ্ভুত আঁধার এক', *অগ্রন্থিত কবিতা*)। শামসুর রাহমান কবিতায় তুলে আনেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লড়ে যাওয়া মানুষের দুর্দশা, প্রিয় স্বদেশকে আঙুল তুলে দেখান সেই রূঢ় সত্য :

তোমার সাধের লাল গোলাপের জন্য যারা হইল চেয়ারে
পোহায় যৌবন, দ্যাখে অস্তরাগ, তাদের দিয়েছে ঠেলে
ব্যাপক ভাগাড়ে

('দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)

কারা 'দিয়েছে ঠেলে'? সেইসব অঘটন-সংঘটনকারী যারা 'বাগানকে ভাগাড়' বানানোর অপচেষ্টায় নিরত, যারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ। তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা অথবা বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিরুদ্ধ-পক্ষ হিসেবে উত্থান কবিকে উপায়হীনতার যন্ত্রণায় দগ্ধ করে, অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে তিনি শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলেন 'দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে', এ কাব্যগ্রন্থটির অনেক কবিতায় রয়েছে তাঁর দ্রোহের অনমনীয় উচ্চারণ।[৩৩] বিক্ষুব্ধ সময়ের পেষণে পর্যুদস্ত কবি দেখেন তাঁর প্রিয় শহরের 'চোখ ভরা রক্তাশ্রুতে'। নানা সংকটে বিপর্যস্ত শহর 'পরিশ্রান্ত শ্রমিকের মতো'। এই কালো সময়ের পর্দা সরে যায় যখন স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পূর্তির ঘন্টাধ্বনি শহরকে 'জাগরণী মহামন্ত্র' শোনায়। সেই জাগরণী মন্ত্রের সম্মোহনে অনেক সংকট, অনেক প্রত্যাশাভঙ্গের পরও 'গোলাপ' স্বাধীনতার বিশুদ্ধ চেতনার প্রতিরূপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর কবিতায় :

স্বাধীনতা চব্বিশটি অনিন্দ্য গোলাপ
হ'য়ে ফোটে জনতার হৃদয়ে এবং খলখল
অন্ধকার কেটে চলে নিরন্তরে আলোর তরণী।
('আমার এ শহরের চোখ', *হরিণের হাড়*)

মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ক্রূর নির্যাতনের প্রমাণস্বরূপ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হতে থাকে বধ্যভূমি, এ আবিষ্কারের সংবাদে কবির 'ঝকঝকে দুপুর নিমেষে অমাবস্যার রাত' ('জংলী ঘাস থেকে ইট কুড়িয়ে', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*) হয়ে যায়; যুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতায় বিকশিত 'ঐতিহাসিক নির্দয়তার' চিহ্ন বধ্যভূমি। নাম না জানা শহীদদের আত্মবিসর্জন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেয়া শহীদদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, দেশের নতুন মানচিত্র অর্জনের প্রয়োজনে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুকে তারা আলিঙ্গন করেছে 'কালজয়ী মহিমায়।' তাঁরা দেখেছে 'রক্তখেকো ঘাতকদের', শুনেছে 'অস্ত্রের বেলেল্লা চিৎকার'। পৈশাচিক নির্যাতনের পর তাদের মৃত্যু অন্য অনেক মৃত্যুর চেয়ে বেশি করুণাঘন, গণমৃত্যুর ভেতর দিয়ে মুছে গেছে তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-পরিচয়। শামসুর রাহমান তাঁদের করুণ মৃত্যুকে গৌরবের করে তোলেন দেশের প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগকারী বিশুদ্ধ চেতনার মানুষ হিসেবে। মৃত্যুর পর যাদের জন্য স্বতন্ত্র কবরের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল না, শ্রদ্ধায় এবং বেদনায় অবনত হয়ে তাঁদের স্মরণে কবি বলেন :

যদিও তোমাদের অনেকের কবরই নেই, তবু
ভাবতে ভালো লাগে আমার,
তোমাদের কবরের উপর ঝুঁকে আছে

অনেকগুলো রক্তগোলাপ।

('আমরা এসে দাঁড়িয়েছি', *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা*)

একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল শামসুর রাহমানের। তিনি দেখেছিলেন, স্বাধীনতার বিপক্ষ-শক্তির হাতেই আবার ন্যস্ত হয়েছে এ দেশকে শাসনের ভার, এই নিদারুণ কপটতার চালচিত্র দেখে 'আর্তনাদ করছে শহীদের আত্মা'। ১৯৯৪ সালে ডিসেম্বরে রায়ের বাজার বধ্যভূমির শহীদদের উদ্দেশে 'আমরা এসে দাঁড়িয়েছি' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন শামসুর রাহমান। *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটার* 'মহররমি প্রহর, স্মৃতির পুরাণ', *উজাড় বাগানের* 'শাস্তি দাবি করে' এবং *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে* কাব্যগ্রন্থের 'জংলী ঘাস থেকে ইট কুড়িয়ে', 'চাঁদের বিকল্পের জন্যে প্রস্তাব', 'সগীর বাউল এবং একটি পোড়ো জমির কথা' কবিতাসমূহে গণহত্যা ও বধ্যভূমি আবিষ্কারের গভীর বেদনা প্রকাশ করেন কবি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জোরালো দাবি তোলেন। এই দাবি তাঁর প্রাণের ভেতর থেকে উঠে এসেছে, যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তোলে বধ্যভূমি, এইসব স্মৃতির দহনঘেরা কবি অসহায় আর্তিতে বলেন : 'দুঃস্বপ্নের গহ্বরের মতো গণকবরের কথা/ যদি আমি ভুলে থাকতে পারতাম' ('এ্যামনেশিয়া', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)। একাত্তরের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কাল শেষ হলেও আরও অনেক পরোক্ষ যুদ্ধের দায় চেপে বসে দেশ-সচেতন, স্বদেশপ্রেমী মানুষের কাঁধে। বাহাত্তরে চারটি মূলনীতি নিয়ে প্রতিশ্রুতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেশ করাগত হয় স্বৈরশাসনের। সে সময় বিশুদ্ধ চেতনার পরিবর্তে উন্মেষ ঘটে অপচৈতন্যের :

এই এক সময়, যখন শ্বেতচন্দনের বদলে
গন্ধকের গন্ধ মাখা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং গোলাপকে
হটিয়ে ঘেঁটু ফুল...
যখন কোকিলের ঘাড় মটকে
কাক নিয়ে স্বৈরাচারীদের জয়োল্লাস দিক দিগন্তরে।

('এই এক সময়', *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*)

গোলাপের শুভবাদী চেতনাকে হটিয়ে দিয়ে যেমন ঘেঁটু ফুলের প্রতীকে অশুভ চেতনার উত্থান ঘটে, তেমনি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের গায়কী কোকিলের পরিবর্তে কাকের দৌরাত্ম্য বাড়ে কবির স্বদেশে। সুদিনের প্রতীক হিসেবে শামসুর রাহমানের কবিতায় রয়েছে কোকিলের উপস্থিতি।

কোকিল

শামসুর রাহমানের কবিতায় কোকিল গণতন্ত্র ও সুসময়ের প্রতীক। গণতন্ত্র-প্রত্যাশী সুকণ্ঠী কোকিল ডেকে চলে স্বৈরাচার কবলিত স্বদেশে—'শুনতে পাই, ফাল্গুনের পাতায়/ মুখ লুকিয়ে গলায় রক্ত তুলে / ক্রমাগত ডেকে চলেছে/ গণতন্ত্রকামী কোকিল' (*দাঁড়ালাম এখানে', গৃহযুদ্ধের আগে*)। *মঞ্চের মাঝখানে* কাব্যগ্রন্থের 'কারো একলার নয়' কবিতায় সামরিক শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে, 'ছিলেন এক কবি' কবিতায় দেখেছেন—'স্বৈরাচারীদের লোহার হাত স্বদেশকে দিচ্ছে ঠেলে ক্রমাগত জাহান্নামের আগুনে' এবং 'শুচি হয়' কবিতায় স্বৈরাচারীদের 'ষড়যন্ত্রের নীলনকশা'কে জনসম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁর কবিতার অভিষ্ট লক্ষের কথা ব্যক্ত করেন । তাঁর কবিতায় সমাজ ও স্বদেশের জন্য গণতন্ত্রের মাঙ্গলিক আবাহন অব্যাহত ছিল, যতদিন সামরিক শাসনের অবসান হয়নি ততদিন। একাধিক প্রতিবাদের কবিতা তিনি লিখেছেন নূর হোসেনকে প্রসঙ্গাভ্যন্তরে রেখে। *বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়* কাব্যের নাম কবিতায় কবির বয়ানে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে নূর হোসেনের মৃত্যু-চিত্র উঠে এসেছে। এই কাব্যের 'একজন শহীদের মা বলছেন' কবিতাটির নির্মাণ নূর হোসেনের মায়ের জবানীতে, এখানে মা এবং স্বদেশ সমার্থক হয়ে উঠেছে। *খণ্ডিত গৌরব* কাব্যের 'নব্বইয়ের একজন শহীদের স্ত্রীকে দেখে' কবিতায় শহীদ নূর হোসেনের স্ত্রীকে চিত্রায়িত করেন বাংলাদেশের প্রতিরূপক হিসেবে : 'যেন দুঃখিনী বাংলাদেশ চোখ থেকে/ অবিরত মুছে ফেলছে অশ্রুধারা'। গণ-আন্দোলনে উদোম শরীরে শ্লোগান লিখে রাজপথে বেরিয়ে আসার পর বুলেটবিদ্ধ নূর হোসেনের বুক বাংলাদেশের হৃদয়ের সঙ্গে অভিন্ন সুতোয় গাথা হয়ে যায়, তাই তাকে দেখে কবির মনে হয়, ওরা যেন 'নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়/ ফুটো করে দেয়; বাংলাদেশ/বনপোড়া হরিণীর মতো অর্তিনাদ করে, তার/ বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে' ('বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)।

বাংলাদেশ রক্তাক্ত হতে থাকে দীর্ঘ স্বৈরাচারের ছোবলে, নূর হোসেনকে তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রে রেখে তাকে দেন বীরের মর্যাদা, নব্বই দশকের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন ছিল শামসুর রাহমানের জীবনের একটি আলোড়িত ঘটনা। ঘটনাকে বাইরে থেকে তিনি জানতেন সাংবাদিকতার সূত্রে, আর ঘটনার অন্তরালের চৈতন্যপুরে পৌঁছে যেত তাঁর কবিতা—'নিকট-সমকাল নিয়ে কবিতা লিখলেও নিছক সাংবাদিক-দিনলিপিতেই তাকে অস্ত যেতে দেন না শামসুর রাহমান। তাই তার কবিতায় আমরা আজকের নূর হোসেনের চালচিত্রে কোন গ্রিক বীরের দীপ্ত পদধ্বনি শুনতে পাই' (শাহরিয়ার, ২০০১ : ১৯)। একসময় তাঁর কবিতার রক্তচক্ষু কোকিল এবং কবি নিজে অভিন্ন

সত্তায় রূপান্তরিত হন, কারণ উভয়েরই অন্বিষ্ট স্বৈরাচার কবলিত স্বদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। 'পাখির চোখে' কবিতায় কবি কোকিলের সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপন করেন নিজেকে—'রক্তচক্ষু কোকিল বলবে নির্দ্বিধায়,/ লোকটা আমারই মতো গলায় রক্ত তুলে গান গায়' ('আত্মা ছুঁড়ে দিই', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)। কোকিলের সঙ্গে গণতন্ত্রকামী কবি যে গানের সুর তোলেন, সেই সুর ভাজতে গিয়ে কবিকে জেনেবুঝে দাঁড়াতে হয় কবিতার 'নন্দনতত্ত্বের গলায় পা রেখে'। *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে* কাব্যের 'এই এক সময়', ও 'দিতে পারে নয়া সাজ কবিতা', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* কাব্যের 'কোনো ইন্দ্রনীল অভিমান নেই', *খণ্ডিত গৌরব* কাব্যের 'কিছু না কিছু নিয়ে' এবং *ধ্বংসের কিনারে* বসে কাব্যের 'জন্তু'— শিরোনামের কবিতাসমূহে সামরিক শাসনের বিভীষিকাময় কালের খণ্ডচিত্র এবং সঠিক নেতৃত্বের অভাবজনিত সংকটের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। গোলাপ এবং কোকিল ইতিবাচকতার ইঙ্গিতবাহী, বিপরীতে ফণিমনসার কথা বলেন কবি নেতিবাচক পরিস্থিতি ব্যাখ্যায়।

**ফণিমনসা**

শামসুর রাহমান কবিতায় তাঁর এমন এক সময়বৃত্তের উল্লেখ করেন যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির শোচনীয় অবস্থা। সত্য ও কল্যাণ মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে অস্ত্রের শানানিতে, একনায়কতন্ত্রের অন্ধ স্তাবকতাই নিষ্কৃতির একমাত্র পথ। ফলে গোলাপের বিপরীত প্রান্তে অশুভের ইঙ্গিতবাহী হয়ে ফুঁটে থাকে ঘেঁটু ফুল আর কোকিলের শুভবাদী চেতনাকে গ্রাস করে কাকরূপী কর্কশ এক শক্তি। দেশ তো বটেই, কবি ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হন স্বৈরাচারী শাসকের হুমকিতে। দেশ-কাল-পরিস্থিতি গোলাপের কোমলতার বিপ্রতীপ প্রবণতা নিয়ে কবিচৈতন্যকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে, কবিতায় উঠে আসে ফণিমনসারূপী কণ্টকিত সময়। টি. এস. এলিয়টের পর থেকে 'ফণিমনসা' শব্দটি বিরূপ প্রতিবেশের প্রতীক হিসেবে কবিতায় স্থান পায়, তিরিশের দশকে দুঃসময়কে চিহ্নিত করতে 'ফণিমনসা'র অনুষঙ্গটি কাব্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ব্যাপকভাবে। 'গোলাপ' এবং 'ফণিমনসা' শব্দ দুটির প্রতীকী তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিপরীত, চেতনার বৈপরীত্যকে দুই স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অভিপ্রায়ে শামসুর রাহমান প্রতিনিয়ত গোলাপ ও ফণিমনসা বাছাই করতে থাকেন লেখার টেবিলে বসে—'লেখার টেবিলে ঝুঁকে গোলাপ এবং/ ফণিমনসার ঘ্রাণময়/ পর্ব ভাগ করি' ('যাচ্ছি প্রতিদিন', *অবিরল জলভ্রমি*)। ফণিমনসার আঘাতে বিপর্যস্ত কবির আহাজারি উঠে এসেছে অনেক কবিতায়—'তোমার কাছে গোলাপ প্রার্থনা করে আমি নতজানু,/ তুমি কেন ক্যাকটাস ছুড়ে দাও?' ('হে শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার', *ইকারুসের আকাশ*)

শামসুর রাহমান বরাবরই বৃক্ষপ্রেমিক, স্বদেশের সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে বারবার তিনি মুখোমুখি হয়েছেন এ দেশের শ্যামল প্রকৃতির। কিন্তু সময় যখন বিরূপ হয়ে ওঠে তখন প্রকৃতিও যেন হয়ে ওঠে সেই দুঃসময়ের সহচর। প্রকৃতি ব্যর্থ হয় ক্ষতে প্রলেপ দিতে এবং বিভীষিকাময় অতীতের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় কম্পিত কবির হৃদয় :

প্রিয় প্রকৃতিও
পারে না বুলোতে কোনও অব্যর্থ মলম
অন্তরের গভীর জখমে আর সুদূর একাত্তরের রক্তমাখা মুখ
আবার নতুন করে জেগে উঠে বিভীষিকা রূপে
পথে পথে, ঘরে ঘরে হানা দেবে ভেবে
এখন তোমার বুকে জমছে তুষার।

('নিভৃত কঙ্কাল', *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*)

সাময়িকের জন্য প্রবাসে বাস করে যখন ফিরেছেন স্বদেশে, মানুষের সাথে নয়, বরং পুনর্মিলন ঘটেছে গাছেদের সাথে বৃক্ষবিরহী কবির।[৩৪] অথচ গণতন্ত্রের ছায়াহীন স্বদেশে একসময় প্রকৃতিও তার হিংস্র রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে— 'উঠোনের গাছপালা খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ/ হুনের মতন ধেয়ে আসে এই ঘরে কী দুর্জয়। আমার ওপরে ঘোর কালো ফণিমনসা বন/ সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে' ('কে দেবে অভয়', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)। বাইরের প্রতিবেশ থেকে আক্রান্ত হন, আবার অন্তরাশ্রয়ী হয়েও মুক্তি নেই, অথচ নিজের কবিতাকে 'গোলাপ বাগান' করে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি, অর্থাৎ তাঁর কবিতা হবে বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিপূরক। কিন্তু তাঁকে বারবার শোনাতে হয়েছে ফণিমনসার ঘাতক কাঁটার আক্রমণের সংবাদ :

আমি তো আমার কবিতাকে নিত্যদিন
গোলাপ বাগান করে রাখতে চেয়েছি। রাশি রাশি পরগাছা
যাতে সেই বিশুদ্ধ উদ্যানে জাঁহাবাজ
মাস্তানের মতো নষ্টামিতে মেতে উঠতে না পারে,
সেদিকে রেখেছি দৃষ্টি; কিন্তু হাজার হাজার ভারী বুটের আঘাতে
হয়েছে দলিত সে বাগান। কি আশ্চর্য, কোথাও দেখি না আর
গোলাপের চারা, চতুর্দিকে বড় জায়মান কী ভীষণ ফনিমনসার বন!

('আমার স্বস্তিতে ধরায় ফাটল', *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*)

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জেনারেলদের 'ভারী বুটের' রাজত্ব পুনঃপুন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এদেশের রাজনীতির স্বভাবে যেন মিশে গিয়েছিল স্বৈরিতার রক্তবীজ, তাই গণতন্ত্রের আচ্ছাদনে নিচেও সংঘটিত হতে থাকে স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে প্রত্যাশিত আচরণ করেনি গণতান্ত্রিক সরকার, স্বাধীন দেশে একাত্তরের মতো কবি ও বুদ্ধিজীবী হত্যা,[৩৫] পুলিশি নির্যাতন এবং নির্বিচারে মানুষ খুনের চলমানতায়[৩৬] দেশ যেন এক 'কসাইখানা'য় ('কারো দণ্ডে', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*) পরিণত হয়েছে। দেখেছেন দেশের ক্ষমতার মসনদ দখল করে বসে আছেন 'নারী নিরো' । ১৯৯৭ সালে *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি* এবং *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল* এ দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এখানকার অধিকাংশ কবিতাতে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতির চিত্র উঠে এসেছে। সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও স্বপ্নভঙ্গের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থেকেছে :

> সামরিক স্বৈরাচারউত্তীর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই মুক্ত নব্বইয়ের প্রারম্ভে কবিরা শীতসকালের কবুতরের মত প্রত্যাশায় মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অযোগ্য ও আন্তরিকতাশূন্য প্রশাসন তথা নেতৃত্বের কবলে পড়ে আবার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে।... বর্তমান সরকার গণনির্বাচনে অধিষ্ঠিত হবার গৌরব কবরচাপা দিয়ে সামরিক প্রশাসক জিয়ার কুশপুত্তল প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহী। গণতন্ত্র এভাবেই সমরতন্ত্রে পিছু হটছে। আবারো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তোলা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আমরা এক ইঞ্চিও এগোয়নি। এই অলাতচক্রে আমাদের কবিতাও এগুতে পারবে না। ক্ষতি হয়ে যাবে তার শিল্পসুষমার। তবু ক্ষতবিক্ষত তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মন্ত্র মুখে নিয়ে। তাকে এগিয়ে আসতে হবে মিছিলের পায়ে পায়ে (সিদ্দিক, ২০০৯ : ১০০)।

দেশের শাসনব্যবস্থা ও মানবতার ক্রমাবনতি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বাণীবন্ধ শামসুর রাহমানকে আরো বেশি সমকালসংলগ্ন করেছে, অনেক সময় তাঁকে নিক্ষেপ করেছে শিল্পক্ষেত্র থেকে দূরে কবিতা পরিণত হয়েছে দুঃসময়ের কথকতায়।

শামসুর রাহমানের কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ইতিবাচকতায় উত্তরণ। অন্ধকারে বসে আলোর অথবা হতাশায় নিমজ্জমান থেকে আশাবাদে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার আকস্মিক বৈপরীত্য তাঁর অনেক কবিতায় রয়েছে। তিনি দেশের দুঃসময়ের চিত্রকর, আবার সেই দুঃসময়কে প্রতিহত করে স্বদেশ পৌঁছে যাবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে এমন প্রত্যাশাও তিনি পোষণ করেন। গণতন্ত্র যখন কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে

আনতে পারেনি, তখন তিনি অপেক্ষা করেছেন প্রত্যাশিত সরকারব্যবস্থার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কবি নতুন করে সুন্দর স্বদেশ গড়ার প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন—অনেকদিনের অযত্নে হতশ্রী দেশকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন তার বাগানসুলভ শ্রী, বলেছেন : 'শুরুতেই বাগানটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন' ('শুরুতেই বাগানটা', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*), এ সময় গণমানুষের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে কলমের ডগায় তুলে আনেন, কবিতায় শুরু করেন দেশকে নতুন করে গড়ার উৎসব, গণতন্ত্রকে ঢেলে সাজানোর উদযোগ :

> কোটি কোটি চোখ
> নতুনের স্বপ্নে খুব ডাগর উৎসব। আগামীর
> নামে রঙ বেরঙের প্রজাপতি উড়ুক বাগানে,
> কোকিল করুক আজ বসন্তের বিশদ আবাদ।
> ফের সাজাবো বাগান অপরূপ,
>
> ('বাগবানের গান', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*)

শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় চাঁদের নিরুত্তাপ ও শুভবাদী আলো, বাগান ও গোলাপের স্নিগ্ধতা, সুদিনের গায়কী কোকিলকে বারবার ফিরিয়ে এনেছেন অন্ধকার ও অশুভ, ফণিমনসার ঘাতক কাঁটার আঘাত এবং কাকের কর্কশ আধিপত্য স্বদেশ থেকে বিতাড়নের সংকল্পে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ সংকল্পে বিচ্যুতি ঘটেনি।

সবশেষে বলা যায়, শামসুর রাহমানের সুবিশাল কাব্যভাণ্ডার ছেঁকে তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করাটা সুকঠিন। তবে, বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে তিনি নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্য নিয়ে, সে যাত্রার সমাপ্তি-চিহ্ন *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন* কাব্য, ১৯৬০ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ। এজন্য যে জীবনীশক্তি প্রয়োজন, সেই জীবনীশক্তি বাংলা সাহিত্যে ছিল একমাত্র রবীন্দ্রনাথের, আর বিশ্বসাহিত্যে ছিল পাবলো নেরুদার; অস্তিত্ব-সংকটের চূড়ান্ত মুহূর্তেও তাঁদের কলম সচল থেকেছে, জীবনকে যাপনের সহজ আনন্দ এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর কঠিন বেদনা সবই তাঁদের কাব্যের সম্বল, অবলম্বন। জয়ের আনন্দে কবিতা হয়েছে উৎসবের প্রাঙ্গণ, পরাজয়ের গ্লানিতে কবিতা হয়েছে শোকের প্রান্তর, কবিতা উদ্‌যাপনের সঙ্গী, কবিতার সঙ্গেই কবির গেরস্থালী। শামসুর রাহমানের এই বিশাল কাব্যভুবন নির্মাণে তাঁকে পাড়ি দিতে

হয়েছে নানা চড়াই-উৎরাই, খানা-খন্দ, জীবন খুব সহজে তাঁর হাতে তুলে দেয়নি কবিতার অনুদান। তাছাড়া ঘটনার অভিঘাতে, কালের পরিস্রোতে বদলে গেছে জীবনদর্শন, কবিতার গন্তব্য। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*-কাব্যতে তিনি রেখেছিলেন নতুন কবি হয়ে ওঠার, নতুনরকম কবিতা নির্মাণের অঙ্গীকার, *রৌদ্র করোটিতে* সেই অঙ্গীকার পূরণ, নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের রূপরেখায় রাখলেন নিজস্বতার ছাপ, *বিধ্বস্ত নীলিমা* ও *নিরালোকে দিব্যরথে* নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে তাঁর কবিতার বাঁকবদলের প্রস্তুতি। সমষ্টির জীবনকে কবিতায় স্থান দেবার ব্যাপারে যে কার্পণ্য, সেই দ্বিধা ও দোলাচলতা কাটিয়ে কবিতায় ধারণ করলেন দেশ-কালের কেন্দ্রীয় প্রবণতাসমূহ, *নিজ বাসভূমে* কাব্যগ্রন্থে কবিতার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন নিশ্চিত মীমাংসায়, সমকালের স্বদেশ হয়ে উঠেছিল কবিতার সত্য। সে সত্যকে স্পর্শ করে দীর্ঘ কবিজীবন অতিবাহিত করেছেন, দেশবিভাগ থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দী ছুঁয়ে যাওয়া স্বদেশ—যার ইতিহাস কেবল ভাঙা-গড়ার, অস্থিরতার, কবিতার মর্মমূল দখল করে নিয়েছিল সেই ভাঙা-গড়ার ছায়ারেখা। বায়ান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর পেরিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশকে নিয়ে নিরন্তর ভেবেছেন শামসুর রাহমান, জীবন ও কবিতার সাধনায় স্বদেশের কল্যাণ কামনা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান ব্রত।

## টীকা

১. তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নৈসর্গিক জগতে বিচরণের নেপথ্যে প্রথম পর্যায়ে শামসুর রাহমানের কবিতায় জীবনানন্দ ব্যাপকভাবে সক্রিয় ছিলেন :

এখনও যে শুই
ভীরু-খরগোশ-ব্যবহৃত ঘাসে, বিকেলবেলার কাঠবিড়ালীকে
দেখি ছায়া নিয়ে শরীরে ছড়ায়,—সন্ধ্যা-নদীর আঁকাবাঁকা জলে
মেঠো চাঁদ লিখে
রেখে যায় কোনো গভীর পাঁচালি—দেখি চোখ ভরে;
ঝিঁঝির কোরাসে স্তব্ধ, বিগত রাত মনে করে
উন্মন-মনে হরিণের মতো দাঁতে ছিঁড়ি ঘাস
হাজার যুগের তারার উৎস ঐ যে আকাশ
তাকে ডেকে আনি হৃদয়ের কাছে, সোনালি অলস মৌমাছিদের
পাখা-গুঞ্জনে জ্বলে ওঠে মন, হাজার-হাজার বছরের ঢের
পুরনো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসি ('রূপালি স্নান', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)।

উপরিউক্ত উদাহরণটির অনেক জায়গায় জীবনানন্দের শব্দভাণ্ডার থেকে সরাসরি শব্দ চয়ন করেছেন, যদিও শব্দ স্বাধীন, কারও নিজস্ব নয়। তবে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের আবির্ভাবের পর কিছু শব্দ জীবনানন্দীয় ঢঙের দ্যোতক হিসেবে পরিচিতি পায়, যেগুলোকে তাঁর মতো করে ইতোপূর্বে কোনো কবি কবিতায় ব্যবহার করেননি। প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ 'ঘাস', 'সন্ধ্যার নদী', 'শিশির', 'হরিণ'—এই শব্দগুলো স্বতন্ত্র মাত্রা পায় তাঁর হাতে। বিশেষ করে 'হাজার বছর' শব্দটি উচ্চারণ করে জীবনানন্দ ভেঙেছিলেন প্রথাগত জীবনের হিসেবযোগ্য সময়ের সীমা, সময়কে জুড়ে দিয়েছিলেন আপেক্ষিকতার সঙ্গে। শামসুর রাহমানও 'হাজার-হাজার বছরের ঢের/ পুরনো প্রেমের রোদে পিঠ দিয়ে' বসেন। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর* আগে কাব্যের 'তার শয্যার পাশে',

'মনে মনে', 'যুদ্ধ', 'আত্মজীবনীর খসড়া' কবিতাসমূহে নিসর্গ-বয়ানে জীবনানন্দসুলভ বাচনভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায়।

২. ভালোবাসা তুমি অনাবৃষ্টিতে
কেমন রুক্ষ, কী দগ্ধ আজকাল।
তারা-পাতা নেই, পাখিরা উধাও;
ভীষণ রিক্ত তোমার সলাজ ডাল। ('ভালোবাসা তুমি')

৩. শামসুর রাহমান অবশ্য সবসময় 'অপেক্ষা' করার অবকাশ পাননি, অস্থির সমকালের প্রবল তাড়নায় অনেক সময় সাংবাদিকসুলভ ক্ষিপ্রতায় নিকট বর্তমানের ঘটনাকে কবিতায় রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, এমন কিছু কবিতার জন্ম হয়েছে যেসব কবিতার জন্ম না হলে ক্ষতি হতো না।

৪. *বিমুখ প্রান্তর* কাব্যগ্রন্থের 'অমর একুশে' কবিতায় হাসান হাফিজুর রহমান ভাষা আন্দোলনের আবেগ স্পর্শ করে বলেছিলেন : 'সালাম, রফিক উদ্দিন, জব্বার—কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম;/ এই একসারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে'।

৫. 'উইলিয়াম কেরীর স্মৃতি', *আকাশ আসবে নেমে।*

৬. 'ধন্য ধন্য রবে মুখরিত', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি।*

৭. পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত পাকিস্তানের পূর্বাংশকে ১৯৫৫ সালের ১৪ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করা হয়।

৮. এইসব পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক যাদের নির্দেশে বাংলায় সংঘটিত হয় 'রক্তসেচ', তাদের কবি শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেননি। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* কাব্যের 'রক্তসেচ' কবিতায় রয়েছে সেই ঘৃণার উদগীরণ —'টিক্কার ইউনিফর্মে শিশুর মগজ,/ যুবকের পাঁজরের গুঁড়ো,/ নিয়াজির টুপিতে রক্তের প্রস্রবণ,/ ফরমান আলীর টাইয়ের নটে ঝুলন্ত তরুণী...।' এ কাব্যের 'অভিশাপ দিচ্ছি' কবিতায় এসব পাকিস্তানি ঘাতকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন —'অভিশাপ দিচ্ছি ওরা চিরদিন বিশীর্ণ গলায়/ নিয়ত বেড়াক বয়ে গলিত নাছোড় মৃতদেহ', যেমন কোলরিজের নাবিক বহন করেছিলেন এ্যালবাট্রসের মৃত্যুর অভিসম্পাত।

৯. 'ছাব্বিশে মার্চ সারাদিন ও রাত অব্দি ছিল কারফিউ। সেদিনই আমাদের আশেক লেনের বাসার প্রায় লাগোয়া নয়াবাজারে পাক সেনারা অগ্নিসংযোগ করে। জোহরা, আমি এবং আমাদের পাঁচ সন্তান দোতলার জানালা দিয়ে দেখছিলাম জড়িয়ে যাওয়া আগুনের ভয়ঙ্কর জিহ্বা।...দেড় দু'মাস পরে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরে এসে লিখেছিলাম 'তুমি বলেছিলে' শীর্ষক একটি কবিতা' (রাহমান, ২০০৪ : ২৬৬)।

১০. 'পাক' শব্দটির বাংলা অর্থ পবিত্র। পবিত্রতার কী বাহারই না দেখাল পাকিরা!' (রাহমান, ২০০৪: ২৬৬)

১১. '..একাত্তরের এপ্রিলে দুপুরে/ কবিতা লিখেছিলাম নাক্ষত্রিক আলোড়নে আর/ ঐ পুকুরের পিপাসার্ত জল আমার অসুস্থ/ অনুজকে অনুরূপ দ্বিপ্রহরে করেছিল গ্রাস' ('বহুদিন পর পাড়াতলীতে আবার', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)।

১২. 'মার্কিনী পুঁজিবাদের রেশমী ফাঁস ন্যাটো ও সিয়াটো চুক্তি এই গরিব দেশের জন্যে কী দুর্যোগ বয়ে আনতে পারে, সেই তিক্ত সত্য ভাসানী তর্জনী তুলে দেখিয়ে দেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগ তা বুঝেও না বোঝার জিদ বজায় রাখে। গৌরবের কথা এই, আমাদের প্রগতিশীল কবিসাহিত্যিকেরা সেই দিনটি থেকে মার্কিনী পুঁজি ও তার পাকিস্তানি-বাঙালি-অবাঙালি দোসরদের চিহ্নিত করে নেন' (সিদ্দিক, ২০০৯ : ৯৬)।

১৩. 'একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ/আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো/দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা/জ্বলজ্বলে রূপ জোৎস্নায়' ('ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়', *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা)*।

১৪. 'ভীতিচিহ্নগুলি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা।*

১৫. 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি/ এই বাংলার পারে র'য়ে যাবো' ('জংলী ঘাস থেকে ইট কুড়িয়ে', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*)।

১৬. 'এ দেশের মাটিতেই/ আমার নিজস্ব সব শেকড়-বাকড় জেনে খুশি।' ('আত্মচরিত',*এক ফোঁটা কেমন অনল*)

১৭. 'সিঁড়িতে ভীষণ ভিড়', *নায়কের ছায়া*।

১৮. নগর-সভ্যতা তাঁর এই বৃক্ষপ্রেমী মনের ওপর বারবার আঘাত হেনেছে। আজন্ম শহরবাসের সূত্রেই তিনি জেনেছেন নগরের বৃক্ষ-নিধন বৃত্তান্ত। বৃক্ষপ্রেমের প্রগাঢ়তা এবং বৃক্ষনিধনের বেদনা আমৃত্যু তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তিনি কান পেতে শুনেছেন নগরায়নের প্রভাবে ক্রমাগত কাটা পড়া বৃক্ষদের অসহায় কান্না—'কুঠারের/ সন্ত্রাসে নির্দয়তাপ্রসূত আওয়াজ আর বৃক্ষের ক্রন্দন/ ভেসে আসে নিকট এবং দূর থেকে' ('হে পক্ষী, হে বৃক্ষ', *হৃদপদ্মে জ্যোস্না দোলে)*। 'আমার পড়ার ঘর থেকে' (*হৃদপদ্মে জ্যোস্না দোলে*), 'হায়, এ কেমন জায়গায়' (ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে), 'কোন্ কালবেলায়' (*গন্তব্য নাই বা থাকুক*),

'নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন' (*গন্তব্য নাই বা থাকুক*) কবিতাগুলোতে ইট-কাঠ-পাথরের আগ্রাসনে বিপন্ন বৃক্ষসমাজের জন্য নিসর্গ-পিপাসু কবি-হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে।

১৯. 'বহুদিন পর পাড়াতলীতে আবার' *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*, 'পাড়াতলী গাঁয়ে যাই' *হৃদপদ্মে জ্যোস্না দোলে*, 'নিত্য বেশি টানে' *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*, 'তট ভাঙার জেদ' *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে*—কবিতাসমূহে পাড়াতলী গ্রামের স্মৃতিকাতরতা, গ্রামীণ প্রকৃতি এবং বিশেষ করে মেঘনা নদীর উত্তাল প্রবাহ, যা কবির পূর্বপুরুষের মতো কবিকেও রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা যুগিয়েছে, সেই নদীর প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। মেঘনা নদী তাঁর স্বদেশভাবনায় স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছিল; মাইকেলের স্বদেশভাবনার মূলে যেমন ছিল কপোতাক্ষ নদের গভীর প্রভাব, তেমনি শামসুর রাহমানও স্বীকার করেছেন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কপোতাক্ষ আছে, তাঁর 'কপোতাক্ষ' মেঘনা নদী। 'কবি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক কবির চিত্তভুবনেই থাকে ব্যক্তিগত এক কপোতাক্ষ নদ, তবু তিনি নিজেকে প্রসারিত করতে চান অবারিত ভূগোলে লাখো জনপদে' (ঘোষ, ২০০৬ : ১৬৫)।

২০. অশোক বিজয় রাহার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় শামসুর রাহমানের প্রথমেই মনে পড়েছিল তাঁর চাঁদ বিষয়ক কবিতার কথা। এ প্রসঙ্গে *কালের ধুলোয় লেখা*তে বলেছেন—'তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ামাত্র আমাদের মনে পড়ে গেল তার কবিতার একটি চমৎকার পঙ্‌ক্তি, 'আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে' (রাহমান, ২০০৪ : ১০২)।

২১. 'এদেশে আলোর কথা ভুলে থাকে লোক;/ বড়ো বেশি অন্ধকার ঘাঁটে আর নখের আঁচড়ে/ গোলাপ-কলিজা ছেঁড়ে পরস্পর' ('খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি', *রৌদ্র করোটিতে*), তাই আলোর কথা তিনি বলতে চান : 'আশৈশব এক আলোকাতরতা লালন করছি/ আমার ভেতর' ('আশৈশব এক আলোকাতরতা', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)।

২২. তাঁর কবিতায় আলোর উৎস হিসেবে চাঁদকে নিয়ে মাতামাতি থাকলেও সূর্যের উপস্থিতি কম। কারণ, সূর্য আলোর উৎস হলেও তার একটা রুদ্র রূপ আছে, বিশেষ করে যখন বলেন, 'রৌদ্র করোটিতে' তখন শুধু আলোকেই বোঝায় না, উত্তাপের উষ্মাও প্রকাশ পায়।

২৩. 'অন্ধকার' জীবনানন্দের কবিতার একটি বিশেষ অনুষঙ্গ। শুরুর দিকের 'অন্ধকার-বিলাসের' প্রবণতা শেষের দিকের কাব্যচর্চায় আলোর আকাঙ্ক্ষা এবং 'অন্ধকার-বিনাশের' সংকল্পে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে অন্ধকার থেকে আলোর যাত্রায় তিনি 'আমি' থেকে 'আমরা'য় উত্তরিত—'তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে/আমরা কি তিমিরবিলাসী?' এই সংশয়ের সমাধানকল্পে তিনি আবার বলেছেন, 'আমরা তো তিমিরবিনাশী—/হতে চাই।' তারপর মীমাংসিত এক সত্য উচ্চারণের দৃঢ়তা—'আমরা তো তিমিরবিনাশী' ('মীমাংসা', *তিমিরহননেনর গান*)। জীবনানন্দের যেমন *তিমিনহননের গান* ছিল, শামসুর রাহমানের *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুকছে, কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে, অন্ধকার থেকে আলোয়* এবং *কবে শেষ হবে কৃষ্ণপক্ষ* শিরোনামের ভেতরে আলো-অন্ধকারের স্বরূপ, অন্ধকার থেকে আলোয় আরোহনের প্রত্যাশা-চিহ্ন ছিল।

২৪. এই বন্ধু ছাড়া আরও এক ভাস্বর পুরুষের গল্প শোনা যায় তাঁর কবিতায়, যার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন : 'ভাস্বর পুরুষ, সংগ্রামকে জীবনের সারসত্য/ জেনে তুমি নিয়ত হেঁটেছো পথে। যেখানে তোমার পদচ্ছাপ/ পড়েছে প্রগাঢ় হয়ে, সেখানেই সাম্যবাদ চোখ মেলবার/ অভিলাষ করেছে প্রকাশ' ('ভাস্বর পুরুষ', *ধ্বংসের কিনারে বসে*)।

২৫. *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ* কাব্যের 'নীল কুয়াশায়' কবিতায় বলেছেন : 'দেখি কবন্ধের দল রাস্তা জুড়ে/বিক্ষোভ মিছিলে মাতে কল্যাণ এবং সুষমার/বিরুদ্ধে বড় বেশি সরে গিয়ে ডান দিকে।' *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি* 'দয়া করে একটু শুনুন' কবিতায় ডানপন্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন : 'তবে কেন ডানের মোড়ে লোক জমিয়ে/অগ্রগতির মস্ত বড় শত্রু সাজেন?/প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে চলেন? *হৃৎপদ্মে জ্যোস্না দোলে* কাব্যের 'মেটামরফসিস' কবিতায় সময়ের চাতুরী ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন : 'দেখছি এখন ডানে বামে তফাৎ তেমন পাই না খুঁজে।' *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন* কাব্যের 'চাই কৃষ্ণপক্ষের অবসান' কবিতায় ডান-বামের সংঘাতপূর্ণ অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন কবি : 'ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত পশুর/ধরনে বামের দিকে প্রায়শই বিষাক্ত হুঙ্কার ছুঁড়ে দেয়'।

২৬. এ কবিতা থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম।

২৭. নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার মতো শামসুর রাহমানের 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' এবং 'স্বাধীনতা তুমি'র কবিতা জাতীয় মানসকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল।

২৮. 'ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী
গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে

মার্চপোস্ট ক'রে চ'লে যাবে..(তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা', *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* )।

২৯. 'কারো একলার নয়', *মঞ্চের মাঝখানে।*

৩০. 'লানতের পঙক্তিমালা', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল।*

৩১. *রৌদ্র করোটি*'র 'আমার মাকে' কবিতায় রয়েছে চিরচেনা মাকে নিয়ে এক অদ্ভুত টানাপোড়ন, মা ও সন্তানের নিবিড় সম্পর্কের মাঝে দ্বৈত-সত্তার দ্বিধা। এর মধ্যে তিনি মা এবং স্বদেশকে একাত্ম করে তোলেন চকিতে : 'স্বদেশের স্বতন্ত্র মহিমা/অনন্য উপমা তাঁর'। *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা* কাব্যগ্রন্থের 'যদি ফিরে আসি' কবিতায় মুখোমুখি দুই মা, একদিকে গর্ভধারিনী, অন্যদিকে প্রতিপালিনী স্বদেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় কবি মায়ের আপত্তির মুখে যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি, সেই প্রসঙ্গ তুলেই তিনি কবিতার বিষয় বয়ানে অগ্রসর হয়েছেন। এখন আর কোনো নিষেধাজ্ঞা তিনি মানতে চান না, সবার পূজ্য প্রতিমার মতো স্বদেশ সামনে দাঁড়িয়ে—'...এখন তোমার আমার,/আমাদের পূর্বপুরুষ আর উত্তরপুরুষদের/সবার মা, জননী জন্মভূমি আমাকে/ ডাক দিয়েছে এই সকালে।' এই 'দানব দলনে' অংশগ্রহণের প্রয়োজনে যে অবাধ্যতা তার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী গর্ভধারিনীর কাছে। *এক ধরনের অহংকার* কাব্যগ্রন্থে প্রিয় নারী 'সুদীপ্তা মোহিনী', যার দেহের রেখা খুঁজেছেন নিসর্গের ভিড়ে, একসময় উপলব্ধি করেছেন এই প্রিয় নারী, প্রকৃতি ও স্বদেশ অভিন্ন সত্তা—'পাখি, মাছ কিংবা সুপুরির গাছ, সারি সারি, চোখে/পড়লেই মনে পড়ে তোমার সত্তার দৃশ্যাবলি,/স্বদেশের মুখ আর তোমার সজীব প্রতিকৃতি/অভিন্ন জেনেছি। *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে* কাব্যগ্রন্থের 'জন্মভূমিকেই' কবিতায় প্রেয়সীকে দেখেছেন নিসর্গের সঙ্গে নিবিড় করে। যে মেয়েটি নতুন করে বাঁচার মানে শিখিয়েছিল তাকে স্তব করে বলেন —'কিন্তু মেয়ে তোমাকে ভালোবেসে/ হৃদয়ে চাই জন্মভূমিকেই।' *মঞ্চের মাঝখানে* কাব্যের 'কারো একলার নয়' কবিতায় স্বদেশের প্রতি দুর্নিবার রূপজ মোহের চিত্রায়ন দেখা যায়।

৩২. শামসুর রাহমান দেখেছিলেন, বাংলা নামের সেই অভিন্ন মানচিত্র পূর্বের মতোই বিপন্ন, স্বপ্নের ভেতরে নতুন দেশের জন্য যত আয়োজন ছিল, বাস্তব পরিস্থিতি ছিল ঠিক তার বিপরীত, তবু এই দুস্থ স্বদেশকে তিনি স্বীকার করে নিতে চান—'এও তো বাংলাই এক, তোমার ধ্যানের বাংলাদেশ/ হোক বা না হোক' ('এ-ও তো বাংলাই এক', *এক ধরনের অহংকার*)।

৩৩. দ্রোহের কবিতার তালিকায় এ কাব্যের নাম কবিতাসহ 'একটি মোনাজাতের খসড়া', 'রাজা তুমি', 'গল্পটি আমার প্রিয়' কবিতাসমূহ রয়েছে।

৩৪. 'স্বদেশে ফেরার পর', *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই।*

৩৫. কবি নতুন করে আশঙ্কায় আক্রান্ত হন 'কবি আর বুদ্ধিজীবী হননের কাল ফের শুরু/হলো বুঝি!' ('অশনি সংকেত', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)।

৩৬. 'বলো তো তোমাকে ছেড়ে',' জিন্দা লাশ', 'জ্বলছে স্বদেশ', 'এখানেই আছে ঘর' (*তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)—কবিতাসমূহে পুলিশি নির্যাতনের কথা উঠে এসেছে।

## চতুর্থ অধ্যায়

# শামসুর রাহমানের কবিতায় পুরাণচেতনা

শুরুতেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, অর্থতাৎপর্যের বিচারে পুরাণ ও মিথ কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে অথবা তারা পরস্পর কতটা বিপরীতগামী, সে-বিতর্ক বর্তমান অভিসন্দর্ভের অন্বিষ্ট নয়; মিথ ও পুরাণকে সমার্থক অর্থে গ্রহণ করে ব্যাপক অর্থে প্রাচ্য, প্রতীচ্য, ইসলামী ঐতিহ্য, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি, রূপকথাকে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরাণ কী? পুরাণের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় ও পরিধি নির্ধারণ বিষয়ে নানা বিতর্ক প্রচলিত রয়েছে; আভিধানিক অর্থে পুরাণ হচ্ছে পুরাতন বা আদি, পুরাণ পুরনো হলেও তার রয়েছে চিরন্তনী চারিত্র্য, এ কারণে যুগে যুগে উজ্জীবনী শক্তি নিয়ে শিল্প-সাহিত্যে সজীব হয়ে ওঠে পুরাণ, তার অবয়বে নতুন অর্থতাৎপর্য প্রযুক্ত হয়। ল্যাজারস বা ওসিরিসের মতো পুরাণ জীর্ণতার প্রত্ন-খোলস ভেঙে নতুন যুগের নতুন জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন রূপে অঙ্কুরিত হতে পারে অনায়াসে। আধুনিক বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে পুরাণ-প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোতভাবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের আধুনিক কবিতার উত্তরাধিকার বহন করা কবিসমাজ নানাভাবে পৌরাণিক ঘটনা-চরিত্রের কাছে ঋণগ্রস্ত, শামসুর রাহমানও এ ঋণ স্বাচ্ছন্দ্যে স্বীকার করেছেন তাঁর কবিতায়। শামসুর রাহমানের সমগ্র কাব্য-পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, গ্রিক পুরাণের পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণের ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে ইসলামী ঐতিহ্য, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মের পৌরাণিক অনুষঙ্গ ও আখ্যায়িকা, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি ও রূপকথা ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন তাঁর কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে, কখনো কবিতার শিরোনামে এবং কখনো কবিতার ছত্রে-ছত্রে, শব্দে-শব্দে সংযুক্ত হয়েছে পৌরাণিক অনুষঙ্গ, যেগুলো বিচ্ছিন্ন হলেও প্রাসঙ্গিক এবং সে-সবের একটা আলাদা কাব্যমূল্য রয়েছে। বিশ্বকবিতায় টি. এস. এলিয়ট প্রবর্তন করেছিলেন 'পৌরাণিক পদ্ধতি', এ পদ্ধতিতে আপাত বিচ্ছিন্নতার ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সংযোগের সূত্র, পৌরাণিক পদ্ধতির সূত্রেই *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ডের* অন্তর্গত বয়ানের সাথে মিশে আছে বাইবেল, উপনিষদ, বৌদ্ধ এবং গ্রিক পুরাণের নানা প্রসঙ্গ—বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত আপাত বিচ্ছিন্ন পৌরাণিক অভিজ্ঞান-প্রয়োগের ভেতরের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা কাব্যের সামগ্রিক রূপকে পৌরাণিক-পদ্ধতির বৃত্তে আবদ্ধ করেছে, বাহ্যিকভাবে এই সূক্ষ্ম যোগসূত্র আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য। এলিয়টের পুরাণ-প্রয়োগ প্রবণতা এবং পৌরাণিক পদ্ধতি তিরিশের আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাস্নাত হয়ে বাংলাদেশের কবিতায় ছায়া ফেলে, সেই উত্তরাধিকার শামসুর রাহমানের কবিতায় পুরাণ-অভিজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রেরণা সঞ্চার করে। এলিয়ট ও শামসুর রাহমানের পুরাণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে

সাদৃশ্য রয়েছে, উভয়ের উচ্চারণ আধুনিক যন্ত্রণাকাতর সময়ের গণ্ডীতে, অবশ্য তাঁদের পৌরাণিক ভাবনার তাৎপর্য ভিন্ন। দার্শনিক উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক মুক্তি এলিয়টের পুরাণ ব্যবহারের মৌল প্রেরণা, অন্যদিকে শামসুর রাহমানের কবিতা শেষ ছত্র পর্যন্ত মানব জীবনাভিজ্ঞতার ভেতরে কেন্দ্রীভূত হতে চায়—এলিয়ট ও শামসুর রাহমানের পৌরাণিক ভাবনার মূলগত পার্থক্য এখানেই। বাংলা কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গ কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন নজরুল, তবে পদ্ধতিগতভাবে বাংলা কবিতায় পুরাণের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে করেন বিষ্ণু দে, পুরাণ ব্যবহারের প্রবণতা বিচারে আমরা শামসুর রাহমানকে বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে'র উত্তরসূরিরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

এলিয়টের মতো শামসুর রাহমানও কাব্যযাত্রা শুরু করেছেন চেতনায় পুনরুজ্জীনবাদকে ধারণ করে, কেননা নষ্ট, যন্ত্রণাকাতর, বীভৎস-কালের অনুশাসন থেকে মুক্তির জন্য নতুন জন্মের বিকল্প নেই। শামসুর রাহমান কাব্যচর্চার শুরুতে পুনরুজ্জীবনবাদী যে চেতনাকে আশ্রয় করেছিলেন তা কোন ধর্মীয় আদর্শবাদের প্রচারণা নয়, শিল্পের অনুশাসনে লালিত তার কবিচিত্ত সৃজনশীলতার নতুন পথ অনুসন্ধান করেছিল পুনরুজ্জীবনবাদী পুরাণকে কেন্দ্রে রেখে। তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*, অর্থাৎ প্রথম মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। পুনরুজ্জীবন ব্যতীত দ্বিতীয় জীবনে প্রবেশ করা সম্ভব নয় এবং তিনি যে প্রকৃতই পুনরুত্থিত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যখন তিনি ল্যাজারস প্রসঙ্গের অবতারণা করেন; সেইসঙ্গে তিনি প্রথম জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃত, তার প্রমাণ মেলে 'লিথি' নদীর উল্লেখে—লিথি বিস্মরণের নদী, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম নেয়ার পূর্বে এই নদীর প্রভাবে প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা-বিস্মৃত হয় মানুষ। ল্যাজারস ও লিথি নদীর পৌরাণিক অনুষঙ্গের ভেতর দিয়ে শামসুর রাহমানের সত্তা পুনরুজ্জীবনবাদে স্নাত হয়ে কবিতার পথে যাত্রা শুরু করেছে, এই 'সত্তা' কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নয়, মানবসত্তা এবং আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কবিসত্তা।

শামসুর রাহমান পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনার বিকাশে এলিয়টের পৌরাণিক ভাবনার কাছে নিশ্চিতভাবে ঋণী, কারণ এলিয়ট তাঁর *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* কাব্য যেভাবে শুরু করেছেন তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় অ্যাডোনিসের পুনরুজ্জীবনবাদী পুরাণকে :

> April is the cruelest month, breeding
> Lilacs out of the dead land, mixing
> Memory and desire, stirring
> Dull roots with spring rain.[1]

এপ্রিল এলিয়টের কাছে নিষ্ঠুরতম মাস, কারণ এ মাসেই যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, ফলে এ মাস যেমন বেদনার-ভোগান্তির, তেমনি এই মাসেই প্রকৃতিতে মৃত উদ্ভিদের ভেতর নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* কাব্যটি যাত্রা শুরু করেছে অ্যাডোনিস মিথের নির্যাস নিয়ে, '...this opening passage there is resurgence of life in the waste land, but the rebirth is painful after the oblivion of winter'( Jain, 1991: 152); শামসুর রাহমান তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় উচ্চারণ করেছিলেন : 'মনে হয় আমি সেই লোকশ্রুত ল্যাজারস,/ তিনদিন ছিলাম কবরে, মৃত—পুনরুজ্জীবনের/ মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে।' এখানে তিনি জন্ম-মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কথকতা নিয়ে উপস্থিত, এখানকার কবিতায় যন্ত্রণাকাতরতা আছে, পুনরুত্থিত জীবন যে সুখকর হয়ে ওঠেনি তার প্রমাণ ছড়িয়ে পড়েছে *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের পরতে পরতে। ল্যাজারস এসেছে খ্রিস্ট ধর্ম থেকে, ল্যাজারস-পুরাণকে তিনি উপস্থাপন করে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন, অন্যদিকে এলিয়ট তাঁর কবিতায় ব্যক্তির অন্তর্গত দহনের কথাই বলেছেন, তবে তা শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্ম-দর্শনের আশ্রয়ে প্রশান্তি লাভ করেছে।

শামসুর রাহমানের পুরাণ ব্যবহারের প্রবণতাকে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে, যার একদিকে রয়েছে পুরাণের বিষয়ভিত্তিক নির্মাণ, অন্যদিকে চরিত্রকেন্দ্রিক প্রয়োগ। শামসুর রাহমানের কবিতায় বিষয়ভিত্তিক পুরাণের প্রয়োগ ঘটেছে নিম্নোক্তভাবে : পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনা নির্মাণে পুরাণ, কবিতা বিষয়ক কবিতা নির্মাণে পুরাণ, প্রেমভাবনার রূপায়ণে পুরাণ, সমকালীন সংকটের স্বরূপ সন্ধানে পুরাণ, রূপকথা ও কিংবদন্তির নবায়ন, জ্ঞাত্যর্থ নির্মাণে পুরাণ, রূপান্তরিত পুরাণ, সমন্বিত পুরাণ, ঋষি সমাচার, বৌদ্ধ পুরাণ এবং মৃত্যু চেতনা রূপায়ণে পুরাণ।

চরিত্রকেন্দ্রিক পুরাণের ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন বিশেষ কিছু পৌরাণিক মুখ, যে মুখগুলো যুগধর্মকে আত্মস্থ করে কখনো হয়ে উঠেছে শিল্পিসত্তার প্রতীক, কখনো পিতৃপ্রতিমা। অনেক সময় এসব চরিত্র সমকালীন সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নেতৃত্বের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছে, নির্দেশ করেছে মুক্তির পথ।

**পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনা**

শামসুর রাহমানের কবিচৈতন্যে পুনরুজ্জীবনবাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে, ল্যাজারস পুরাণের ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে পুনরুজ্জীবিত সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন এক বিশেষ কারণকে সামনে রেখে–

সৃজনশীলতার পথ-পরিভ্রমণে সংকল্পবদ্ধ কবি সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিলেন, তাঁর প্রথম মৃত্যু তাঁর নিজেরই মনোনীত, এ মৃত্যু মনোগত। জীবন-মৃত্যুর দ্বৈততায় সৃষ্ট জীবের জীবনচক্র, পৌরাণিক উপলব্ধি থেকে তিনি ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন জীবন-মৃত্যুর সীমা, এজন্য মৃত্যু তাঁর কাছে সমাপ্তির সূচক নয়, বরং নতুন করে সূচনা —যেমনটি এলিয়ট বলেছিলেন : 'Death is life and life is death' (Eliot, 1969 : 125) অথবা 'In my end is my beginning' (Eliot, 1969 : 183)—একই প্রত্যয় নিয়ে শামসুর রাহমান কাব্যজগতে প্রবেশ করেন। জোসেফ ক্যাম্পবেল জীবন, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন : 'কেউ জীবন হারালে জীবন লাভ করে...একেবারে যখন দেবতার মতো আপনি মৃত্যুর পথে চলে যান তখন মিথের ব্যাখ্যায় কিন্তু আপনি জীবনের পথেই রওনা দেন।...জীবন পেতে হলে আপনাকে মৃত্যুকেও পেতে হবে।' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ১৬৫-১৬৬) শামসুর রাহমানের কবিসত্তায় যে পৌরাণিক অভিজ্ঞান সক্রিয় ছিল, সেই নির্যাসে স্নাত হয়ে *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে তিনি পুনরুত্থিত ল্যাজারসের চিত্রকল্পে প্রতিস্থাপন করেছেন নিজেকে, আবার যখন জন্মেছেন সে জন্ম নান্দনিক অভিলাষ পূরণের অভিপ্রায়ে, এ জন্মের সঙ্গে পুরাণের সরাসরি সংযোগ থাকলেও সেটি এলিয়টের মতো 'স্পিরিচুয়াল রিবার্থ' নয়, এ হলো চৈতন্যের রূপান্তর।

শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* পৌরাণিক নির্জ্ঞান-সমৃদ্ধ, রূপান্তরিত নব চৈতন্যের ফসল, এ কাব্যের নামকরণ এবং নামকবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একটি শব্দকে বিশেষভাবে বিদ্ধ করেছে—'ল্যাজারস'। এই পৌরাণিক চরিত্রটিকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন আত্মপ্রতিকৃতি নির্দেশের প্রয়োজনে, 'তিনি চৈতন্যের মৃত্যুজগৎ পেরিয়ে নতুনত্বে উত্থিত হন বারংবার—শিল্পরচনায় নিবেদিত থাকার জন্য, তাই ল্যাজারস মিথপ্রতীক তাঁর যথার্থ উপমা' (কামাল, ১৯৯৯ : ৪২)। ল্যাজারস-পুরাণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা সক্রিয় থেকেছে তাঁর সম্পূর্ণ কবিজীবন জুড়ে, তিনি কাব্যচর্চার শুরু থেকে পুরাণ-স্মৃতিমথিত এবং এই মন্থন কেন্দ্রে রয়েছে ল্যাজারস অর্থাৎ পুনরুজ্জীবন-সমাচার। প্রশ্ন হলো, সহজ-স্বাভাবিক প্রথম জীবনকে বাতিল করে দিয়ে পুরাণের পথ ঘুরে কেন শামসুর রাহমান দ্বিতীয় জীবনকে নির্বাচন করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি রেখেছেন কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে, কবিতার অন্তর্গত বয়ানে—নতুন জন্ম 'গানে'র জন্য, এই গানকে ধরে নেয়া যেতে পারে কবিতার প্রতিরূপক হিসেবে। কারণ, গীতিময়তা কবিতার শাশ্বত চারিত্র্য, বাংলা কবিতার আদিরূপ, *চর্যাগীতিকার* কবিতাবলি গানই ছিল; ধ্বনি-মাধুর্য, বাক্-ব্যঞ্জনা ও ছন্দের সম্মিলনে কবিতা গানও বটে। এই গান পরিবেশনের জন্য দ্বিতীয় জীবনে তিনি প্রবেশ করলেন অর্থাৎ পার্থিব মানুষের

ইহজাগতিক কর্মপন্থা থেকে নিজের সৃজনের পথকে বিযুক্ত করলেন, নতুন পথ-নির্মাণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কবির পুনর্জন্ম, 'আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসের সাহস অর্জন করতে গেলে প্রয়োজন হয় একটি মৃত্যু এবং একটি পুনর্জাগরণ' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ১৮৪)। নেতি ও অস্তির দ্বন্দ্বমুখর প্রতিবেশের ভেতর তিনি নিজেকে চিহ্নিত করলেন 'ধিকৃত শিল্পের শহীদ' ('ওই মৌন আকাশের') হিসেবে। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* তাঁর শিল্পের সাধনকথা, সৃজনের জগতে জাগরণ এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা পাবার পূর্বলেখ। সৃজন-মননের জগতে বিচরণের ক্ষেত্রে পুরাণ তাঁকে দিয়েছে কবিতার বিষয় নির্মাণের অনেক উপকরণ—পুরাণ এখানেই অনন্য যে, কোন স্বত্বাধিকারীর একচেটিয়া দখলে সে নেই, দেশ-কালের গণ্ডী কেটে তাকে আবদ্ধ করা যায় না, ভূগোল ও সময়ের সীমা ভেঙে নতুন রূপে সে বারবার প্রবেশ করে শিল্পীর মনোজগতে, সব দেশের সব শিল্পী পান পুরাণ নামক বিশ্বশক্তির সমান উত্তরাধিকার। পুরাণকে বলা যায় 'উপমা-উদ্ভাসিত জীবনবোধ, যার মধ্যে বিশ্বশক্তি আলোর মতো জ্বলতে থাকে' (রায়, ১৯৯৪ : ১৬)। এ কারণে শামসুর রাহমান তাঁর পুনরুজ্জীবিত জীবনের উপযুক্ত প্রতিকল্প হিসেবে বাইবেল থেকে ল্যাজারস-পুরাণ এত স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। তবে, *বাইবেলের* ল্যাজারসকে যিশু পুনরুত্থিত করলেও শামসুর রাহমানের উদ্ধারকর্তা যিশু নন, 'স্বর্গদীপ্ত' প্রাণ নিয়ে পুনর্জীবিত কবি তাঁর প্রতিবেশ-পৃথিবীকে দেখেছিলেন নরকসদৃশ, '...ল্যাজারসের পুনর্জীবনের উল্লাস ছাপিয়ে উৎকটিত হয়ে থাকে তার মৃত্যুর বাস্তবতা, তিনদিন কবরে অবস্থানের সত্য' (রহমান, ২০০ : ১৯০)। কবি যন্ত্রণা-সংকুল প্রতিবেশ ও বস্তু-জগৎ ব্যাখ্যায় যতটা আগ্রহী, তারচেয়ে নিজের ব্যক্তিক অবস্থান বিশ্লেষণে ছিলেন অনেক বেশি স্বতঃপ্রণোদিত। এজন্য তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল পুনরুজ্জীবনের ছদ্ম-প্রতাপ, পৌরাণিক আশ্রয়; যেখানে বৃহত্তর জীবনানুভূতির আবর্তে যুগ-যুগান্ত ধরে সঞ্চিত হয়েছে ব্যক্তিমানুষের বেদনা-ভাষ্য। বেদনার্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের কানাগলিতে শামসুর রাহমান 'অনন্তের একবিন্দু আলো'র সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যগ্রন্থের 'কোনো একজনের জন্য' কবিতায় :

> অনিদ্রার বিভীষিকায় তুমি এলে
> অনন্তের একবিন্দু আলো
> বাহুতে উজ্জীবনের শিখা, উদ্ধারের মুদ্রা উন্মীলিত
> (*প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

এখানে 'দুর্গন্ধ-ভরা গুহায়িত রাত' কবরসদৃশ, সেখান থেকে কবিকে মুক্ত করতে এসেছিলেন 'একজন' যার 'বাহুতে উজ্জীবনের শিখা', উজ্জীবনী-শক্তির উৎস এই 'একজনকে' আপাত দৃষ্টিতে

কবির দয়িতা বলে বিভ্রম হতে পারে। এই 'একজনে'র মায়াস্পর্শে বদলে গেল কবির রুক্ষ-কঠিন বস্তুজগৎ:

কে জানত এই খেয়ালি পতঙ্গ, শীতের ভোর,
হাওয়ায় মর্মরিত গাছ,
ঘাসে-ঢাকা জমি, ছায়া-মাখা শালিক
প্রিয় গানের কলি হয়ে মঞ্জরিত হবে
ধমনিতে, পেখম মেলবে নানা রঙের মুহূর্ত।

('কোনো একজনের জন্য', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

উজ্জীবনের পূর্বে 'শীর্ণ হাহাকার ছাড়া গান ছিল না মনে', ছিল শুধু 'মৃত্যুপ্রতিম স্মৃতির সরীসৃপ', সেখান থেকে উদ্ধারকৃত কবি সহসাই খুঁজে পেলেন 'প্রিয় গানের কলি'; সেটি ঠোঁটে নয়, 'ধমনিতে'। কে এই 'একজন', যাকে কবি নিজেও কোন নাম বা ব্যক্তি-পরিচয়ের গণ্ডীতে বাঁধতে পারেননি? এ হচ্ছে কবির চৈতন্য, যে চৈতন্য 'নিঃসঙ্গ কবিকে দেয় জীবনের গাঢ় মদ—শব্দের প্রাসাদ' ('সুন্দরের গাথা', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। শামসুর রাহমান তাঁর চৈতন্য-নিঃসৃত বাণীকে বলতে চান 'গান', এজন্য অ্যাপোলোর তাঁর আরাধ্য দেবতা। কারণ অ্যাপোলো যৌবন ও আলোর দেবতা তো বটেই, সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও পূজিত।[২] *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যগ্রন্থ কবির চৈতন্য-নিঃসৃত গানকে প্রতিষ্ঠা দেবার সুচিন্তিত প্রয়াস : 'অস্ত্র আমার নেই কিছু শুধু গান নিয়ে আমি/ সংসার রুখে দাঁড়ালে কঠিন প্রান্তরে নামি' ('যুদ্ধ')। ব্যক্তিক, দৈশিক অথবা বৈশ্বিক যে কোন সংকটে কবিতাই তাঁর প্রথম এবং শেষ অস্ত্র, পুরাণ তাঁর কবিতাস্ত্রকে করেছে শাণিত, দিয়েছে সময়োপযোগিতা।

শামসুর রাহমান পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনা অর্থাৎ ধ্বংস ও মৃত্যুর ভেতর থেকে নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনাকে রূপদানের সংকল্পে যেসব পৌরাণিক চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন কবিতার প্রেক্ষাপটে, তার মধ্যে অন্যতম যিশু, ল্যাজারস, অর্ফিয়ুস এবং ভারতীয় পুরাণের শিব। শিব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'মহাদেবের অন্য নাম রুদ্র বা মহাকাল, কারণ তিনি সর্বসংহারক। কিন্তু এই সংহার হতেই আবার তাঁর অভ্যুদয় হয়। সে জন্য শিব বা শঙ্কর নামে তিনি জননশক্তি' (সরকার, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ : ৪১৮)। শিবের মতো কবি ধ্বংস ও সৃষ্টির পুরাণকে স্পর্শ করে নির্মাণ করেন তাঁর সৃজনশীল সত্তাকে, যে সত্তাকে আলোকসন্ধানী করে তোলে শিবের তৃতীয় নয়নের মতো কবির আরেক নয়ন, এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে তিনি ভেদ করেন বস্তুবিশ্বের অন্তরলোক এবং সেই অন্তরলোক থেকে আহরিত উপলব্ধিকে রূপান্তর করেন কবিতায়, কবিতা ছড়িয়ে পড়ে বস্তুবিশ্বে এবং সবশেষে আশ্রয় পায় পাঠকের চৈতন্যলোকে, কবিতার এই জন্মচক্রের কেন্দ্রে শিবের মতো সক্রিয় থাকেন কবি।

পুরাণের অসীম সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে শামসুর রাহমান পুরাণ-প্রয়োগে হয়েছেন বিচিত্রগামী : কবিতা বিষয়ক কবিতা নির্মাণ, প্রেমের বাসনাসিক্ত উচ্চারণ, স্বদেশ ও সমকালের সংকট রূপায়ণ—প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি পৌরাণিক অনুষঙ্গ অবলম্বনে কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন; কখনো কখনো শরীর-অতিক্রমী শক্তি নিয়ে পুরাণ পৌঁছে গেছে কবিতার অন্তর্সত্তায়, পুরাণকে ভেঙে-চুরে বিচূর্ণিত রূপ ছেঁকে নিয়েছেন নির্যাস, কাব্যভাবনাকে পূর্ণতা দেবার অভিপ্রায়ে ঘটিয়েছেন রূপান্তর, কখনো পুরাণের সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছেন শব্দঋণে, কখনো কখনো কবিতা-কাঠামো নান্দনিক তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে পুরাণের আলঙ্কারিক প্রয়োগে।

**কবিতাবিষয়ক কবিতায় পুরাণ**

'কবিতাবিষয়ক কবিতা রচনা শামসুর রাহমানের একটি প্রধান সংরাগ। আত্মপ্রতিকৃতি রচনায় যেমন তাঁর অশেষ উৎসাহ, পুরাবৃত্ত 'আমি' উচ্চারণ যেমন তাঁর স্বভাব, তেমনি কবিতা ও নিজের কবিতা-সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে কবিতা রচনা তাঁর এক বড়ো বৈশিষ্ট্য' (আজাদ, ১৯৮৩ : ১০০)। কবিতার প্রয়োজনে শামসুর রাহমান এলিয়টের কাছে ঋণী, এলিয়টের *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের গভীরে রয়েছে মৃত্যু ও পুনর্জীবনকেন্দ্রিকতা, শামসুর রাহমানের কবিতাও পুনরুজ্জীবনবাদের কথা বলেছে, তবে দুজনের বিশ্বাস আলাদা। *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* কাব্যে এলিয়ট শুদ্ধিকরণ বা মানবাত্মার মুক্তি দেখেছিলেন ব্যাপটিজমের ভেতরে, শামসুর রাহমান পুনরুজ্জীবন-চেতনার ভেতরে খুঁজেছিলেন তাঁর নিজস্ব কবিসত্তার মুক্তি। এলিয়টের 'Death by Water' শিরোনামটি ব্যাপটিজম পরবর্তীকালে পূর্বজীবনের জীর্ণতা ও গ্লানি থেকে মুক্তির এবং নতুন জীবনের ইঙ্গিতবাহী, জল এখানে পুনর্জন্ম বা মুক্তির প্রতীকরূপে এসেছে : 'There could also be an allusion to the Christian sacrament of baptism, where water is the agent of the death of the old self and of spiritual rebirth.' (Jain, 1991 : 143) শামসুর রাহমানের কাছে পুনর্জন্ম 'স্পিরিচুয়াল রিবার্থ' নয়, বরং কবিতায় সমর্পিত সত্তার আত্মশুদ্ধি, তিনি শুদ্ধি-পথ সন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন। শুদ্ধির প্রশ্নে ভারতীয় অঞ্চলে অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সীতা অথবা বেহুলা—এরা চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রশ্নে অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছেন, একইভাবে শামসুর রাহমান অগ্নিশুদ্ধির ভেতর দিয়ে আত্মশুদ্ধ হতে চান, 'কবিতার নীলাম্বরী ক্রোড়ে' আশ্রয় লাভের অভিপ্রায়ে তাঁর এই স্বেচ্ছা-শুদ্ধি। কবিতার প্রয়োজনে তিনি যে কোন পরীক্ষায় বসতে প্রস্তুত, কবিতার শুদ্ধচারী প্রতিমা নির্মাণে হতে চান অগ্নিশুদ্ধ কারিগর :

শিড়দাঁড়া খাড়া হাসিমুখে অগ্নিশুদ্ধ হবো ভোরে,
নামুক আত্মা-জুড়ানো পানি ভস্মময় ওষ্ঠ জুড়ে;
আমাকে শুইয়ে দাও কবিতার নীলাম্বরী ক্রোড়ে।
('দাবানল', *খণ্ডিত গৌরব*)

'আধুনিকতার বড় অংশই হল আত্মশুদ্ধির সন্ধান করা—ধর্মীয় অর্থে নয়, নান্দনিক অর্থে' (কামাল, ১৯৯২ : ১৪৮)। 'আত্মশুদ্ধি'র আকাঙ্ক্ষা যখন 'অগ্নিশুদ্ধি'র ভেতর দিয়ে পরিস্নাত হতে চায়, তখন সেটি পৌরাণিক মাত্রা অর্জন করে, তবে শেষ পর্যন্ত এ সবই কবির নান্দনিক অভিলাষ। 'আত্মশুদ্ধি' শিরোনামের কবিতায় তিনি শুদ্ধি বলতে 'অগ্নিশুদ্ধি'কে নির্দেশ করেছেন, আগুনে পুড়ে ছাই-ভস্মের ভেতর থেকে ফিনিক্স পাখির মতো উত্থান ঘটে খাঁটি সত্তার : 'অনন্তর নিভে যাওয়া অঙ্গার এবং ভস্ম থেকে/ প্রকৃত হীরক দীপ্তি চোখ মেলে চায়' ('আত্মশুদ্ধি', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)। কবিতার কঠিন প্রান্তরে নেমে কবি যে প্রতিষ্ঠা পেতে চান, তা সহজলভ্য নয় বলেই অগ্নিশুদ্ধির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আত্মশুদ্ধ কবি উঠে আসেন সমষ্টির চেতনার গম্বুজে, ব্যক্তিগত সুখ, প্রত্যাশা-প্রাপ্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে কবি নির্মাণ করেন এমন শিল্পচৈতন্যের জগৎ, যেখানে তিনি নায়ক, পথ-প্রদর্শক, তাঁর উচ্চারিত প্রতিনিধিত্বশীল ধ্বনিমালা হয়ে ওঠে অনেকের জন্য অনুসরণীয়। চেতনার বিশুদ্ধিকরণ শামসুর রাহমানের একমাত্র লক্ষ নয়, তিনি শুদ্ধিকৃত চেতনাকে বিরামহীন সৃজনকর্মে নিযুক্ত করতে চান :

ভেঙেচুরে নিজেকে নতুন করো বারবার, বাহুল্যের ঝুঁটি
ছেঁটে ফেলে বুকে নিয়ে প্রকৃত শাঁসের অরুণিমা সৃজনের
পথে হাঁটো প্রতিদিন, ফোঁটাও মৃত্যুর ঠোঁটে সজীব কুসুম।
('চাদর', *স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*)

'মৃত্যুর ঠোঁটে সজীব কুসুম' তুলে দিয়ে তিনি মৃত্যুর ভেতর থেকে টেনে আনেন আবার সেই পুনরুজ্জীবনবাদী প্রত্যয়, জীবনের আকাঙ্ক্ষা, স্মরণ করিয়ে দেন কবিতার জন্যই তাঁর পুনর্জন্ম। কবিতার একনিষ্ঠ সাধকের হাতে কবিতা নিজেকে করে পূর্ণ সমর্পণ, তখন বর্ণে বর্ণে গেঁথে তোলা শব্দের ওপর শল্যবিদ্যা প্রয়োগের যথেচ্ছ অধিকার জন্মায় কবির, ফলে তিনি পেয়ে যান কবিতার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার :

এবং টেবিলে ঝুঁকে কয়েকদিনের
পাতাজোড়া কাটাকুটি থেকে
একটি নিঃসঙ্গ হরিণকে মৃগনাভিসুদ্ধ বের

করে নিয়ে আসি, দেখি তার টলটলে
চোখে কাঁপে জন্মজন্মান্তর।

('প্রতীকী চিত্রের মতো', *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার*)

কবির অসাধ্য বলে কিছু নেই, কবিতায় যে মৃগনাভি হরিণকে জন্ম দেন, তার চোখে পুরাণের ছায়ালোক। কবিতার মতো কবি প্রতিকৃতি নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন, সেই অবয়ব কখনো কল্পিত গৌরবে ভাস্বর, কখনো সেখানে তাঁর নিজের কবিসত্তা প্রচ্ছন্ন ছায়া বিস্তার করেছে :

শস্যক্ষেতের ফসল ছাপিয়ে
জেগে উঠেছে হরফ আলিফ-এর মতো তাঁর
ঋজু আর অনন্য শরীর।

('কালদীর্ণ কোকিলের মতো', *অবিরল জলভ্রমি*)

কবির চারিত্র্য নিগুঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন একজন কবি। শামসুর রাহমান 'কালদীর্ণ কোকিলের মতো' একজন অনড়, ঊর্ধ্বশির কবির কথা বিবৃত করেছেন কবিতায়, যার অস্থি-মজ্জার সঙ্গে গেঁথে ছিল কবিতা, ফাঁসিতে মৃত্যুর পর যার 'প্রতিটি রোমকূপ থেকে বিচ্ছুরিত হলো কবিতার পর কবিতা', এ কবি যেন শামসুর রাহমানের আত্মপ্রতিকৃতি।[৩] সেই কবির কঠোর, অনমনীয় প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে গিয়ে প্রতিতুলনা করেছেন আরবি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ আলিফের সঙ্গে।

কবিতাচর্চা এক নিরন্তর সাধনা, সেই সাধনায় সিদ্ধি আসে কবির শ্রমে ও ঘামে, সেদিক থেকে প্রকৃত কবিকে শামসুর রাহমান কায়িক শ্রমে ক্লান্ত চাষীর প্রতিকৃতিতে দেখেছেন, ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনে চাষীর মতো শ্রমনিষ্ঠতা কবিরও প্রয়োজন : 'কবিও কর্মিষ্ঠ চাষী, রোজ চষে হরফের ক্ষেত/ নুয়ে নুয়ে, কখনো কখনো খুব আতশি খরায়/ জলসেচে মগ্ন হয়, বোনে কিছু বীজ অলৌকিক' ('জমিনের বুক চিরে', *খণ্ডিত গৌরব*)। প্রকৃত কবি হয়ে ওঠা সহজসাধ্য নয়, কাব্যসাধনা এক কঠিনতম পথ, কবিতা এমন এক অধরা শৈল্পিক উপলব্ধি, যে উপলব্ধিকে শাণিত করার প্রয়োজনে নিজের সত্তাকে উৎসর্গ করতে হয় কবিতাদেবীর পদতলে। কবিতার সাধনা কতটা সুকঠিন, কতটা যন্ত্রণা-মথিত সে কথা তিনি বলেছেন 'কোন গায়িকার জন্যে' কবিতায় :

আমার হৃদয়ে শত শত উন্মাতাল বুলবুলি
মৃত্যুর দিঘিতে চঞ্চু ডোবালে এবং সর্পাঘাতে
লক্ষবার লখিন্দর ভাসলে ভেলায় গাঙুরের

বিষকালো ঢেউয়ে ঢেউয়ে, আমার একটি পঙ্‌ক্তি জাগে
লাল কমলের মতো,
(*ঝরনা আমার আঙুলে* )

অনেক যন্ত্রণা ও টুকরো-টুকরো মৃত্যুর নানা স্তর পেরিয়ে কবি জন্ম দিতে সক্ষম হন এক একটি কবিতার। কবিতা-সৃষ্টি এবং কবি হয়ে ওঠার পথকে তিনি দীর্ঘ, সংগ্রামময় এবং যন্ত্রণা-সঙ্কুল হিসেবে চিহ্নিত করেন। অগ্রজদের প্রতিসরণে কতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে সে প্রসঙ্গে তিনি টেনে আনেন যিশুকে, যাকে তিনি 'অমৃত পুরুষ' বলে অভিহিত করেছেন, যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যিনি মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন :

তোমাদের পথে পদচিহ্ন
আঁকার জন্যে আমাকে কি নাজেরাথের সেই
অমৃত পুরুষের মতো ঝুলতেই হবে কালবেলায় ক্রুশকাঠে?
('কালবেলায় ক্রুশকাঠে', *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার*)

ক্রুশকাঠে বিদ্ধ হওয়ার অর্থ যন্ত্রণাবিদ্ধ হওয়া, যন্ত্রণা ছাড়া সহমর্মিতা লাভ অসম্ভব, তাই কবিমাত্রই ক্রুশবিদ্ধ হবার অভিজ্ঞতায় স্নাত, কবিতার ইতিহাসে নাম খোদিত করার এটাই একমাত্র পথ কিনা সেটাই কবির আর্ত-জিজ্ঞাসা। শামসুর রাহমান কবিতা রচনায় অনলস, অক্লান্ত – চোরকাটা, বাজারের থলে, রাস্তার কুকুর থেকে শুরু করে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র-তুচ্ছ যে কোন বিষয় তাঁর শ্রমে-যত্নে রূপান্তরিত হয়েছে কবিতায়, তেমনি অকালমৃত কবিতার ক্ষুব্ধ অভিমানের রূপকল্পও হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতার সঙ্গে তাঁর লেনদেন সহজ-সুন্দর-স্বচ্ছ, যেসব কবিতা ছাপার অক্ষরে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে সেসব কবিতা কবির কাছে এবং পাঠকসমাজে কম-বেশি কাব্যমূল্য আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু যেসব কবিতা কবির একান্ত বিশ্বে গুঞ্জরণ তুলে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কবির অনিচ্ছায় বহির্বিশ্বের আলোয় মুখ দেখাতে পারেনি, সেইসব বাতিল পঙক্তি জৈবসত্তার মতো অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে, কবির কাছে কবিতা হয়ে ওঠার মর্যাদা চায়, অনুযোগ প্রকাশ করে বলে : 'আমরা তোমার/ অলিখিত কবিতার পরিত্যক্ত কিছু পঙক্তি, কবি,/ অবহেলা আর উপেক্ষায় আজ আমাদের হয়েছে এ হাল' ('পরিত্যক্ত পঙ্‌ক্তির কথা', *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*)। যেসব অনুভূতি কোন এক সময় মনের ভেতর এসে কবিতার ভ্রূণে পরিণত হয়েছিল, ভ্রূণাবস্থায় যারা গিয়েছিল চলে বাতিলের তালিকায়, তারা আবার কবিতা হয়ে ওঠার মিছিলে স্থান করে নেয়, ভালবেসেই কবি তাদের অনুযোগের ভাষাকে রূপান্তরিত

করেন কবিতায়। যে কোন বিষয় নিয়ে কবিতা লেখার দক্ষতা তাঁকে এনে দিয়েছিল 'অতিপ্রজ' কবির অখ্যাতি, তারপরও শামসুর রাহমান অনেক সময় 'রাইটার্স ব্লকে' আক্রান্ত হয়েছেন, সেই প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে তিনি শরণাপন্ন হয়েছেন শিল্প ও কলার দেবী সরস্বতীর। লেখার ধ্যানকে পূর্ণতা দান এবং লিখতে না পারার সংকট ও শূন্যতাকে অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষায় কবির মন কবিতার জন্য খুঁজে এনেছে উপযুক্ত পুরাণকল্প :

ক. প্রেরণার অনটনে কবি তার
লেখার টেবিলে বসে থাকেন সর্বক্ষণ
যদি সরস্বতী ডানা-অলা পরী মধ্যরাতে
মাথার পেছনে তার উড়ে আসে।
('প্রেরণার প্রতীক্ষায়', *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)

খ. কবিতার খাতা
যেন বীণাপাণির হাঁসের মতো ধ্যানে মগ্ন হয়।
('অযৌক্তিক', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*)

এখানে দেবী বরদাত্রী, দেবীই বিষয়ী। পুরাণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী, তিনি 'সুন্দর ও সত্য বাক্যের প্রেরণকর্ত্রী' (সরকার, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ : ৫৪২)। হাঁস তাঁর বাহন, তিনি বীণাপাণি নামেও সুপরিচিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে এই দেবীর বর প্রার্থনা করেছিলেন সকাতরে : 'তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী' (১ম সর্গ,*মেঘনাদবধ কাব্য*)। কবির 'অক্ষমতায়' দেবীই বয়ে আনেন ভরসার বাণী :

কালো রাত্রির প্রতিটি উজান ঠেলে
বুকের পাঁজরে শব্দের দীপ জ্বেলে
এই প্রার্থনা কার কাছে যায় জানি
ইঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলি :
দয়া চাই দেবী, দয়া কর বীণাপাণি।
('আনন্দ কুসুম', *আনন্দ কুসুম*)

কবিতাচাষের প্রয়োজনে একইভাবে শামসুর রাহমানও কাব্যদেবীর পেছনে কত শ্রম-সাধনা ব্যয় করে করেছেন, তাঁর স্মৃতি-অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি সেই দুরধিগম্য যাত্রার কথা, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*র ভূমিকায় বলেছেন : 'প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাকদেবীর পেছনে পেছনে ছুটে চলেছি। কখনো তিনি আমাকে নিয়ে যান স্নিগ্ধ উপত্যকায়, প্রাচীন উদ্যানে, ঝরনাতলায়, সূর্যোদয়ের ঝলমলে টিলায়, কখনো

বা তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে পৌঁছে যাই চোরাবালিতে।' কাব্যদেবীর বরে সৃষ্ট কবিতার ভেতরে বিম্বিত হয়েছে সুন্দর-বীভৎস-ভয়ঙ্কর নানা মূর্তি, শামসুর রাহমান কবিতাকে প্রায়শই জৈবসত্তার অধিকার দিয়ে করেছেন নিজের মুখোমুখি, প্রতিনিয়ত বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষায় নিমগ্ন কবি সংকট কাটিয়ে ওঠার পর শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে যে কবিতা নির্মাণ করেন সেই কাব্যরূপের ভেতরে কবির চোখে ধরা পড়ে পৌরাণিক নানা আকার ও বৈশিষ্ট্য :

ক. যে তন্বীকে অক্ষরবৃত্তের ছাঁচে এনে শূন্য খাটে
সযত্নে বসাই, সে নিমেষে উগ্রচণ্ডী স্তনের রাক্ষসী হয়
('অনুশোচনার গান', *ধ্বংসের কিনারে বসে*)

খ. ব্রাত্য কুয়োতলায় দাঁড়ানো চণ্ডালিকা,
কবিতার নতুন আঙ্গিক।
('আঙ্গিক', *ধ্বংসের কিনারে বসে*)

গ. ভর দুপুরের
হৈ-হুল্লোড়ে আমার কবিতা
যিশুর রক্তাক্ত শরীরের মতো ঝুলে থাকে ক্রমশ।
('ছায়ায় আমেন', *আকাশ আসবে নেমে*)

ঘ. জেদী কলমের কথা শুনে আমার খাতার শূন্য পাতার
চোখ থেকে বেদনাশ্রু ঝরতে থাকে, যেন সে লখিন্দর-হারানো
বেহুলা, খাতার শূন্য পাতার বুকে ফুটতে থাকে কলমের আঁচড়।
('খাতা আর কলমের বিবাদ', *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*)

কবিতা কবির চেতনার রঙ, তবু সৃষ্ট কবিতা সবসময় কবিকে তুষ্ট করতে পারেনি। কবিতা নির্মিত হবার পর সেটি কেবল সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে বিকশিত হয় নাকি অনাসৃষ্টির বেদনাও সঞ্চার করে? নির্মাণের আনন্দ এবং অতৃপ্তির হাহাকার উভয় অনুভূতি-শাসিত শামসুর রাহমানের অন্তর্জগৎ, এ কারণে তাঁর কবিতা কখনো ভীষণ উগ্র-রুদ্র, কখনো পতিত, কখনো বা রক্তাক্ত-বেদনার্ত। কবিতার বিষয়-নির্মাণের প্রয়োজনে শামসুর রাহমান বস্তু ও ভাবের জগতের প্রতিটি অংশ তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন অবিরত, অবিশ্রান্ত তাঁর কাব্যভ্রমণ কাল থেকে কালান্তরে, ত্রিকালব্যাপী :

যার এই পর্যটন বারবার কখনও আকাশে,
কখনওবা অশেষ রহস্যময় জলজ পাতালে,

তিনিই তো, পথচারী জেনে যায়, ছায়াপথ বেয়ে পুনরায়
মাটিতে আসেন নেমে, জড়িয়ে ধরেন বুকে তার
ক্ষেতের সোনালি ধান। ভেজা তাজা ঘাস আর নবান্নের ঘ্রাণ
তাকে দিয়ে লেখায় নিভৃতে
পৌষের প্রহরে কত গান এবং কবিতা।

('মায়ামৃগ', *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*)

পৌরাণিক দেব-দেবীর মতো কবির বীক্ষণের জগৎ ত্রিকাল-প্রসারিত, মুহূর্তের ব্যবধানে তিনি নিজের অস্তিত্বকে যে কোন কালে স্থাপন করতে পারেন অসামান্য দক্ষতায় এবং আকাশ-পাতাল-মর্ত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞানকে তিনি বয়ে নিয়ে আসেন কবিতায়। কবিতা ছিল তাঁর কাছে নিরন্তর সাধনা, কবিতার খাতার সঙ্গে সম্পর্ক নিত্যদিনের, ব্যক্তিসম্পর্কের মতো এই অধরা সম্পর্কও অম্লমধুর। সুনিবিড় সেই সম্পর্কের গ্রন্থি, আরেক দয়িতা হয়ে কবিতাভাবনা শামসুর রাহমানকে ঘিরে রেখেছে আমৃত্যু।

**প্রেমভাবনায় পুরাণ**

সময় ও সমাজ-সচেতন হবার পর পূর্বজ রোমান্টিক বিষাদ ও ভাবালুতার পরিবর্তে সংকট-মথিত সমকাল ও অস্থির-উদগ্র পারিপার্শ্ব শামসুর রাহমানকে স্বদেশ ও সমষ্টির জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে গভীরভাবে, ফলে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির সমীকরণ থেকে। তাঁর কবিতা তখন স্বদেশের কথা বলেছে, সমাজ ও সমষ্টির কথা বলেছে, তখনকার সেই বস্তুবিশ্ব-যাত্রার প্রারম্ভ-বিন্দুতে ছিল *নিজ বাসভূমে* কাব্যগ্রন্থ, এই যাত্রা বিরামহীনভাবে চলেছে *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* পর্যন্ত। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে *মাতাল ঋত্বিকে*[৪] তিনি সরাসরি ঘোষণা দিলেন : 'মাতাল ঋত্বিক আমি, প্রেমকথা আমার ঋগ্বেদ'— অনেকটা সমর সেনের ঢঙ্গে, পথ ও মত যদিও বিপরীত; সমর সেন বলেছিলেন : 'রোমান্টিক কবি নই আমি মার্কসিস্ট।'[৫] শামসুর রাহমান সরবে প্রেমে প্রত্যাবর্তন করলেন, প্রেম তাঁর কাব্যযাত্রায় উজ্জ্বল প্রেরণা। আধুনিক কবিতার ইতিহাসে দেখা যায়, অধিকাংশ কবি যাত্রা শুরু করেছেন প্রেমের কবিতা দিয়ে, শামসুর রাহমানের কবিতায়ও প্রেম ছিল, সে প্রেম আধুনিক, স্বভাবগতভাবে ভীরু ও দ্বিধান্বিত। তাঁর প্রেমচেতনাকে এভাবে চিহ্নিতকরণের কারণ—এ প্রেম তিরিশের দশকের আধুনিক প্রেমের মতো শরীর-মন-নাম-পরিচয় নিয়ে অবারিত নয় আবার রাবীন্দ্রিক প্রেমের সৌন্দর্যবোধে, প্রেমের নিষ্কাম নিগূঢ় সাধনাতেও বিশ্বাসী নয়; তিরিশি প্রেমের কবিতা ও রাবীন্দ্রিক প্রেমের কবিতার মধ্যবর্তিনী হয়ে এ প্রেমের জন্ম, এজন্য প্রেমকে স্বীকার করলেও প্রেয়সী নাম-পরিচয় গোপন করে হয়ে ওঠে 'সুদূরতমা', গোপনীয়তার আবরণে আড়াল করার এই সতর্ক প্রয়াস শামসুর রাহমানের কাব্যপ্রেয়সীকে করেছে নামহীনা।

শামসুর রাহমানের কাব্য-অভিযাত্রার শুরুতে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা ছিল না, শুরুতে তাঁর কবিতাদেহ অনির্দেশ্য এক বিষাদঘনতায় আচ্ছাদিত ছিল—এ শূন্যতার বোধ, বিষাদের ক্লান্তি যে যুদ্ধ-দাঙ্গা-মানবতার বিপর্যয় থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞান, বস্তুবিশ্বকে উপেক্ষা করে যাত্রা শুরু করা কবি সেটি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিষাদ-ক্লান্তি, নারী-নিসর্গ ও প্রেম ছিল শামসুর রাহমানের কাব্যযাত্রায় প্রথম পাথেয়; তাঁর কবিতায় প্রেম দ্বিমুখী রূপ নিয়ে বিকশিত : একদিকে কবিতাপ্রেম, কবিতার প্রতি আত্মনিবেদন, অন্যদিকে রয়েছে দয়িতার প্রতি ব্যাকুল বাসনা। কখনও আবার কবিতা ও দয়িতার একীকরণ ঘটেছে : 'তোমাকেই ভাবি, যেমন কল্পনা-উজ্জ্বল/ কবি ভাবে কাব্যের শরীর তার লেখার টেবিলে' ('তিরিশ বছর', *মাতাল ঋত্বিক*)। অনেক সময় দয়িতার প্রেমের স্বাদ তরল হয়ে উঠেছে কবিতার প্রতি আত্মনিবেদনের প্রবল উদ্দীপনার কাছে :

> কেন আমি নিমেষেই সর্পমুগ্ধ শশকের মতো
> হয়ে যাই আবির্ভাবে তার? কেন শুধু উন্মুখর
> একটি অনুরণনে প্রতি রক্তকণা হয় নক্ষত্রচেতন?
>
> ('নক্ষত্রবিন্দুর জন্য', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

রক্তকণায় যে উষ্ণতা বাড়ায়, দীর্ঘ বিনিদ্র রাত যার জন্য যাপন, সে হলো কাব্য-কবিতালতা। তবে দয়িতার প্রতি তাঁর নিবেদিত প্রেম আবেগে কম্পমান হলেও দেহাতীতের সাধনায় সমর্পিত নয়, বরং তিনি বাসনা-বিবিক্ত রাবীন্দ্রিক আদর্শস্নাত প্রেমে আস্থাহীন, ফলে অকপটে উচ্চারণ করেন : 'তাই বলি, তুমি/ আমার কামের ফুলে মঞ্জরিত হও দ্বিধাহীন,/ তোমার অধর দাও দাও তুমি মধুর আলস্যে ভরা কেশের মিনার' ('নক্ষত্রবিন্দুর জন্য', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। বাসনাসিক্ত এ উচ্চারণের ভেতর দিয়েই খুঁজতে হবে শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতার চারিত্র্য। তাঁর বাসনাবিকল মন পুরাণের আশ্রয় নিয়েছে, স্মরণ নিয়েছে এমন সব ঘটনা ও চরিত্রের যেখানে তাঁর প্রেমের অচরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছে ভাষা।

প্রেমের যজ্ঞে শামসুর রাহমান অবতীর্ণ হয়েছেন 'মাতাল ঋত্বিকে'র ভূমিকায়। পুরাণে বারজন ঋত্বিক নানা কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন : 'কেহ উচ্চৈঃস্বরে ঋক্-মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতার আবাহন বা প্রশংসাদি করতেন, কেহ যজ্ঞের জিনিস প্রস্তুত করতেন, কেহ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতেন, কেহ বা সামমন্ত্র গান করে দেবতার স্তুতি করতেন' (সরকার, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ : ৭২)। এই দ্বাদশ ঋষির শক্তিকে শামসুর রাহমান একা তাঁর কবিসত্তায় ধারণ করেছেন, তাঁর মন্ত্র প্রেম; তিনি আবাহন করেন

দয়িতার, যজ্ঞাহুতি-প্রেমগান সবই তিনি সম্পন্ন করেন তাকে উপলক্ষ্য করে। এজন্য তাঁর ব্যক্তিগত ঋগ্বেদের ধরন স্বতন্ত্র, দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি এবং যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে তাদের মনতুষ্ট করে অভীষ্ট আদায় করতেন আর্যরা, শামসুর রাহমান স্তব-স্তুতিতে দয়িতার কাছ থেকে আদায় করতে চেয়েছেন প্রেমের যথার্থ মূল্য। প্রেম শামসুর রাহমানের কবিতার প্রিয় একটি প্রসঙ্গ, এবং তাঁর 'কবিতার বাঁক বদলে প্রেম একটি অনিবার্য প্রণোদনা' (ইকবাল, ২০১০ : ১৯১)। এই প্রেম মূলগতভাবে পুরাণ-আশ্রয়ী, প্রেম-বিরহের সূত্রানুসন্ধানে তিনি অনুসরণ করেছেন প্রচলিত পুরাণ-ঐতিহ্য। এজন্য তাঁর কবিতায় ভীড় করেছে মদন, কিউপিড, আফ্রোদিতি, রাধা-কৃষ্ণ, রজকিনী-চণ্ডীদাস, লাইলী, শিরি প্রমুখ প্রেম-প্রতিমা।[৬] ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী মদনের পুষ্পশরে বিদ্ধ হৃদয় প্রেম-ব্যাকুল হয়ে ওঠে, প্রেমানুভূতি প্রকাশে সেই প্রত্ন-বিশ্বাসেই শেষাবধি তাঁর আস্থা : 'প্রেমের দেবতা যথারীতি/ মেঘের আড়াল থেকে দিত ছুঁড়ে পুষ্পিত শায়ক' ('একজন বেকারের উক্তি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)। নর-নারীর মনের যূথবদ্ধতায় গ্রিক পুরাণে কাজ করেন আফ্রোদিতির পুত্র কিউপিড, শামসুর রাহমান তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত প্রেমের শুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতা যাচাইয়ের প্রয়োজনে সাক্ষী রাখেন কিউপিডকে : 'এবং হৃদয় জুড়ে ছিলে তুমি কিউপিডের কসম' ('বর্ণমালা দিয়ে', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)। আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রেমের যে চিত্রায়ণ, সেখানে এক ধরনের দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে, বিহারীলাল চক্রবর্তী অথবা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় মোহিতলাল মজুমদার ও তিরিশি কবিদের প্রেমের ধরন আলাদা, তিরিশের প্রেমে অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যসন্ধানী প্রেমের তুলনায় দেহবাদী প্রেম প্রাধান্য পেয়েছিল। এ সময়ের দয়িতারা আর অধরা-মাধুরী নিয়ে বিমূর্ত প্রেরণায় কবিকে উদ্বেলিত করতে পারেনি, কাঙ্ক্ষিতা এসেছে নির্দিষ্ট নাম-পরিচয় ও সহজাত বাসনার প্রতিনিধি হয়ে। বিশ্বকবিতা ও তিরিশি কবিতার যুগপৎ উত্তরাধিকার নিয়ে শামসুর রাহমানের কাব্যযাত্রা শুরু হয়েছিল, ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি শরীরী-সংরাগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কখনও কখনও দয়িতার নাম-পরিচয় আড়াল করতে চেয়েছেন বটে, তবু তাঁর প্রেম বাসনা-বিবিক্ত নয়, বরং বাসনাসিক্ত[৭]। শামসুর রাহমানের বাসনা-পিষ্ট মনের অভীষ্ট গন্তব্য হয়ে উঠেছে যযাতি চরিত্র, তাঁর প্রেমিক সত্তা বারবার সমর্পিত হতে চেয়েছে যযাতিতে। জ্বরাহীন জীবন-প্রাপ্তি এবং হাজার বছর ধরে যৌবনদীপ্ত হয়ে দয়িতার সান্নিধ্য উপভোগে উন্মুখ প্রেমিক কবির সামনে যযাতি উপযুক্ত প্রতীকী চরিত্র। জীবনলিপ্সা থেকেই বাসনার জন্ম, বাসনার অন্তরালে জন্ম নেয় প্রেম, সেই প্রেম উপভোগের জন্য মানবজীবন খুব অল্প সময়। প্রেমের জন্য জীবনের মধ্যপর্ব অর্থাৎ যৌবন শ্রেষ্ঠ কাল, সেই কাল সুদীর্ঘ হয়েছিল যযাতির জীবনে দেবতার অভিসম্পাত ও আশীর্বাদের দ্বৈততায়। কবি কোন দৈব অনুকম্পা নয়, প্রেমের পূর্ণতার ভেতর দিয়ে স্পর্শ করতে চান সেই বাসনা-বিলাসের সুদীর্ঘ জীবনকে :

ক. আদিগন্ত তোমার ভালোবাসায়
কেমন রঙিন হয়ে উঠবে প্রহরগুলি, নিমেষে যযাতি
হবে পুরুরবা।

('ভালোবাসা ছাড়া', *সে এক পরবাসে*)

খ. '... হে সুপ্রিয়া,
তোমার হাসির আভা দেয়নি রাঙিয়ে
আমার প্রহর, দাও, আমাকে যযাতি করে দাও।

('আরো কিছুক্ষণ', *এসো কোকিল, এসো স্বর্ণচাঁপা*)

যযাতি পুরাণই কেবল মানুষের মনোভূমিতে বপন করতে পারে সেই স্বপ্নবীজ, যার ফলে মানুষের মুক্তি ঘটে সময়ের বন্ধন থেকে, বয়সের সীমা থেকে : 'বয়সে গোলাপ ফোটে, সহসা যযাতি/ পুরুরবা হয়ে যায়' ('এক দশক পরে', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। যযাতি একদিকে আশীর্বাদ, অন্যদিকে অভিসম্পাত, পুত্রকে জ্বরা দানের পর হাজার বছরের যৌবনদীপ্ত যযাতি মানুষের আরাধ্য স্বপ্নপুরুষ, আর পর জ্বরাগ্রস্ত যযাতি জরাজীর্ণ মানুষের জন্য অভিসম্পাতের মতো : 'জরাগ্রস্ত মানুষের/ সাধের যযাতি স্বপ্ন চকিতে মিলায় প্রেতায়িত অস্তরাগে' ('এই রক্তধারা যায়', *হোমারের স্বপ্নময় হাত*)। অবশ্য শামসুর রাহমান যযাতি পুরাণ ব্যবহার করে যৌবন-বন্দনায় আগ্রহী। তাঁর 'দিতে পারে নয়া সাজ' (*টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*) ও 'নিজের ছায়ার দিকে' (*হোমারের স্বপ্নময় হাত*) কবিতায় যযাতি-পুরাণ অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮]

শামসুর রাহমান 'সুন্দরের গাথা' (*প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*) কবিতায় দয়িতাকে বলেছিলেন : 'এবং বিশ্বাস করো তোমাকে যে ভালোবাসি,/ তার চিহ্ন তুমি কখনো পাবে না খুঁজে প্রথাসিদ্ধ পথে।' – এ আশ্বাসবাণী উচ্চারণের পরও তাঁর প্রেম প্রচলিত পথে প্রচলিত ঐতিহ্যানুসরণে সার্থকতা লাভ করেছে, তিনি রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক পুরাণকে প্রেমের আকর প্রসঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জীবাত্মা-পরমাত্মার জগৎ থেকে মানবগুণসম্পন্ন প্রেমাস্পদের ভূমিকাতে অধিষ্ঠিত হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের সূত্রে বাঙালি মানসে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমিকযুগল হিসেবে অধিক প্রতিষ্ঠিত, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধর্মাদর্শ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়ে স্মৃতিতে চিরজাগরূক হয়ে আছে তাদের প্রেমের সাধারণ রূপটি। শামসুর রাহমান জনমানসে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিকযুগল হিসেবেই রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন কবিতায়, কোন অধ্যাত্ম চিন্তায় বিজড়িত নয় এই যুগলমূর্তি, তাঁর রাধাকৃষ্ণ প্রেম-প্রতিমা লৌকিক পুরাণের প্রভাবজাত :

ক. রাতে স্বপ্নে দেখেছিলাম তুমি এসেছ আমার কাছে
কদম কানন পেরিয়ে সেই নীল যমুনার তীর ঘেঁষে কত দূর থেকে।
জাগরণের এই মুহূর্তে হঠাৎ তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে আমার
হৃদয় হলো কদম ফুল। আকাশের ঘনকৃষ্ণ মেঘ আর রাধা বিদ্যুৎ দেখি।
('ভোরবেলা চোখ মেলতেই', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*)

খ. যে হরিণ দেখা দিয়েছিল জ্যোস্নারাতে, তার
দুটি চোখ কথা বলে রাধার ভাষায়, যেন আমি
বৃন্দাবনে কাজল দিঘির ধারে বাঁশি হাতে একা
বসে আছি
('পরাগের মূর্তি', *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*)

কবি-দয়িতা রাধার প্রতিমূর্তি, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* কৃষ্ণের চেয়ে রাধার বিরহ বড় হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে কৃষ্ণরূপী কবি তাঁর কবিতায় নিজের বিরহ-আকুল বেদনাকে বড় করে তুলেছেন : 'ও ভ্রমর রে তারে কইও গিয়া/ আমার রাধার বিরহের অঙ্গারে আমি ফুইট্টা মরি/ খইয়ের মতো' ('ও ভ্রমর', *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা*)। কবিতার বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করতে এখানে ভাষাকে শিথিল করেছেন, পরিমার্জিত কাব্যভাষার অনুগামী নয় এ ভাষা। আঞ্চলিক ডায়ালেক্টে রচিত শামসুর রাহমানের কবিতার সংখ্যা কম, পূর্বে লিখেছিলেন ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষায় 'এই মাতোয়ালা রাইত', এই কবিতার জন্য এক বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় কবিকে,[৯] সম্ভবত সেজন্যই সৈয়দ শামসুল হক বা রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লার মতো আঞ্চলিক ডায়ালেক্ট দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন কাব্যগ্রন্থ রচনায় তিনি উৎসাহ বোধ করেননি। দয়িতার জন্য যে বিরহ উৎপন্ন হয়েছে কবির হৃদয়ে , 'ও ভ্রমর' কবিতার আঞ্চলিক উচ্চারণ সেই দুঃখানুভূতিকে লৌকিক মাত্রা দিয়েছে, আরোপ করেছে ঘনত্ব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহের কোন আখ্যান নেই। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, *দেবী ভাগবত* ও *পদ্মপুরাণে* রাধা-কৃষ্ণের বিবরণ পাওয়া যায়, যেখানে গোলোকধামের রাধা সুদামার অভিসম্পাতে ভূলোকে এসে গোপকন্যা হিসেবে জন্ম নেন। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের সংস্কার ঘটে, প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের সাধনা ছিল বৈষ্ণব-ধর্মের মূলমন্ত্র, রাধা-কৃষ্ণ হয়ে ওঠে তাদের প্রেমময় আত্মনিবেদনের কেন্দ্রবিন্দু। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* ধর্মীয় ও শৈল্পিক মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে নানা বিতর্ক থাকলেও এখানকার রাধা-কৃষ্ণ অভিমানে-অনুরাগে, ছলনায়-চাতুরীতে, প্রেমে-বিরহে মানবজীবনঘনিষ্ঠ। শামসুর রাহমান দয়িতাকে মধ্যযুগের আকুল প্রেমিকা রাধার প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজেকে কৃষ্ণের অবস্থানে রাখতে গিয়ে অনেক সময় আত্মবিশ্বাসচ্যুত হয়ে পড়েছেন।

মধ্যযুগের মতো একটি সময়সীমায় বাস করে রাধা তার বিবাহিত জীবন এবং সমাজকে তুচ্ছ করে কৃষ্ণের বাঁশিতে ব্যাকুল হয়ে, দিন-রাতের হিসেব ভুলে বেরিয়ে পড়েছিল 'কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি' বলে। কৃষ্ণরূপী আধুনিক কবির আক্ষেপ :

> কৃষ্ণ নও যে বাঁশির ডাকে
> আসবে সে বৃষ্টিমত্ত গাঢ় কালো মধ্যরাতে সমাজের ভিত
> কাঁপিয়ে
>
> ('বৃষ্টির অধিক বৃষ্টি', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*)

প্রেমের প্রতিষ্ঠায় সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙার যে দ্বৈত দ্রোহ প্রয়োজন হয়, কবির প্রণয়ে সেই দ্রোহের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। ভারতীয় পুরাণ ও লোকপুরাণ ছাড়াও প্রেমভাবনার রূপায়নে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রিক পুরাণ, পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য এবং *বাইবেলের*। গ্রিক পুরাণ থেকে তিনি বেছে নিয়েছেন অ্যাডোনিস চরিত্র। পুনরুজ্জীবনবাদী পুরাণের প্রতি শামসুর রাহমানের স্পর্শকাতরতা প্রবল, প্রথম কাব্যগ্রন্থে তার নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই অভিজ্ঞান থেকে তিনি অ্যাডোনিস পুরাণের মুখোমুখি হন। অ্যাডোনিস প্রেমিক-পুরুষ, সেইসঙ্গে পুনরুজ্জীবনবাদের সঙ্গে এই চরিত্রের গভীর যোগ রয়েছে। 'চড়ুইভাতির পাখি' কবিতায় অ্যাডোনিস প্রসঙ্গ এসেছে :

> পাখিটার কাছে ছুটে যায় শিশু, শিকারি দিলেন শিস।
> শালবনে গাঢ় ছায়া নেমে আসে, এখন ফেরার পালা
> ছায়ার ভেতর বেজে ওঠে ধ্বনি—'অ্যাডোনিস, অ্যাডোনিস'।
>
> (*যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*)

কীটসের মৃত্যু এবং অ্যাডোনিস ট্র্যাজেডিকে উপজীব্য করে 'অ্যাডোনিস' শিরোনামে শোককবিতা লিখেছিলেন শেলি, এলিয়ট ও শেকসপীয়রের রচনাতেও অ্যাডোনিস বিষয় হিসেবে এসেছে। 'চড়ুইভাতির পাখি' শামসুর রাহমানের শোককবিতা, তবে এ শোক একান্ত ব্যক্তিগত, শেলির 'অ্যাডোনিস' কবিতার মহাকাব্যিক পট এখানে অনুপস্থিত। কবির স্মৃতিচারণ-সূত্রে চড়ুইভাতির প্রেক্ষাপট উঠে আসে কবিতায়, যেখানে শিকারীর বন্দুকের গুলিতে আহত হয় একটি পাখি। পাখিটি এই কবিতায় অ্যাডোনিসের প্রতীক, যে অ্যাডোনিস ছিলেন বৃক্ষসন্তান, আফ্রোদিতের প্রেমিকপুরুষ এবং শিকারী। একদিন লেবাননের বনে শিকার করতে গিয়ে অ্যাডোনিস নিজেই শিকারে পরিণত হন, প্রতিহিংসাবশত যুদ্ধদেবতা অ্যারেস বন্য বরাহের রূপ ধরে তাকে আক্রমণ এবং হত্যা করে,

অ্যাডোনিসের বুকের রক্তে জন্ম নেয় লাল ঝুমকো ফুল। পরবর্তীকালে জিউসের অনুগ্রহে তিনি পুনরুত্থিত হন, বৃক্ষ যেমন পুরনো শিকড় ও বীজ থেকে পুনর্জীবিত হয়। শামসুর রাহমানের কবিতা অবশ্য অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে, চড়ুইভাতির প্রাঙ্গণে গুলিবিদ্ধ পাখির ট্র্যাজেডির সঙ্গে তিনি নিজেকে মিলিয়ে দেন এভাবে :

যাকে আমি খুঁজি সকল সময়, যে আমার ব্যাকুলতা,
তার উপেক্ষা যখন স্মরণে আসে,
তখন আমার মনে পড়ে যায় চড়ুইভাতির আহত পাখির কথা।

বন্দুকের গুলিবিদ্ধ পাখিটি যেন বরাহের আক্রমণে রক্তাক্ত অ্যাডোনিস, আর কবি পুরাণ-মথিত সেই পাখিটির যন্ত্রণাদগ্ধ প্রতিমূর্তি, তাঁর হৃদয়ে অ্যাডোনিস-হারা আফ্রোদিতির আকুল করা শোক ঘনিয়ে আসেনি, বরং অসমর্পিতা দয়িতার প্রতি অভিমান-অনুযোগ মুখ্য হয়ে উঠেছে। ফলে অ্যাডোনিস-পুরাণ যে অর্থে এ কবিতায় ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল, সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, অ্যাডোনিসের জীবন ও মৃত্যু যে বিশাল ও ব্যাপক পৌরাণিক ভাষ্য নিয়ে উজ্জ্বল, শামসুর রাহমান তার সামান্য একটি অংশকে কবিতায় ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিক বেদনাকে স্বচ্ছ রূপ দেবার অভিপ্রায়ে। দয়িতার অবজ্ঞায়-উপেক্ষায় এরকম যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে, কারণ দয়িতার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা অসীম, তাকে দৃষ্টিসীমায় পাবার জন্যে কবিহৃদয় এতটাই ব্যাকুল যে শুধু মর্তের নয়, স্বর্গীয় সুখ-সমৃদ্ধি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে তিনি প্রস্তুত : 'তোমাকে দেখার জন্যে বেহেস্তী আঙুর আর কয়েক ডজন/ হুরীর লালচ আমি সামলাতে পারবো নিশ্চিত' ('অমন তাকাও যদি', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)। পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পুণ্যবান ব্যক্তির পারলৌকিক পুরস্কার বেহেস্তের অনন্য স্বাদযুক্ত মেওয়া এবং অনিন্দ্য সুন্দর সত্তরজন হুরী, কিন্তু শামসুর রাহমান প্রেমকে দেখতে চান পার্থিবতায়। দয়িতার অপেক্ষায় অপেক্ষমান অস্থির প্রেমিক-হৃদয়ের উন্মোচন ঘটেছে 'তোমার ঘুম' কবিতায়, তখন কবির কাছে বদলে গেছে সময়ের হিসেব, প্রেমের আপেক্ষিকতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সময় :

যিশুখ্রিস্ট
ক্রুশে বিদ্ধ হবার পর
যতদিন গেছে অস্তাচলে, ততদিন তোমার
চোখের চাওয়া আর
স্পর্শের বিদ্যুচ্চমক থেকে আমি বঞ্চিত, মনে হয়।
('তোমার ঘুম', *অবিরল জলভ্রমি*)

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রেম যৌবনের ধর্ম, যারা মনে করেন যৌবনই প্রেম-সংক্রমণের একমাত্র উপযুক্ত সময়, কবি তাদের ধারণার ভুল ভেঙে দেন—তিনি বার্ধক্যের সীমায় দাঁড়িয়ে যৌবনের গান গেয়ে যাবার মতো অফুরন্ত প্রাণশক্তি টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, সে কি যযাতিকে যাচনার বরে? ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয় শামসুর রাহমানের *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*, সে সময় আয়ুরেখার বেশির ভাগ অতিক্রম করে বার্ধক্যের প্রান্ত-সীমায় দাঁড়ানো কবি, মানসলোকে তবু দয়িতার আনাগোনা, কবিতার জন্য নানা জল্পনা-কল্পনা। প্রেমিক হতে চেয়ে কবিকে যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হতে হয়, যে কাস্তেটি তাঁকে এই যন্ত্রণাময় অনুভূতি এনে দেয়, তার নাম 'বয়স'। বয়সকে কবি ঘৃণা করেন : 'বয়সকে বড় বেশি ঘেন্না করি,/ যেমন বিক্ষুব্ধ চাঁদ সদাগর মনসাকে' ('এক মহিলার ভাবনা', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)। বাড়ন্ত বয়সকে স্বীকার করেন না বলেই হয়তো তিনি কবিতায় টেনে আনেন এক বিশাল পৌরাণিক প্রেক্ষাপট :

> আমি তো স্যাটার্নের মতো স্বর্গের অধিকার
> নিয়ে লড়িনি অলিম্পিয়ানদের বিরুদ্ধে কিংবা প্যারিসের মতো হরণ
> করিনি কোন সুন্দরীতমা হেলেনকে
> ('ছিন্নভিন্ন হতে থাকে কাস্তের আঘাতে', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)

গ্রিক পুরাণের টাইটানদের মধ্যে স্যাটার্ন ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান, স্বর্গের অধিকার নিয়ে পুত্র জিউসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধের একদিকে ছিলেন স্যাটার্ন ও অন্যান্য টাইটান[১০] ভাতৃবর্গ, অন্যদিকে ছিলেন জিউস ও তাঁর পাঁচ ভাইবোন যাঁরা অলিম্পিয়ান দেবতা। অন্যদিকে ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস হরণ করেছিলেন মেনেলাউসের স্ত্রী হেলেনকে, এ কারণে আরেক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধের সূচনা হয়, যা দীর্ঘকালব্যাপী চলেছিল ট্রয় ও গ্রিকদের মধ্যে। কবি স্যাটার্ন অথবা প্যারিস নন, কাজেই পুরাণ-ইতিহাসে ঘটে যাওয়া এসব বড় বড় যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ নেই তাঁর; কবির একটি ছোট প্রত্যাশা : 'এখন এই মুহূর্তে/ সামনে এসে দাঁড়াক আমার প্রিয়তমা, আমি তার বুকে চন্দ্রোদয় আর/ দু'চোখে বসন্তোৎসব দেখব' ('ছিন্নভিন্ন হতে থাকে কাস্তের আঘাতে', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)। কবিতার বক্তব্য এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোয় কবিতাটিতে পুরাণের পরিবর্তে প্রেম প্রধান হয়ে উঠেছে, তবে সেই প্রেম প্রকাশের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে স্যাটার্ন, অলিম্পিয়ান দেবতা, প্যারিস এবং হেলেনকে ঘিরে সংঘটিত পৌরাণিক ঘটনা-সমূহ। এছাড়া 'গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতো' কবিতায় প্রেমের বাজিতে হেরে গিয়ে টেনে আনেন *মহাভারতের* 'পাশা খেলা' ও 'বনপর্বে'র প্রসঙ্গ। তিনি পরশুরাম ও তার কুঠার সংক্রান্ত পুরাণকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করেছেন কবিতায়, নজরুল 'বিদ্রোহী'

কবিতায় পরশুরামের তেজোশক্তিকে ব্যবহার করেছেন তাঁর বিপ্লবী চেতনাকে রূপ দানের প্রয়াসে, অন্যদিকে দয়িতার প্রেমের উষ্ণ স্পর্শ-বঞ্চিত কবি বিদ্রোহী হুঙ্কারে জানিয়ে দেন : 'পরশুরামের মতো কুঠারের আঘাতে আঘাতে/ আমিও একুশবার নিশ্চিত মেটাবো জাতক্রোধ' ('দরজার কাছে', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)। বঞ্চনায় যেমন বিদ্রোহী তিনি, তেমনি তাঁর প্রেমের অসীম তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণার স্বরূপ বোঝাতে পুরাণের শরণ নিতে হয় : 'অগস্ত্য মুনির মতো চকিতে তোমাকে/ গণ্ডুষে গণ্ডুষে পান করে ফেলতে ভারি লোভ হয়' ('আমি ভারি লোভাতুর')। কবিতার জন্য যেমন তেমনি দয়িতার জন্যও কবির পুনর্জন্ম হয়েছে ফিনিক্স পাখির মতো, সত্তায় ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে জীয়ন কাঠির স্পর্শ দিয়েছিল প্রেম : 'আমাকে জাগালে তুমি রুক্ষ অবেলায়, দিলে গান/ অস্তিত্বের তন্তুজালে ('ফিনিক্সের গান', *মাতাল ঋত্বিক*)।'[১১]

কবিতার অবয়ব নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি অনেক সময় পৌরাণিক অনুষঙ্গকে সংকুচিত করেছেন তার বিশাল প্রেক্ষাপট থেকে বিযুক্ত করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে ছোট কোন ঘটনা বা চরিত্র মহাকাব্যিক তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে উপস্থাপন-কৌশলের কারণে। মহাভারতে 'জতুগৃহ' প্রসঙ্গের ভেতরে নিহিত আছে কুরু-পাণ্ডবদের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বসূত্র। তিনি সেই ব্যাপক প্রেক্ষাপট থেকে শুধু 'জতুগৃহ' শব্দটিকে বিচ্ছিন্নভাবে চয়ন করেন এবং জুড়ে দেন প্রেমের কবিতায় :

> জ্বলজ্বলে টিপ বাসনার ডালে
> পাখি হয়ে ডাকে, সে ডাকের হাতছানি পেয়ে কবি ভীত নন
> জতুগৃহে যেতে;
>
> ('গৃহদাহ', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)

এভাবে জতুগৃহের মতো একটি বিশাল প্রেক্ষাপটসম্পন্ন শব্দ কবির হাত ধরে অর্থ-সংকোচন করে প্রবেশ করে নতুন অর্থবোধকতার জগতে, যেখানে কুরু-পাণ্ডব দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে 'জতুগৃহ' শব্দটির অর্থগত প্রণোদনা—দাহ্যপদার্থ দিয়ে নির্মিত যে গৃহ, যে গৃহ নির্মিত হয়েছিল জ্বলে ওঠার জন্যই, জেনেশুনে সেরকম জ্বলন্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার মতো সাহস সঞ্চিত ছিল তাঁর প্রেমিকসত্তায়। পুরাণের সঙ্গে ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নিবিড়। শামসুর রাহমান ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্ত করে যাপিত জীবনের ক্ষুদ্রতম-তুচ্ছতম ঘটনাধারা পর্যন্ত পুরাণের বিস্তার ঘটিয়েছেন, ফলে পুরাণ তাঁর কবিতায় আরও বেশি জীবনসম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে।

**স্বদেশ ও সমকালের সংকট চিত্রায়ণে পুরাণ**

শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পীর বিশেষ প্রেক্ষণবিন্দু থাকে, সৃষ্ট শিল্প যেখানে আঘাত করে তার অস্তিত্ব নির্মাণ করতে চায়—কখনো সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে নন্দনতত্ত্ব, আবার কখনো সমাজতত্ত্ব। আবার এ দুটো দৃষ্টিকোণ একই সময়ে শিল্পীর সত্তায় সহাবস্থানে থাকতে পারে, নজরুলের 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' এবং 'রণতূর্যের' মতো, অনেক সময় শিল্পী এর যে কোন একটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যটিতে প্রবেশ করতে পারেন। সুদীর্ঘ কবিজীবনের শুরুতে কবিতার নান্দনিক সৌন্দর্য-ভুবন থেকে বেরিয়ে দেশ-কালের আশ্রয় গ্রহণ শামসুর রাহমানের কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে এক মৌলিক বাঁকবদল। সমর সেন যেমন বলেছিলেন, 'বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয় কবিতা',[১২] শামসুর রাহমানে সে সমন্বয় দেখা যায়, তবে তা সংঘটিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে, ফলে সমর সেনের কবিসত্তায় বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার যে সাংঘর্ষিক সহাবস্থান দেখা যায়, শামসুর রাহমান তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রমশ তাঁর কবিতার ভাববিন্যাসের ধরন, বিষয় নির্মাণের নকশা বদলে গেছে, তাঁর পরিবর্তিত সেই চেতনার অনুগামী হয়েছে পৌরাণিক অনুষঙ্গ।

শামসুর রাহমান বিশ্বাস করতেন—'সংকটে কবির সত্তা আরও বেশি চিন্তাশ্রয়ী হয়' ('সংকটে কবির সত্তা', *শূন্যতায় তুমি শোকসভা*)। সব কালেরই নিজস্ব সংকট থাকে, শামসুর রাহমানের জন্ম ও বেড়ে ওঠার কালের মধ্যে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ঘূর্ণিচক্র, সেই চক্রের ফাঁদ-ভেঙে বাঙালি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই ইতিহাসের ছায়ারেখা খুঁজে পাওয়া যায় শামসুর রাহমানের কবিতায়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভূগোলকে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত করার ভেতর দিয়ে যে সংকট শুরু হয়েছিল তার নিষ্পত্তি ঘটেছে একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। বৃটিশ এবং ভারতীয় এই দ্বিমুখী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রূপান্তরিত হয়েছিল জাতিসত্তাগত ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে—বৃটিশ এবং হিন্দু-মুসলমান। পরবর্তীকালে এই ত্রিকৌণিক দ্বন্দ্ব আবার দ্বিমুখী এবং তীব্র আকার ধারণ করে, তখন তৃতীয় পক্ষ উধাও, মুখোমুখি ভারতের হিন্দু-মুসলমান। নাগরিকতা ও পারস্পরিক সমঝোতার সূত্রে গড়ে ওঠা সহমর্মিতা বিনষ্ট হয়েছিল, ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্কের বন্ধন কেটে তখন হিন্দু-মুসলিম প্রতিপক্ষ। এই ঘটনাকে শামসুর রাহমান আকস্মিক বলতে চাননি, ইতিহাস ও পুরাণের দিকে তাকালে এরকম ভ্রাতৃহত্যার অনেক নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হবে। এজন্য তাঁর কলম বলে উঠেছিল :

> হে বিষণ্ন পিতৃপুরুষবর্গ তোমাদের মিলিত শোণিত
> বিষণ্ন বংশের রক্তে জাগায় প্রতীকী শিহরণ
> মতবাদ-পীড়িত যুগের গোধূলিতে। সংবর্ধনা

পায় তারা নষ্ট বাগানের স্তব্ধতায়, বিষাদের
ইন্ধন জোগায় নিত্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সময়ের
কাৎরানি মূঢ়তা আর মিথ্যাচার, যা-কিছু নিঃশ্বাসে
অগোচরে সহজে মিশিয়ে দেয় বিন্দু বিন্দু বিষ।
"যে স্মৃতি ভ্রাতৃহননে প্ররোচিত করে বার বার
প্রেতায়িত মন্ত্রণায়,
('অপচয়ের স্মৃতি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

'শ্রীযুক্ত বিষণ্ন পরিমল' হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ভ্রাতৃহননের যে নষ্ট স্মৃতি-ইতিহাস তুলে ধরেন শামসুর রাহমান তা আমাদের সামনে একইসঙ্গে উন্মোচিত করে ইতিহাস ও পুরাণের পাতা, হাবিল-কাবিল, কুরু-পাণ্ডব, ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বান্দ্বিক অবস্থান সেই পুরাণ ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার স্মারক। পরিমলের কণ্ঠে তিনি 'অপচয়ের স্মৃতি' কবিতাটিকে ধারণ করেন, পরিমল ভেবেছিল :

হবো তথাগত কিংবা যিশু,
দগ্ধীভূত আত্মায় ফেলবে ছায়া কোনো বোধিদ্রুম।
ফন্দিবাজ জনরবে কান দিয়ে, জিঘাংসায় মেতে
চেনা দেশে করব না প্রতারিত শান্তির পাখিকে
চতুর মিলিত ফাঁদে।

'পরিমল' বুদ্ধ ও যিশুর আদর্শে শান্তি ও মানবতার পক্ষে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল, যদিও ভ্রাতৃহত্যার ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দায় সে অস্বীকার করতে পারে না, বিশেষ করে যখন তার 'চতুর্দিকে মুণ্ডহীন মানুষের অখণ্ড স্বরাজ!' এ হেন পরিস্থিতিতে অন্ধকার কাল মানুষকে হন্তারক হতে প্ররোচিত করে। হাবিল-কাবিলও তাই করেছিল পৃথিবীর প্রথম মানুষের উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরণের প্রশ্নে। কুরু-পাণ্ডবের রাজ্যদখল, হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ক্ষমতালোভী পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণ—এ সবই যেন এক সুতোয় বাঁধা, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই 'প্রেতায়িত মন্ত্রণা', যা 'ভ্রাতৃহননে প্ররোচিত' করেছে বারবার। ফলে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাঙালিকে আবার দেখতে হয় 'খাণ্ডবদাহন'[১৩]—শব্দটি ছোট হলেও এর নিহিত তাৎপর্যের পরিধি ব্যাপক, এই একটি শব্দ দিয়েই ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা শামসুর রাহমান বুঝিয়ে দিয়েছেন। পনের দিন ধরে খাণ্ডববনকে দগ্ধ করেছিল অগ্নি, তার প্রবল থাবা থেকে এ বনের অল্পসংখ্যক প্রাণী আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধ যেন তেমনি এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে দেখা দেয় বাঙালির

জীবনে, প্রজ্জ্বলিত হয় কবির প্রিয় ভূখণ্ড, যুদ্ধকালের দীর্ঘ আগ্রাসনে ঝরে যায় অসংখ্য নিষ্পাপ প্রাণ, যাদের মধ্যে 'সখিনা বিবি' যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন 'হরিদাসী'। প্রতিপক্ষ এক হানাদার সৈনিকের জবানীতে একাত্তরের ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ তুলে ধরেন কবি, সেইসঙ্গে উঠে আসে সৈনিকের আত্মোপলব্ধি :

গ্রামে গ্রামে
দেয় হানা সাঁজোয়া বাহিনী, মানে আমরাই। যুবা,
বৃদ্ধ, নারী, শিশু
শিকার সবাই—চোখ বুজে ছুঁড়ি গুলি ঝাঁক ঝাঁক।
মনে হয় আমি নিজেই কাবিল।
('জনৈক পাঠান সৈনিক', *বন্দি শিবির থেকে*)

পাঠান সৈনিকের আত্মবয়ানে শামসুর রাহমান আবারও ফিরে আসেন 'কাবিল' প্রসঙ্গে। সৃষ্টির প্রথম সন্তান আদমের দু'পুত্র ছিলেন হাবিল এবং কাবিল। কাবিলের হাতে লেগেছিল ভ্রাতৃহত্যার রক্ত, সেইসঙ্গে মানুষের পূর্বপুরুষের রক্তে মিশে গিয়েছিল সেই কলুষ। জনৈক পাঠান সৈনিক 'মানে আমরাই' বলে হাবিল-কাবিল পুরাণ-ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্তি তৈরি করেন একাত্তরে যুদ্ধরত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের। এ কারণে কালের সংকট বয়ানে শামসুর রাহমানের কবিতায় বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে হাবিল-কাবিল বৃত্তান্ত :

ক. হাবিলের চেয়ে কাবিলের সংখ্যা অতি দ্রুত আজ
হাজার হাজার গুণ যাচ্ছে বেড়ে;
('পূর্বসূরীদের উদ্দেশে', *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*)

খ. ভবঘুরে
কাবিলের মতো
যন্ত্রণার দাগ বয়ে বেড়াচ্ছি নিয়ত সাত ঘাটে।
('এখন নিজেকে বলি', *অবিরল জলভ্রমি*)

হাবিল ও কাবিলকে কবি শুভ এবং অশুভ চেতনার প্রতিরূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যুগে যুগে শুভ চৈতন্যকে গ্রাস করেছে অশুভ শক্তি, তাই ইতিহাসের পরিসংখ্যান পাল্টে যায়, হাবিলের চেয়ে কাবিল[১৪] হয়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ। শামসুর রাহমান মূলত মানবতাবাদী, তিনি চিরকাল হত্যাযজ্ঞ-যুদ্ধ এসবের বিরুদ্ধে থেকে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তনিদের বর্বরতা কবিকে 'যুদ্ধই উদ্ধার'

বলতে শিখিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 'কিংবা দারুমূর্তি দেখে সিদ্ধার্থের সেলফ-এর ওপর/ মনে করতাম, যুদ্ধের বিপক্ষে আমি, আজীবন বড় শান্তিপ্রিয়' ('উদ্ধার', *বন্দি শিবির থেকে*)। সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ অহিংসার ধারক, তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী আদর্শের বাহক, তিনি তাঁর আদর্শ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন; শামসুর রাহমান পারেননি, স্বদেশের ক্রান্তিকালে তাঁর কলম কথা বলেছিল যুদ্ধকে সমর্থন করে, একাত্তরের পর অবশ্য তিনি আবার যুদ্ধ এবং রক্তপাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি মূলত মানবতাবাদী কবি, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের অহিংসা ও মানবতাবাদ দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন আমৃত্যু। বুদ্ধ রক্তপাতহীন অহিংসার আদর্শ প্রচার করেছিলেন, সেই 'বিপ্লব সশস্ত্র বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্র বিপ্লব হঠাৎ আসে আর হঠাৎ চলে যায়। এর ফলাফল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু অস্ত্রবিহীন বিপ্লব আসে ধীরে, এর ফলাফল হল চিরস্থায়ী' (চাকমা, ২০০৭ : ৬১)। একাত্তর ছাড়া জীবনের বাকি সময় শামসুর রাহমান অস্ত্রহীন এবং রক্তপাতহীন লড়াইকে সমর্থন করে গেছেন, তবে সত্য ও মানবকল্যাণের প্রয়োজনে একান্তই যদি অস্ত্র-ধারণ করতে হয়, সেক্ষেত্রে তিনি হাতে তুলে নিতে চান 'ফুলের অস্ত্র'।[১৫]

একাত্তরে পরিস্থিতির শিকার হয়ে অল্প প্রশিক্ষিত এবং অপ্রশিক্ষিত সাধারণ মানুষ যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন লাখ লাখ বাঙালি। শামসুর রাহমানের বহুল ব্যবহৃত পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে যিশু অন্যতম, সেই যিশুর প্রতীকে তিনি টেনে এনেছেন যুদ্ধে নিহতদের প্রসঙ্গ, স্বদেশের জন্য যাদের আত্মা উৎসর্গীকৃত :

> কখনও জানিনি আগে, এত যিশু ছিলেন এখানে
> আমাদের নগরে ও গ্রামে। সন্ধ্যার মতন কালো
> ভীষণ মধ্যাহ্নে
> আমরা কয়েক লক্ষ যেসাসকে হারিয়ে ফেলেছি।
>
> ('রক্তসেচ', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

কেন্দ্রে ও প্রান্তে যারা প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তারা ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেছিলেন দেশ ও দেশের মানুষকে, তাদের এই আত্মদান গলগাথার সেই আত্মদানের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেছে। 'রক্তসেচ' কবিতায় শামসুর রাহমানের শব্দচয়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 'ভীষণ' মধ্যাহ্নকে তিনি দেখতে পেয়েছেন 'সন্ধ্যার মতন কালো', ঘনিয়ে আসা দুঃসময়ের উপযুক্ত প্রতিমা তিনি এভাবেই খুঁজে নিয়েছেন। এ কবিতায় তিনি শহীদদের রক্তদান প্রসঙ্গে বলেছেন : 'তোমাদের/ রক্তসেচে আমাদের প্রত্যেকের গহন আড়ালে/ জেগে থাকে একেকটি অনুপম ঘনিষ্ঠ গোলাপ।' তাঁর

এই উচ্চারণ আমাদের স্মরণে আনে আফ্রোদিতি ও অ্যাডোনিস পুরাণ, অ্যাডোনিসকে হারানোর পর আফ্রোদিতির যে ক্ষরণ, সেই ক্ষরণ থেকেই পৃথিবীর গোলাপেরা লাল হয়েছিল, আর অ্যাডোনিসের বুকের রক্ত থেকে জন্মেছিল ঝুমকো ফুল, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তদানে চেতনায় জন্ম নেয় 'অনুপম ঘনিষ্ঠ গোলাপ', এই গোলাপ বাঙালি জাতিসত্তায় জাগ্রত শুভচৈতন্যের প্রতীক।

বাঙালির জীবনে পশ্চিম পাকিস্তানিরা নিয়ে এসেছিল অন্ধকারের বিভীষিকা, শামসুর রাহমান সেই ইতিহাসের পাঠক নন বরং দর্শক, যুদ্ধ সংঘটনকারী পশ্চিমাদের প্রতি তাঁর সত্তায় সঞ্চিত হয়েছিল অপরিসীম ঘৃণা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পুরাণে অভিসম্পাত দিয়ে প্রতিশোধ চরিতার্থের অনেক নজির রয়েছে, শামসুর রাহমান নিজেও অভিসম্পাত দিয়েছেন, কারণ পাকবাহিনীর অনৈতিক কর্মকাণ্ড যে কোন সাধারণ মানুষের মনেও ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম :

> না, আমি আসিনি
> ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাতা ফুঁড়ে,
> দুর্বাসাও নই,
> তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে
> অভিশাপ দিচ্ছি।
>
> ('অভিশাপ দিচ্ছি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

*বাইবেলের* প্রথম অংশের নাম ওল্ড টেস্টামেন্ট, কবি সেখানকার কোন চরিত্র নন, আবার ভারতীয় পুরাণের সবচেয়ে তেজী তপস্বী, নজরুল যাকে 'ক্ষ্যাপা' বলেছিলেন, সেই দুর্বাসাও নন, যে দুর্বাসা ভারতীয় পুরাণে সবচেয়ে বেশি অভিসম্পাত দেবার নজির তৈরি করেছিলেন। সাধারণ মানবসত্তা হয়েও সময়ের নিষ্পেষণে কবির কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনিমালা হয়ে ওঠে অভিসম্পাতের পঙক্তিমালা পৌরাণিক ঐতিহ্যানুযায়ী, পশ্চিম পাকিস্তানিদের নৃশংসতা শামসুর রাহমানকে এ জাতীয় পঙ্‌ক্তি উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ করেছে।[১৬]

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে যুদ্ধই শেষ কথা নয়, থাকে যুদ্ধ-পরবর্তী নানা প্রতিক্রিয়া। নতুন দেশ গড়ার নতুন প্রত্যয় কবির চেতনাতেও ছিল, তাই শূন্য টিয়ের খাঁচাকে তিনি আবার ঝুলিয়ে দেন বারান্দায়, নতুন কোন 'সবুজ পাখি'র প্রত্যাশায়, সবুজ হচ্ছে প্রাণের রঙ, অঙ্কুরোদগমের চিহ্ন। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন : 'কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়/ পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা :' ('ঘাস', *বনলতা সেন*)। জীবনানন্দের কবি-চোখ দিনের তরুণ-রূপ সকালকে সবুজ দেখেছে, প্রাণময় করে দেখেছে। *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*'র কবিতাগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যুষাকালে লেখা,

সজীব স্বদেশে শামসুর রাহমান যে 'সবুজ পাখি' পুষে রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, সেটি নতুন সময়ের নতুন প্রত্যয়কে ধারণের প্রত্যাশায়। কিন্তু সেই অভিপ্রায় নির্বিরোধে বাস্তব রূপ লাভ করবে এমন আত্মবিশ্বাসও ছিল না কবির অন্তরে। তাই এমন এক ভীতির কবলে কবি পতিত হন, যে ভীতি গাণিতিক হারে বাড়ে; এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন 'ভীতিচিহ্নগুলি' কবিতাটি, যেখানে কবির মন আশা-নৈরাশ্যে কাতর, দ্বিধায় দীর্ণ :

রোজ
বেলাশেষে ক্লান্ত লাগে, ক্লান্ত লাগে, ক্লান্ত লাগে; ভয়
হিস্ হিস্ ভয়
দারুণ হাইড্রা ভয় এই
কণ্টকিত সত্তা জুড়ে রয় সারাক্ষণ। তবে কি ধবলী
গোখুরে উড়িয়ে ধুলো রঙিন বাজিয়ে ঘণ্টা যাবে না গোহালে?
('ভীতিচিহ্নগুলি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

'হাইড্রা ভয়'-এর হাইড্রা[১৭] নয় মাথাবিশিষ্ট গ্রিক পুরাণের সর্পদানব। তার একটি মাথা কাটলে দুটি মাথা গজায়, শামসুর রাহমান সদ্য স্বাধীন দেশে হাইড্রা-ভীতিতে আক্রান্ত, অপ্রতিরোধ্য সে ভয়ের একাংশ থেকে মুক্ত হলে অন্য অংশ হয়ে ওঠে আরও প্রবল। এ ভীতি কোন রোমান্টিক কল্পনাপ্রসূত নয়, যুদ্ধ-পরবর্তী কালের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা, নাগরিকদের নৈতিক মূল্যবোধের পতনের ভেতরে তাঁর এ ভীতির কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ঘনিয়ে আসা দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া 'ধবলী'কে আর 'গোহালে' ফিরে যেতে দেয়নি, অর্থাৎ স্বাধীনতার সব সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়েছে, সুফল ঘরে তোলা যায়নি, স্বাধীনতার সুফল-বিনষ্টির একটি বড় কারণ ছিল দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধের অনুগামী মারী ও মন্বন্তরের ভয়াবহ রূপ ধরা পড়েছে তাঁর 'এখন আমার শব্দাবলী' কবিতায় :

... তিনটি মলিন হ্রস্ব
নোটের বদলে মেরি-মাতা নির্দ্বিধায়
রাত্তিরে হচ্ছেন ম্লান
(*আমি অনাহারী*)

যুদ্ধ ও মহামারীর প্রথম শিকার হয় নারী ও শিশুরা। মাতা-মেরিরূপে[১৮] যে নারীকে দেখা যাচ্ছে শামসুর রাহমানের কবিতায়, জীবন ও জঠরের প্রয়োজনে তার আত্মবিক্রি, সেই আত্মবিক্রিকে দৃশ্যায়িত করেছেন কবি যিশুর কুমারী মাতা মেরির পুরাণকে ইঙ্গিত করে।

যুদ্ধের শেষ নেই, শান্তিময় স্বদেশের প্রত্যাশা বৃথা, *আমি অনাহারী* কাব্যে এসে শামসুর রাহমান উপলব্ধি করেছেন, যে যুদ্ধ হাবিল-কাবিল অথবা কুরু-পাণ্ডবদের দিয়ে শুরু হয়েছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি যেন আসবে অমোঘ পুরাণ-ইতিহাসের ভেতর দিয়ে। পুরাণ-ইতিহাসের শুকনো পাতা বর্তমান কালের সংকট ব্যাখ্যায় সজীব হয়ে ফিরে আসে তাঁর কবিতায় মুষলপর্বের ভেতর দিয়ে :

...শুরু হয় অবলীলাক্রমে
আবার মুষলপর্ব; কে কার অস্ত্রের ক্ষিপ্র ভীষণ ঠোকরে
চকিতে ছিটকে পড়ে, বোঝা মুশকিল।
('আবার মুষলপর্ব', *এক ধরনের অহংকার*)

অভিশাপগ্রস্ত কৃষ্ণ-পুত্রের মুষল প্রসবের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় যদুবংশ, বাংলাদেশের অবিরাম রক্তপাতের ইতিহাসকে তিনি এই পৌরাণিক ধারার সঙ্গে একীকরণ করেন। অধঃপতনের চূড়ান্তে পৌঁছে বাঙালি জাতি ভ্রাতৃহত্যার পাপ থেকে আরও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে, পিতৃহত্যার রক্তে রাঙা হয়েছে হাত। শামসুর রাহমান দেশকে দেখেছিলেন বাগানের প্রতিরূপকে, শুভচৈতন্যের উদ্বোধনে দেশ হয়ে ওঠার কথা ছিল গোলাপ বাগান, কিন্তু নষ্ট শক্তির পরাক্রমে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরতন্ত্রের শক্ত খোলস ভাঙা অপ্রতিহত বাঙালি স্বদেশেই আক্রান্ত হয়েছে স্বৈরাচারী শাসকের, এর ভেতরে কবি দেখেছেন ভারতীয় পুরাণের বস্ত্রহরণ-পালার নির্লজ্জ পুনরাবৃত্তি :

যেদিন তোমার বস্ত্রহরণের পালা
শুরু হলো, তোমার চুলের মুঠি ধ'রে পৈশাচিক
উল্লাসে উঠলো মেতে মদমত্ত বর্বরেরা, সেদিন যাদের
চোখ ক্রোধে রক্তজবা হয়ে উঠেছিল লহমায়,
তোমার গ্লানির কালি মুছে দিতে যারা
হলো শস্ত্রপাণি, আমি তাদের করেছি সমর্থন
সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে।
('দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে', *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*)

বস্ত্রহরণ পালার বিবরণ শেষে তিনি নিজের প্রতিরোধী অবস্থানের কথা জানিয়ে দেন। দ্রৌপদী এ কবিতায় দুস্থ বাংলাদেশের প্রতীক, রাজনীতির কূটচালে জিম্মি। দেশ ও দ্রৌপদী একাত্ম হয়ে

ওঠে—যাকে যথেচ্ছ ভোগ করা যায়, ব্যবহার করা যায় এবং দায়হীনভাবে সমর্পণও করা যায় প্রতিপক্ষের কাছে, যারা দায়হীনভাবে দেশকে সমর্পণে বিশ্বাসী কবি তাদেরকে নির্দেশ করেছেন 'মদমত্ত বর্বর' হিসেবে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের নেপথ্যে কাহিনির দীর্ঘসূত্রতা থাকলেও শামসুর রাহমান কেবল বস্ত্রহরণ এবং হরণের ভেতরে ফুটে ওঠা অবমাননার নির্যাসটুকু গ্রহণ করেছেন দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যায়, তাঁর সমকালে দ্রৌপদী অবমানিত দেশের উপযুক্ত প্রত্নপ্রতিমা। দেশের সংকটকালে, স্বদেশের সংকট মোচনকল্পে কবির দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, কারণ দেশ যথার্থ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত, এই সূত্রে কবি ইঙ্গিতে জানিয়ে রাখেন দ্রোহের প্রজ্জ্বলিত আগুনে দগ্ধ হয়েও তিনি স্বদেশ ও স্বাধীনতার পক্ষের লোক। দেশের সংকটাবস্থার প্রতীক শামসুর রাহমান গ্রিক পুরাণ থেকেও সংগ্রহ করেছেন। বারবার স্বৈরতন্ত্রের নাগপাশে শৃঙ্খলিত হয়েছে দেশ, তাই 'আর্তনাদ করে ওঠে দেশ বন্দি প্রমিথিউসের মতো' ('বেশ ভালই তো', *খুব বেশি ভাল থাকতে নেই*)। দেবতাদের মধ্যে মানুষ ও মানবসভ্যতার প্রতি সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন প্রমিথিউস। মানুষের হাতে তিনি সমর্পণ করেছিলেন আগুনের উত্তরাধিকার, জিউস তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেন : 'হেফাস্টাস কঠিনতম শৃঙ্খল দিয়ে ককেসাসের নির্জন চূড়ায় প্রমিথিউসকে বেঁধে রাখবেন আর প্রতিদিন জিউসের ঈগল এসে তাঁর যকৃত ছিঁড়ে খাবে। সারাদিন তাঁর এই যন্ত্রণা চলবে, রাতে নতুন যকৃত সৃষ্টি হবে—পরের প্রভাতে আবার আসবে জিউসের ঈগল' (খান, ১৯৮৪ : ১০৩)। প্রমিথিউসের সেই বন্দিদশার করুণ-কঠিন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে পান কবি বাংলাদেশের।[১৯] স্বাধীনতার পর দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, স্বৈরতন্ত্রের নিষ্পেষণ—বিপর্যস্ত করে তোলে সাধারণ মানুষের জীবন, সেইসঙ্গে কবির সৃজন-মননের জগতে সংকট ঘনিয়ে আসে। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শামসুর রাহমান তাঁর কবিতাকে করে তোলেন সাংস্কৃতিক হাতিয়ার, কবিতা পরিষদের সংঘবদ্ধ স্বৈরাচারবিরোধী কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযুক্তি ছিল, সেই সংযোগসূত্রে তাঁর সাহসী উচ্চারণ : 'আমার কবিতা গণঅভ্যুত্থানের চূড়ায় নূহের/ দীপ্তিমান জলযান ('শুচি হয়', *মঞ্চের মাঝখানে*)। সমকালের সংকটে সামাজিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার বিষয়টিকে তিনি 'কবির দায়' হিসেবে বিবেচনা করেছেন, গণতন্ত্রের পতন এবং স্বৈরতন্ত্রে আক্রান্ত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যারা সুবিধাবাদী অবস্থানে থাকেন, তাদের জন্য রয়েছে সাবধানবাণী, কবি বলেছেন : 'তাদের হিসেব নেবে যারা/ একদিন, তারা জানি বাড়ছে গোকূলে সুনিশ্চিত' ('তিনটি স্তবক', *মঞ্চের মাঝখানে*)। কংসবিনাশী কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল গোকূলে, বাংলার বুকে স্বৈরাচার-পতনের শক্তি সমাহিত অবস্থায় ছিল, সেই সুপ্ত শক্তি কৃষ্ণের মতো সংগোপনে বেড়ে উঠেছিল বাঙালির জাতিসত্তায়। পরবর্তীকালে সেই শক্তির উত্থানে, সাধারণ জনতা এবং কবিতা পরিষদের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের মুখে পরাভূত হয় স্বৈরশাসক। কিন্তু স্বাধীন দেশে বারবার

এমন নির্দয়ভাবে স্বপ্ন ভাঙার কথা ছিল না, প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতায় স্বাধীনতাকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেন তুমুল বিক্ষোভে :

আমার শিশুর দোলনায় ঝুঁকে
দাঁড়াবে না কোনো কবন্ধ প্রেত, প্রেম-নিমগ্ন
যুগলের চুমো খাওয়ার প্রহরে পড়বে না ছায়া
হাড়-হাভাতের, কথা দিয়েছিলে স্বাধীনতা তুমি
কথা দিয়েছিলে মেহেদি-রাঙানো রমণীয় হাত
উষ্ণ রক্তে কোনো দিন আর উঠবে না ভিজে,
কোনো যুবা আর গুলির আঘাতে, রাজপথে পড়ে
আজরাইলের ডানার ঝাপটে হবে না উধাও।

('কে দেবে জবাব', *আমার ক'জন সঙ্গী*)

ভারতীয় পুরাণে কবন্ধ ভয়ঙ্করদর্শন রাক্ষস : 'সে মুণ্ডগ্রীবাহীন কবন্ধ, তার উদরে মুখ এবং তাতে একটিমাত্র জ্বলন্ত চোখ অগ্নিশিখার মত বর্তমান' (সরকার, ১৩৩৫ : ৮৯)। কবন্ধ রাক্ষসের প্রেতসন্ত্রাস, মৃত্যুদূত আজরাইলের ডানার আধিপত্য-বিস্তারী কালের প্রাসঙ্গিকতা কবির স্বদেশে শেষ হয়নি, যদিও স্বাধীনতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল সুদিন ফেরানোর জন্য, বিরূপ সময়ের চক্রে বন্দি স্বাধীনতা মূক, পরাহত। 'মেহেদি-রাঙ্গানো হাত' বাঙালির বিবাহ রীতির ঐতিহ্যিক অংশ, নতুন স্বপ্নে ভরে ওঠা জীবনের প্রতীক। সে জীবনের নিরাপত্তা, শিশুর হাসি, প্রেমের নিঃশঙ্ক অবকাশ এ দেশে নতুন করে গড়ে ওঠেনি। তাই মৃত্যুর দূত আজরাইলের ডানার ঝাপট সময়ে-অসময়ে বেজে উঠেছে বাংলার কেন্দ্রে ও প্রান্তে; মানুষের না পাওয়ার হাহাকার, বেদনাদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস কবির কাছে পৌঁছে গেছে, কবি অবিরাম তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন সেই বেদনাকাতর ভাষ্য।

কালের চক্রে সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য সেই পরিবর্তনের ভেতরে শামসুর রাহমান যতটা ইতিবাচকতার ইশারা দেখতে পান তার চেয়ে বেশি দেখেন বিনষ্টির ছবি। শামসুর রাহমানের চোখের সামনে ক্রমাগত বদলে গেছে ইতিহাস, বদলেছে সমাজ-সভ্যতার চারিত্র্য; পুঁজিবাদের আগ্রাসন, সংঘাতের রাজনীতি, মানুষের মূঢ়-মূক অবস্থা, যন্ত্রসভ্যতার চাপে পিষ্ট মানবসত্তা ধরা পড়েছে পৌরাণিক বীক্ষণে :

ক. এখন আমার মধ্যজীবন যিশুর মতন
ক্রুশকাঠে ক্রূর পেরেকময়;

('মধ্যজীবনের বৃত্তান্ত', *আমার কোনো তাড়া নেই*)

খ. কবন্ধ এই সমাজ এখন শ্মশানবাসী,
আমিও এখানে দশের মতোই ওড়াই ছাই,
বাজলো কি আজ ইস্রাফিলের ভীষণ বাঁশি?
('এই আশ্বিনে', *যে অঙ্ক সুন্দরী কাঁদে*)

গ. কেউ বেশুমার বিত্ত
হেলায় করছে জড়ো বাণিজ্যের অশ্বমেধে
('আপস', *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*)

ঘ. জাগর বিজ্ঞানপুষ্ট শক্তির সংহারী মত্ততায়
দ্রৌপদী সভ্যতা দ্যাখে নিরুপায় সর্বনাশ তার।
('নিরন্তর দোটানায়', *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*)

ঙ. আধখানা যন্ত্র আর অর্ধেক মানব হয়ে আছি।
('নাও টেনে নাও', *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*)

উদ্ধৃতি 'ক'-তে শামসুর রাহমান ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রিয় প্রতীক 'ক্রুশ', সমাজে মধ্যবিত্তের অবস্থা যেমন ত্রিশঙ্কুর মতো দোদুল্যমান, শ্রেণি-অবস্থানগতভাবেও তেমনি অস্থিতিশীল তাদের অস্তিত্ব। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ প্রতীককে তিনি টেনে এনেছেন মধ্যবিত্তের স্বভাবধর্ম বিশ্লেষণে; স্বার্থকাতর, অলস-মদির জীবনে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত নিজের আদর্শে টলটলায়মান, তাই 'ডাস ক্যাপিটাল' ও 'লেনিনের বাণী' জপতে থাকা মন সমর্পিত হয়ে চায় ধর্মের অলৌকিক মহিমায় : 'আঁধি ও ব্যাধিতে দিশেহারা মনে ধর্মগ্রন্থ কেমন অলীক ছায়া বিছায়।' মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়নের ভেতরে প্রেম ও সমাজপরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা আছে, তবে তারচেয়ে অনেক সময় বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বার্থ। মধ্যবিত্তের অতীতচারী রোমান্টিক মন ধূসর প্রায় প্রেমের স্মৃতিরোমন্থন থেকে জেগে ওঠে, সান্ত্বনা খোঁজে এই ভেবে যে : 'চিরদিন কেউ করে না ভ্রমণ বৃন্দাবনে' ('এই আশ্বিনে'), কৃষ্ণকেও এক সময় বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় পাড়ি দিতে হয়েছিল। আবার মিছিলের শ্লোগানেও এই মধ্যবিত্ত রক্ত নেচে ওঠে। দ্বিচারী মন ও হতচেতন-দিশেহারা সত্তা নিয়ে মধ্যবিত্ত চারিত্র্যকে কটাক্ষ হানেন কবি, তিনি নিজেও এই সমাজভুক্ত, সেকথা স্বীকার করে নেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় ছায়া ফেলে যে সমাজ, সেই সমাজকে তিনি 'কবন্ধ' অর্থাৎ 'মুণ্ডগ্রীবাহীন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে 'ইস্রাফিলের ভীষণ বাঁশি' বাজার আশঙ্কায় কবি মুহ্যমান, সৃষ্টি বিলয়ের প্রতীক ইস্রাফিলের বাঁশি। উদাহরণ 'খ'-তে তিনি ভারতীয় পুরাণের কবন্ধ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের ইস্রাফিলের বাঁশির প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন সমাজ-চারিত্র্য নির্দেশে। শামসুর রাহমান সমাজ-সচেতন কবি ছিলেন, এই সচেতনতা যতটা তাত্ত্বিক

তারচেয়ে অনেক বেশি মানবিক। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে মানবতা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুঁজির আগ্রাসনে। পুরাণে প্রতাপশালী রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবৃতি পাওয়া যায়, এই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের বাণিজ্যরীতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখেন শামসুর রাহমান, উদ্ধৃতি 'গ'-তে রয়েছে সেই প্রসঙ্গ। অশ্বমেধের অশ্বের মতো পুঁজিবাদ সারা পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে তার অদৃশ্য প্রভাব-বলয় সৃষ্টি করেছে, মানুষ বশ্যতা স্বীকার করেছে নীরবে, কখনো ইচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায়।[২০] উদাহরণ 'ঘ'-তে সভ্যতাকে শামসুর রাহমান দেখেছেন দ্রৌপদীর প্রতীকে। এ কোন্ সভ্যতা? আধুনিক বিজ্ঞানপুষ্ট সভ্যতা, যে বিজ্ঞান একাধারে সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ, অন্যদিকে অভিসম্পাত। নিরন্তর দোটানায় থাকা কবি বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন, কেননা যে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে সুস্থ জীবন, শত বছরের আয়ু সেই বিজ্ঞান মুহূর্তে মেতে উঠতে পারে 'সংহারী মত্ততায়', পারমাণবিক অস্ত্র সভ্যতা-বিধ্বংসী এবং মানবতা-বিনাশী এক আবিষ্কার। বিজ্ঞানের নেতিবাচক আবিষ্কারের প্রয়োগের সর্বনাশা উদাহরণ দেখেছে জাপান, যেমন দ্রৌপদী দেখেছিল তার অসহায় সর্বনাশ কৌরব রাজসভায়। উদাহরণ 'ঙ'-তে কবি নিজেকে অর্ধ-মানব, অর্ধ-যন্ত্ররূপে শনাক্ত করেছেন, আধুনিক নাগরিক সভ্যতা এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যে যন্ত্রসভ্যতার সূচনা হয়েছে সেই যন্ত্রসভ্যতার নিষ্পেষণে কবির এমন রূপান্তর, রবীন্দ্রনাথ পুরাণের নর্তকী উর্বশীকে বলেছিলেন 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা', কবির সেরকমই আধাআধি অবস্থা। যন্ত্রসভ্যতার চাপে গড়ে ওঠা এই অবয়ব যেন পৌরাণিক সেই স্ফিংসের মতো, অর্ধ-নারী, অর্ধ-পশু[২১] দিয়ে যার শরীর গঠিত। অর্ধমানব অর্ধযন্ত্রের এই জীবন ভীষণ ব্যাধির মতো, প্রকৃতিকে বিনষ্ট করেছে যান্ত্রিক সভ্যতা, নির্মল প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তন করাই এই বিনষ্টি ও ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

**রূপকথা ও কিংবদন্তি**

কবির সত্তা মুহূর্তে পরিভ্রমণ করতে পারে ত্রিলোক, বস্তুবিশ্বে কবির যাতায়াত আলোর গতিতে, কাজেই রূপকথার আলাদিনের মতো শূন্যচারী গালিচা নেই বলে কবির মানসভ্রমণ থেমে থাকে না। শামসুর রাহমান পুরনো ঢাকার যে পারিবারিক আবহে বড় হয়ে উঠেছিলেন সেটি ছিল রক্ষণশীল, সেখানে রূপকথার কল্পরাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো কেউ ছিল না, পরবর্তীকালে ইয়াকুব নামে কবির ফুপাতো ভাই তাকে রূপকথার জগতের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছিল, তাঁর আত্মকথা *কালের ধুলোয় লেখা*তে বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন : 'ইয়াকুব আলী ভাইয়ের রূপকথার ভাণ্ডারই আমার 'হাতির শুঁড়' কবিতার উৎস।' (রাহমান, ২০০৪ : ২০৭) রূপকথা শিশুতোষ, লঘুচালের কাহিনি হিসেবে বিবেচিত, কিন্তু সেই রূপকথার হালকা চালের কাহিনির ভেতরে জীবনের গুরুতর বিষয়ের প্রতিফলন

ঘটানো সম্ভব, 'হাতির শুঁড়'-এ সেটা করে দেখিয়েছেন শামসুর রাহমান। 'রূপকথার গল্প কিন্তু শিশু পুরাণ। জীবনের বিভিন্ন সময়ের উপযুক্ত বিভিন্ন প্রকার মিথ থাকে এতে। বয়স যত বাড়ে ততোই আপনার প্রয়োজন হয় কঠিনতর মিথতত্ত্ব' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ২১৭)। কঠিনতর মিথতত্ত্বের জন্ম রূপকথার ভেতরেই হতে পারে উপযুক্ত পরিচর্যায়, কবিতায় বস্তুবিশ্বকে নির্মাণে কল্পকাহিনি হতে পারে উৎকৃষ্ট প্রতীক-উৎস। রূপকথা শামসুর রাহমানের প্রতীক নির্মাণের দক্ষতাকে সম্প্রসারিত করেছিল, তিনি আইয়ুবী সমর-শাসনের যাতাকলে পিষ্ট, বাকস্বাধীনতা হারিয়ে ফেলা বাঙালি জাতিসত্তার অবদমিত ভাষণকে রূপকথার আশ্রয়ে দিয়েছিলেন কাব্যরূপ। সামরিক শাসনের নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'হাতির শুঁড়' কবিতাটি। এ কবিতার নিহিতার্থে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক বাস্তবতা, অন্যদিকে কবিতাটির বাইরের অবয়ব নির্মিত হয়েছে রূপকথার অলৌকিক অনুষঙ্গমালায় সজ্জিত হয়ে :

মরুভূমি, দূরের পাহাড়, মায়ার হ্রদ
উড়ন্ত সেই গালিচাটায় হচ্ছে পার।
সাত সফরে এই জীবনের সত্যসার
সিন্দাবাদের নখমুকুরে বিম্বিত।
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি চিহ্নিত
ঘুমের খাটে শঙ্খমালা ঘুমন্ত;
কৌটো খোলা ভোমরা মরে জীবন্ত।
('হাতির শুঁড়', *রৌদ্র করোটিতে*)

এটি মূলত ব্যঙ্গমিশ্রিত কবিতা—স্বরবৃত্তের লঘু চালে নির্মিত 'হাতির শুঁড়' কবিতায় ব্যবহৃত 'পক্ষীরাজ', 'রাজকুমার', 'দৈত্যদানো', 'সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি', 'শঙ্খমালা', 'ভোমরা'—রূপকথা থেকে আহৃত শব্দমালা, যা মৌল বক্তব্যের ওপর অলৌকিক আবরণ তৈরি করেছে, বাকরুদ্ধতার কালে সেই প্রতীকী ভুবনের ভেতরে কবি সমকালীন সংকটের সার তুলে ধরেছেন। রূপকথার নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করে তিনি কবিয়াল রমেশ শীলের অনত, সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ অবস্থান নির্দেশ করে লিখেছিলেন 'কবিয়াল রমেশ শীল' কবিতাটি :

অন্ধকারে থেকে, মনে পড়ে,
দেখতাম রুদ্ধবাক প্রধান যাত্রার তুমি রাজপুত্র, নিঃশঙ্ক, সুকান্ত
সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিতা সত্যকে

অক্লেশে জাগাতে চাও, অভিশপ্ত রাজ্যের উদ্ধারে
কোষমুক্ত করো তরবারি। তুমি পাষাণপুরীর
প্রতিটি মূর্তির স্তব্ধতায় চেয়েছিলে ছিটোতে রুপালি জল।
('কবিয়াল রমেশ শীল', *নিজ বাসভূমে*)

লোকজ কবি রমেশ শীলের প্রতি প্রাণের প্রণতি জানাতে গিয়ে এ কবিতায় তিনি 'রাজপুত্র', 'সোনার কাঠি', 'পাষাণপুরী'—এসব রূপকথা আশ্রয়ী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এভাবে শামসুর রাহমান রূপকথার শিশুতোষ কল্পকাহিনিকে করে তোলেন প্রতীকী মর্যাদা সম্পন্ন, ফলে নতুনতর অর্থতাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লোকঐতিহ্যের এই ধারাটি : 'রূপকথা ফ্যান্টাসির ব্যক্তিগত স্বপ্নের ছবির জগতে ইচ্ছা-পূরণের আনন্দ থেকে উন্নত স্তরে উঠতে পারেনি, তাই শিশুর মনোতোষণে এখনো সে নিয়োজিত।.. কিন্তু সৃষ্টিশীল প্রতিভা এগুলিকে সঙ্কেতের সাহায্যে মিথে রূপান্তরিত করতে পারে' (রায়, ১৯৯৪ : ১১)। শামসুর রাহমানের হাতে রূপকথার কাহিনি, চরিত্র ও ঘটনাধারা রূপান্তরিত হয়ে গভীর তাৎপর্য নিয়ে কবিতায় প্রযুক্ত হয়েছে, রূপকথা শিশুতোষণের দায়মুক্ত হয়ে চৈতন্যকে জাগানোর কাজে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু দেশীয় রূপকথার ভাণ্ডার নয়, বিদেশি রূপকথার অনুষঙ্গও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের 'শিকি জোৎস্নার আলো' কবিতায় হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা প্রসঙ্গ এসেছে। জার্মানির হ্যামেলিন শহরে গড়ে ওঠে বাঁশিওয়ালা ও ইঁদুর তাড়ানোর অদ্ভুত কাহিনি, নিজের অপারগতাকে নির্দেশ করে এ কবিতায় তিনি বলেছেন :

অকুণ্ঠ কবুল করি শিখিনি এমন মন্ত্র যার বলে
আমার বাঁশির সুরে শহরের সমস্ত ইঁদুর,
রাঙা টুকটুকে সব ছেলেমেয়ে হবে অনুগামী,
কৃতকর্মে অনুতপ্ত পৌরসভা চাইবে মার্জনা।
('সিকি জোৎস্নার আলো', *রৌদ্র করোটিতে*)

এছাড়া অনেক কবিতাতে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকথার কল্পজগৎকেন্দ্রিক শব্দমালা।[২২] রূপকথার শিশুতোষ ভুবন থেকে তিনি তুলে এনেছেন দৈত্যদানো প্রসঙ্গ। শামসুর রাহমানের কবিতায় শুভ এবং অশুভের সাংঘর্ষিক অবস্থান দেখা যায়, অশুভের বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু সতর্ক অবস্থানে ছিলেন, অশুভের প্রতীক পিশাচ এবং দৈত্যদানো : 'দৈত্যদানো বধ করার অর্থ অশুভ শক্তি বশ করা' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ২১৭)।

রূপকথা ছাড়াও লোককথা ও কিংবদন্তির দ্বারস্থ হয়েছেন শামসুর রাহমান কবিতার বিষয়নির্মাণের প্রয়োজনে। মহুয়া, মলুয়া লোকসাহিত্যের উজ্জ্বল দুটি চরিত্র, লোকমুখে রচিত এসব কাহিনির উৎস ছিল কিংবদন্তি। মহুয়া ও নদেরচাঁদ প্রেম-প্রসঙ্গ শামসুর রাহমানের কবিতাকে সংযুক্ত করেছে দেশজ লৌকিক ঐতিহ্যের সঙ্গে, বিষ্ণু দে'র কবিতায় এ প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় : 'বিষ্ণু দে দেখিয়েছেন প্রাকৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে অর্থাৎ দেশজ লৌকিক মানসের সঙ্গে কাব্যের একটি সৃষ্টিশীল সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে' (ত্রিপাঠি, ১৯৫৮ : ২৩৩)। বিষ্ণু দে এ প্রবণতা পেয়েছিলেন লোরকার কাছ থেকে। শামসুর রাহমান কবিতাচর্চার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, পরবর্তীকালে তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবের প্রেরণাকে তিনি স্বীকার করে নেন। তবে কাব্য-অভিযাত্রায় তিরিশের অন্যান্য কবির তুলনায় শামসুর রাহমানের সঙ্গে বিষ্ণু দে'র সাদৃশ্য অনেক বেশি। একাধিক কাব্যগুরুর আধিপত্য স্বীকার, বাম রাজনীতির সমর্থন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণের সমন্বিত ব্যবহার অথবা লৌকিক ঐতিহ্যকে আধুনিক কবিতার বিষয়ী করে তোলা—এসব কাব্যপ্রবণতার বিচারে শামসুর রাহমান বিষ্ণু দে'র নিকটবর্তী কবি। তাঁর কাব্যে লোকপুরাণের[২৩] উদাহরণ :

ক. করিনি শিকার কুড়া বন-বনান্তরে,
তবুও পেয়েছি আমি মলুয়াকে কদমতলায়!
('আবার নিভৃতে', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

খ. অকস্মাৎ মহুয়া, নদেরচাঁদ কংসাই নদীর ধারে হাত
ধরাধরি ক'রে হাঁটে, হুমরা বেদের বিষছুরি
আঁধারে ঝলসে ওঠে
('পথের আহ্বান', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)

গ. ...খরার পরে সবুজের বানে
ভেসে যাই; অতঃপর হেলেনের চেয়েও অধিক
মহুয়ার রূপের কদর হয় গাথা আর গানে।
('কাঠের ঘোড়া', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

কবির উত্তর-আধুনিক শিল্পবোধ লৌকিক সাহিত্য ও লোকপুরাণের ঋণে হয়ে ওঠে ঋদ্ধ। কিংবদন্তিঋদ্ধ বাংলার লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন মহুয়া ও নদেরচাঁদের প্রেম-আখ্যান। এছাড়া মলুয়া, ভেলুয়া ও আমির সদাগরের কাহিনিকে উপজীব্য করেও তিনি সাজিয়েছেন কবিতার পঙ্‌ক্তি। *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি* কাব্যের 'মহুয়ার মন' কবিতায় কবির মানসপ্রিয়া গৌরী অভিন্ন হয়ে ওঠে মহুয়ার রূপকল্পে। এ কাব্যের আরেকটি কবিতা

'মহুয়া আসছে', যেখানে কবি নিজেই প্রতীক্ষারত নদেরচাঁদের ভূমিকায়, তুলে আনেন মহুয়ার মৃত্যু-ট্র্যাজেডি :

> কিন্তু সৌন্দর্যই হলো কাল
> শেষ অব্দি; বিষ-ছুরি, পুরুষের সিক্ত, লকলকে
> লালসার জিভ থেকে পারিনি বাঁচাতে তাকে, বাজে
> তার মৃত্যুধ্বনি, আমাকেও ঘিরে ধরে ক্রূর জাল।

এছাড়া টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো কাব্যের 'বৈশাখ সুস্পষ্ট লেখে' এবং 'অনন্তের গোধূলি রঙিন পথে' কবিতায় মহুয়া ও নদেরচাঁদ প্রসঙ্গ এসেছে : 'চৈত্রসংক্রান্তির রাতে ডাগর চাঁদের দিকে ছলছল চোখে/ তাকিয়ে নদেরচাঁদ মহুয়ার কথা ভাবে। তাকে কি কখনও/ ফিরে পাবে আর?' লোককথা ও কিংবদন্তিকে তিনি অধিকাংশ কবিতায় অপরিবর্তিত রূপে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে লোকজ প্রেম, প্রতিহিংসা, প্রেমের আনন্দ ও অচরিতার্থতার বেদনা ঘন হয়ে উঠেছে।

**জ্ঞাত্যর্থ নির্মাণে পুরাণ**

কিছু শব্দ অনুচ্চারিত থেকেও উচ্চারণের চেয়ে বেশি তীব্রতা ছড়ায়, 'বলা হয় যে, শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দ শোনানোর দায় কবিতার' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ৩২২)। অশ্রুত উচ্চারণকে কীভাবে শ্রুতিময় করে তুলবেন, সে নান্দনিক দায় কবির একার। কবিতা মূলত কবির দেখার চোখ, যে চোখে তিনি পারিপার্শ্বকে দেখেন, সেই চোখ আর সবার মতো নয়, কবি যা দেখেন তার একটা স্বতন্ত্র অর্থ তৈরি করেন এবং পাঠকের উপলব্ধিতে পৌঁছে দেন। কী দেখেন কবি? কোন্ চোখে দেখেন? পুরাণে শিব অর্থাৎ মহাদেবের দুটি চোখের বাইরে আরেকটি চোখ ছিল, যাকে বলা হয় তৃতীয় নয়ন। কবির অন্তর্লোকেও তেমনি জন্ম নেয় এক তৃতীয় নয়ন, তৃতীয় সেই চোখ ছাড়া সাধারণ মানবীয় চোখে ধরা পড়ে না জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা সূক্ষ্ম অসঙ্গতি। শামসুর রাহমানও কবি হিসেবে পেয়েছিলেন তৃতীয় আরেক নয়নের উত্তরাধিকার, যে চোখে ধরা পড়ে ব্যাধিগ্রস্ত সময়ের ছবি, তৃতীয় নয়নে প্রতিচ্ছবি ফেলে অন্তরালের দৃশ্যাবলি : 'ইদানীং আমার একান্ত স্বাভাবিক দু'চোখের/ মাঝখানে নতুন একটি চোখ জেগে থাকে ঢের/ নাটকীয়তায়' ('তৃতীয় চোখ', *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*)। শামসুর রাহমান কবিতার বক্তব্য নির্মাণের অভিপ্রায়ে এমন কিছু অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন যেখানে সরাসরি পুরাণের উল্লেখ নেই, কিন্তু পুরাণের নির্যাসে স্নাত হয়ে নির্মিত হয়েছে সেইসব ভাষ্য, যা প্রচলিত অর্থের বাইরে এক ভিন্ন অর্থের দিকে পাঠকের মনোযোগকে চালিত করে। শিব এবং তাঁর তৃতীয় নয়নের উল্লেখ না

করে তিনি নতুন এক চোখের কথা বলেন, নতুন এই চোখে তিনি যা কিছু দেখেন, তাকেই চৈতন্যে লালন করেন এবং তারই অনুসরণে নির্মিত হয় কবিতার পঙক্তি। পুরাণকে অনুক্ত রেখে পৌরাণিক নির্যাস অবলম্বনে তিনি অনেক কবিতা নির্মাণ করেছেন, 'অপাঙ্‌ক্তেয়' কবিতাটি পুরাণের নির্যাসসমৃদ্ধ :

মিথ্যাকে কখনো ভুলে সুন্দর ফুলের রমণীয়
স্তবকের মতো আমি পারিনি সাজাতে বঞ্চনায়,
বরং করিনি দ্বিধা কণ্ঠে তুলে নিতে আজীবন
সত্যের গরল।

('অপাঙ্‌ক্তেয়', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

প্রথাগত জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, অন্যদিকে সত্যানুসন্ধানী প্রথা-ভাঙা সত্তাকে হতে হয় 'নীলকণ্ঠ', মিথ্যার রঙিন হাতছানি থেকে কবির চৈতন্য মুক্ত। অমৃত প্রত্যাশীদের অমৃত উত্তোলনের সময় উত্থিত বিষ যেমন শিব কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, তেমনি সত্য বিষময় হলেও কবি মিথ্যার বঞ্চনায়-ভ্রান্তিতে প্রলুব্ধ হননি। আধুনিক যুগের জটিলতায় সত্যকে ধারণ করা সুকঠিন, প্রথার বাইরে দাঁড়িয়ে সত্যের পক্ষাবলম্বন বিষ কণ্ঠে তুলে নেয়ার মতো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'অপাঙক্তেয়' কবিতায় তিনি শিব এবং অমৃত-উত্তোলনের পৌরাণিক আখ্যানকে সরাসরি ব্যবহার না করেও 'করিনি দ্বিধা কণ্ঠে তুলে নিতে আজীবন সত্যের গরল' বক্তব্য নির্মাণ করেছেন অমৃত-উত্তোলনের স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালব্যাপী সেই মহাযজ্ঞের নির্যাস দিয়ে। *মঞ্চের মাঝখানে* কাব্যের 'দেখব কুড়ানো' কবিতায় 'মদন ভস্ম' প্রসঙ্গ, *সে এক পরবাসে কাব্যে* 'নীলকণ্ঠ বাংলাদেশ' শিরোনামের কবিতা এবং *খণ্ডিত গৌরব* কাব্যের 'নিশিডাক' কবিতার 'হলাহল' প্রসঙ্গ শিবের পৌরাণিক কাহিনির নির্যাসে নির্মিত, যেখানে কবির বক্তব্য পুরাণকে অতিক্রম করে নতুন অর্থবোধকতার দরোজা খুলে দিয়েছে, ফলে এসব বক্তব্যে পুরাণ থাকা সত্ত্বেও তা যেন শুধু পৌরাণিক নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। পুরাণকে পটভূমিতে রেখে জ্ঞাত্যর্থ নির্মাণের আরও কিছু উদাহরণ :

ক. চক্ষু কোটরে নিশীথ অশ্ব
রেখে গেছে কত দুঃস্বপ্নের আঁধি।
লিবিডো-তাড়িত সুনীল গুহায়
নিজেকে সোনালী সাপের শরীরে বাঁধি।

('ভালোবাসা তুমি', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

খ. দ্যাখো আমাদের ভালোবাসা
নাম্নী গাছটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়িয়ে রেখেছে এক সাপ চক্রান্তের
কুণ্ডলীর মতো।

('বর্ণমালা দিয়ে গাঁথা', *সে এক পরবাসে*)

গ. তোমাদের চোখে কি পড়েনি আমার বানানো
সেই বাগিচা যা আদম ও হাওয়ার উদ্যানের চেয়েও সুন্দর,
অথচ সেখানে নেই সবুজ সাপের হিসহিসে পরামর্শ?

('নিজের পায়ের দিকে তাকাতেই', *আকাশ আসবে নেমে*)

পুরাণের যে নির্জ্ঞান সংস্কৃতিতে-ঐতিহ্যে মিশে গেছে বহু বছরের চর্চায় সেই অভিজ্ঞান অবচেতনে হলেও ছায়া ফেলে, উপরিউক্ত উদাহরণত্রয়ীতে তার প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাপকে নেতিবাচকভাবে দেখার বিষয়টি আদি থেকে *বাইবেল* এবং পশ্চিম-এশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত, সাপকে মনে করা হয় আদি পাপ, মানুষ বেহেশত তথা নন্দনকানন থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রকৃতিশাসিত রুদ্র পৃথিবীতে নেমে এসেছিল সাপের প্ররোচনায়। তাই আদম, হাওয়া এবং নন্দনকানন প্রসঙ্গের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে পড়ে সাপের পৌরাণিক অনুষঙ্গ। মানবস্রষ্টার সাজানো নন্দনকাননে হানা দিয়েছিল সাপ এবং সাপের প্ররোচনাতেই পৃথিবীতে মানব-বসতি গড়তে আসেন আদম—এটি প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক সত্য। ফলে পেছনে পড়ে থাকে নন্দনকাননেন সুখ-স্বপ্নের জগৎ, মাটির পৃথিবীতে এসেও মানব বিস্মৃত হয়নি যে, 'পৃথিবীতে পাপ নিয়ে আসে সাপ।' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ৮২) এজন্যই শামসুর রাহমানের কবিতায় নন্দনকাননের চেয়ে সুন্দর ও সাজানো বাগানের সঙ্গে সাপের প্রসঙ্গ উঠে আসে পুরাণ-অভিজ্ঞতা-স্নাত হয়ে। মানুষের জীবন-বাসনার সঙ্গে সাপের সম্পর্ক আদি ও পুরনো। এমনকি পুরাণবাহিত সেই অভিজ্ঞানের প্রভাবে বাসনামদির কবি দয়িতাকে দেখেন সাপের চিত্রকল্পে : 'একটি কেমন সাপ, তুমি শুয়ে চিত্রবৎ খাটে' ('শয্যায়', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)। সাপ কামনা-বাসনা তথা আদি পাপের প্রতীক। পৌরাণিক অভিজ্ঞান সৃষ্টির পেছনে সক্রিয় থাকে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব, পশ্চিম এশীয় এবং ইউরোপীয় অঞ্চলে সাপকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হলেও ভারতের নদী-বনাঞ্চল ঘেরা সাপ-উপদ্রুত অঞ্চলে সাপকে দেখা হয়েছে দেবীরূপে। ভারতীয় লোকপুরাণের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে শামসুর রাহমান আর্য-আধিপত্যের বিপরীতে অনার্য সভ্যতার প্রতীক হিসেবে উজ্জ্বল করে তুলেছেন মনসাকে।[২৪] তবে কবিতায় প্রতিফলিত কবির প্রতীকী বিশ্বাস অনড়-অবিনশ্বর নয়, পুরাণ-ঐতিহ্যের প্রচলিত মূল্যবোধকে অতিক্রম করে কবি যখন নতুনতর কোন ব্যঞ্জনা সংযোজন করতে চান, তখন একই পুরাণ ভিন্ন অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, ভেঙে যেতে পারে পূর্বে বা পরে নির্মিত প্রত্যয়-দৃঢ়তা, যেটি ঘটেছে

'চাঁদ সদাগর' (*ইকারুসের আকাশ*) কবিতায়, মনসাকেন্দ্রিক মূল্যবোধ সেখানে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে কবিতার অন্তরকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে।

পৌরাণিক সৌরভে নির্মিত *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি* কাব্যের 'মহুয়ার মন' কবিতায় কবি বলেছেন :

> কদমতলার স্মৃতি আজো
> রূপালি মাছের মতো ভেসে ওঠে। বাজো, বাঁশি বাজো,
> উঠুক পায়ের মল নেচে আজ এ শহরময়।
>
> (*তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

কাব্যনায়িকা গৌরীর প্রেম-ভারাক্রান্ত মনে স্মৃতি-ছায়া ফেলে কদম-কানন, যে অভিপ্রেত বাঁশি বেজে ওঠার উচ্ছাস ধরা পড়ে কবিতায় সেটি একইসঙ্গে মহুয়া ও নদের চাঁদ এবং রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক পুরাণ-বাহিত, তাদের নাম-পরিচয় উহ্য থাকলেও 'কদমতলা' ও 'বাঁশি'র উল্লেখে চেতন-অভিজ্ঞতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে মহুয়া-নদের চাঁদ ও রাধা-কৃষ্ণ, অন্তরালে প্রবহমান লোকজীবনের আখ্যান-নির্যাসে সুরভিত হয় স্মৃতিসত্তা। গ্রিক পুরাণে আরেক বাঁশিওয়ালা অর্ফিয়ুসের স্মৃতিনির্যাস অবলম্বনে লিখেছেন 'একই রাগিণীর বিভিন্ন আলাপ' (*সে এক পরবাসে*) কবিতাটি। বাঁশিতে সুর তোলার দক্ষতায় অর্ফিয়ুস দেবতাদের সমকক্ষ হলেও রক্তমাংসের মানুষ বলেই সে করেছিল মানবীয় ভুল, ইউরিদিকে পাতালপুরী থেকে ফিরিয়ে আনার প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে মুহূর্তের ভুলে। সেই ভুলের পৌরাণিক অভিজ্ঞান কবির চেতনায় মিশে গিয়েছিল বলেই তিনি ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যাপারে সতর্ক : 'ভালোবাসা দাঁড়ানো যৌবনের মদিরতায়।/ একবারও ফিরে তাকাইনি, যদি সে গোলাপের/ সৌরভের মতো মিলিয়ে যায় হাওয়ায়।' কবিতাটিতে অর্ফিয়ুস বা ইউরিদিকের নাম উল্লেখ না করলেও স্মৃতি-অভিজ্ঞান হাতড়ে পুরাণে দয়িতাকে হারানো অর্ফিয়ুস-ট্র্যাজেডির সঙ্গে কবির বক্তব্য একাত্ম হয়ে যায়।

### রূপান্তরিত পুরাণ

পুরাণ-নির্ভরতা আধুনিক বাংলা কবিতার সহজাত প্রবণতা। আধুনিকতার প্রথম পর্বে বাংলা কবিতা নতুন যুগের তোরণ-দ্বারে প্রবেশ করেছিল রূপান্তরিত পুরাণকে সঙ্গী করে, পুরাণের রূপান্তর সাধিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের কলমে। পূর্বের পুরাণকেন্দ্রিক গতানুগতিকতার ধারা ভেঙে দিয়ে পুরাণের ভেতর দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছিলেন নতুন যুগের নতুন আকাঙ্ক্ষা। ফলে, ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে পুরাণ পেয়েছিল সর্বজনীন রূপ, উন্মোচিত হয়েছিল ভারতীয় পুরাণকে রূপায়ণের নতুনতর সম্ভাবনা-

ক্ষেত্র। সেই সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে শামসুর রাহমান অনেক কবিতাতে ভেঙেছেন পুরাণের ঐতিহ্য, ফলে অনেক ঘটনা এবং চরিত্র ভিন্নতর তাৎপর্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়—'জতুগৃহ' শব্দটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ, শব্দটির অর্থবোধকতার জায়গাটিকে তিনি বারবার ভেঙেছেন, 'জতুগৃহ' কখনো প্রেম আবার কখনো দগ্ধ সমকালের সমার্থবাচক।[২৫] এই শব্দটিকে পঞ্চপাণ্ডবের জীবন ও রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করে তিনি প্রেমের উপাখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। 'আমার দুঃখের ভারে' (*ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*) এবং 'অপ্রেমের কবিতা'য় (*হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*) 'জতুগৃহ' শব্দটির পৌরাণিক ইশারার ভেতরে রয়েছে ভিন্নতর প্রতীকী তাৎপর্য। অবশ্য প্রতীক নির্মাণের ক্ষেত্রে কবি প্রতীকের পুরাণ-উৎসের প্রতি আক্ষরিকভাবে বিশ্বস্ত থাকবেন অথবা পাঠকের কল্পনার সঙ্গে কতখানি যোগাযোগের সুতো বাঁধবেন সেই পরিমাপটি প্রধান নয়, প্রতীকের বোঝাপড়া হয় চিন্তাশীল সত্তার সঙ্গে।[২৬] কবিকে প্রতীকাশ্রয়ী হতে হয় কাব্য-কাঠামোকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেবার প্রয়োজনে, গদ্যের মতো বক্তব্যের বিস্তার কাব্য-কাঠামোয় অসম্ভব, এ কারণে বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রসারণে কবিকে আশ্রয় নিতে হয় প্রতীকের। কাব্যের সিদ্ধি এবং ঋদ্ধির নিয়ামক এই প্রতীক : 'রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে-ছবি আঁকে, গোটা-কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের জাদু সে ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে' (দত্ত, ২০০২ : ২৪)। প্রতীক নির্মাণের প্রয়োজনে পুরাণকে প্রচলিত অর্থতাৎপর্য থেকে বিযুক্ত করে কবি সৃষ্টি করেন রূপান্তরিত পুরাণ, যেমন 'চাঁদ সদাগর' (*উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*) কবিতায় দেবিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মনসার আগ্রাসনকে কটাক্ষ করে তিনি তাঁকে প্রতীকায়িত করেছেন স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকায়, যে জোরপূর্বক চাঁদের আদর্শ ও বিশ্বাস এবং আর্থ-সামাজিক জীবন-কাঠামোকে বদলে দিয়েছে।

*মহাভারতের* অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শামসুর রাহমানের অনেক কবিতায় সমাজ ও রাজনীতি-বীক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব সত্যবতী থেকে ব্যাসদেব হয়ে রাজা শান্তনুর বংশধারা পর্যন্ত এক বিশাল পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু 'কাজ' কবিতায় ধৃতরাষ্ট্রের সেই অন্ধত্বকে কবি রূপান্তরিত করেছেন দয়িতার দর্শন-বঞ্চিত প্রেমিকসত্তার অন্তর্দহনে : 'মাকড়সা জাল বোনে দু'চোখে আমার/ ক্রমাগত, প্রায় ধৃতরাষ্ট্র হওয়ার আশঙ্কা আজ/ তোমার অভাবে' (*তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)। প্রেম প্রসঙ্গে *রামায়ণের* 'বিশল্যকরণী' প্রসঙ্গের রূপান্তর ঘটিয়েছেন 'একজন হরিণীর গল্প' কবিতায় : 'হাতের মুঠোয় নাচে বিশল্যকরণ, আর নয় অসম্ভব/ হৃদয়ের বিষণ্ন ক্ষতের নিরাময়' (*গৃহযুদ্ধের আগে*)। *রামায়ণে* লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষার্থে বিশল্যকরণী প্রয়োগ করা

হয়েছিল, অঙ্গের ক্ষত নিরাময়ে প্রয়োগ-উপযুক্ত এই ভেষজ-চিকিৎসাকে তিনি হৃদয়ের ক্ষত নিরাময়ের উপযোগী করে তুলেছেন কবিতায়।

লোক-পুরাণের রাধা দয়িতার চিরায়ত মূর্তি, শামসুর রাহমান রাধা-কৃষ্ণের পুরাণ অনুষঙ্গ ব্যবহার করে নির্মাণ করেছেন অনেক কবিতা, যেখানে পুরাণ-ঐতিহ্যানুসরণ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। 'তোমার জন্য মশাল' (*নায়কের ছায়া*) কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের প্রচলিত পৌরাণিক ধারণা ভেঙে দিয়েছেন, 'বাঁশি' বেজেছে এবং রাধাসুলভ ব্যাকুলতাও সেখানে রয়েছে, কিন্তু প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র। যন্ত্রসভ্যতা-শাসিত আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের একটি শ্রেণি প্রতিনিয়ত বাঁশির শব্দ শ্রবণ করে এবং অভিসারিকা রাধার ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে যায়, সে ব্যাকুলতায় হৃদয়ের উত্তাপ না থাকলেও জীবিকার তাড়না রয়েছে :

> ঘড়ি ন'বার বাঁশি বাজাবার আগেই পড়ি কি মরি রাধার মতো
> ব্যাকুলতায় তড়িঘড়ি তুমি ছোটো, ছোটো, ছোটো
> সেই বিরাট দালানের দিকে, যেখানে
> তুমি লেখো খাতা।

কেরানির জীবন ও জীবিকার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দেন রাধার পুরাণ, এখানে অস্থির সময়ের তাড়নারূপে রাধা-অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন কবি। 'শয্যায়' কবিতায় শামসুর রাহমান তাঁর প্রিয় পৌরাণিক অনুষঙ্গ 'ক্রুশে'র প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন ভিন্নতর অর্থতাৎপর্য সৃষ্টির প্রয়াসে :

> যুগলবন্দিতে ক্রমাগত
> শিশিরের সৃষ্টি হয় আর অবগহনকালীন
> তুমি তো মাংসল পুণ্য ক্রুশে বিদ্ধ, যিশু হও নারী।
> (*দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

*বাইবেলের* পৌরাণিক বিশ্বাসে যিশু ঈশ্বরপুত্র, বৃহত্তর মানবতার প্রশ্নে তিনি হয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধ, এ কবিতায় যিশু রূপান্তরিত হয়েছেন বাসনার আদিমতম রূপের প্রতিকল্পে।

### সমন্বিত পুরাণ

শামসুর রাহমানের কবিতায় একক চরিত্র যেমন পুরাণ-অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি একাধিক পৌরাণিক চরিত্র কবিতার ভোজসভায় সাড়ম্বরে উপস্থিত হয়েছে, যেন কার্নিভাল। রবীন্দ্রনাথ, লালন, পাবলো নেরুদা প্রমুখ কবিব্যক্তিত্ব যেমন শ্রেণি-অবস্থান, শ্রেষ্ঠত্বের বিচার ভুলে

পসরা সাজিয়ে বসে কবির কবিতায়; তেমনি গ্রিক পুরাণ, ভারতীয় পুরাণ, লোকপুরাণ, পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য—নানা উৎস থেকে উত্থিত চরিত্রেরা সমবেত হয়ে কবিতার অবয়বকে দিয়েছে পূর্ণতা, বক্তব্যকে করেছে ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ :

ক. অর্ফিয়ুসের বংশীধ্বনি,
চাঁদ সদাগর আর মনসার আপোসহীন বিবাদ,
নূহর নির্মাণকালে পাথর আর লতাগুল্মের সঙ্গে
ফরহাদের আলাপ—
('এখনো খুঁজছি', *নায়কের ছায়া*)

খ. বাঁশির সুরে নীল যমুনা স্মৃতিকাতর,
অর্ফিয়ুসের সামনে আসে বনের পশু,
গুল্মলতা, নুড়িপাথর।
('বাঁশি', *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*)

গ. চীনে বয়ে যায় ঈষৎ নতুন হাওয়া
জাপানকে আজ স্বর্ণমারীচ ডাকে
কানায় কানায় ভরাট অস্ত্রাগার,
নানা প্রান্তরে হিটলারী-প্রেত হাঁকে!
ম্যানিলা ক্ষুব্ধ প্রমিথিউসের মতো,
দুঃস্বপ্নের চরে ঘোরে মার্কোস।
ঘায়, রেগানের যাত্রা নাস্তি আর
লেবাননে জ্বলে মেশিনগানের রোষ।
('কিছু সামাজিক কিছু বিদগ্ধ', *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*)

গ. দেখে নিও আমি মহাপুরুষের ভূমিকায় ঠিক
উৎরে যাবো একদিন। হবো তথাগত কিংবা যিশু,
দগ্ধীভূত আত্মায় ফেলবে ছায়া কোনো বোধিদ্রুম।
('অপচয়ের স্মৃতি', *বিধ্বস্ত নীলিমা*)

অর্ফিয়ুস, চাঁদ সদাগর, মনসা, নূহ, ফরহাদ—প্রতিটি পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে স্বতন্ত্র আখ্যান প্রচলিত রয়েছে, এসব আখ্যানের তাৎপর্য ভিন্ন, জন্ম-উৎস আলাদা হলেও কবিতায় এদের সহাবস্থানে রেখেছেন কবি। 'বাঁশির সুরে নীল যমুনা স্মৃতিকাতর' বাক্যটি স্মরণে নিয়ে আসে রাধা-কৃষ্ণের পুরাণ,

তাদের প্রেমের পটভূমিতে নীল যমুনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কবি এই বাক্যটির পরেই বাঁশির জগতে অমর সুরের স্রষ্টা গ্রিক পুরাণের চরিত্র অর্ফিয়ুস প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। কৃষ্ণ প্রেমিক ও পরমাত্মা, তাঁর বাঁশিতে জীবাত্মারূপী রাধা ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে যমুনা-কূলে, অন্যদিকে অর্ফিয়ুসের মানবকল্যাণী বাঁশির সুরে জীব-জড় উভয়েই সমানভাবে প্রভাবিত হত, ভারতীয় লৌকিক পুরাণের কৃষ্ণের বাঁশি এবং গ্রিক পুরাণের বাদক অর্ফিয়ুসের বাঁশির যৌগপত্যে নির্মিত হয়েছে কবিতার ভাষ্য। বিশ্বরাজনীতির চালচিত্র ব্যাখ্যায় তিনি পুরাণের নানা উৎসের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং সমন্বিত পুরাণ-সহযোগে রাজনীতির কূট-চারিত্র্য বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছেন। অহিংসা এবং মানবকল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে কবি এক সারিতে রেখেছেন বুদ্ধ এবং যিশুকে। প্রতীচ্যপুরাণ ও ভারতীয় পুরাণের লৌকিক ভুবন ঘুরে তাঁর সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টিপথে উঠে আসে মলুয়া, বেহুলা এবং আফ্রোদিতির রূপকল্প :

অকস্মাৎ
মনে হয় মলুয়া সুন্দরী আর বেহুলা সাগরে নামে আর
আফ্রোদিতি সমস্ত শরীরময় সাদা ফেনা নিয়ে
ব্রাইটন বিচে উঠে আসে।

('ব্রাইটন বিচে', *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*)

লোকপুরাণ থেকে সংগৃহীত দুটি উজ্জ্বল চরিত্র মলুয়া এবং বেহুলা, তাদের রূপান্তর ঘটে আফ্রোদিতিরূপে, যার উত্থান ঘটেছিল সমুদ্রের ফেনা থেকে। কবি বাস্তবকে পুরাণকল্পে এবং পুরাণকল্পকে বাস্তবের প্রতিচ্ছায়ায় নিয়ে আসেন, এজন্য ব্রাইটন বিচের নারীরা যেমন জলে নামে মলুয়া বা বেহুলার বেশে, সমুদ্রের ফেনা থেকে তারা উঠে আসে আফ্রোদিতি হয়ে, আর কবি প্রিয়তম নারীর যৌবনদীপ্ত অবয়ব দেখতে পান এসব পৌরাণিক চরিত্রের আবরণে। শামসুর রাহমানের কবিতায় গ্রিক পুরাণের নানা দেবী[২৭] বিষয়রূপে বিন্যস্ত হয়েছেন, তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন আফ্রোদিতির প্রসঙ্গ। আফ্রোদিতিকে ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে সমন্বিত করে নির্মাণ করেছেন 'চক্ষুবিশেষজ্ঞ বলে দেননি' এবং 'অযৌক্তিক' কবিতাদ্বয় :

ক. দরজার দিকে আবছা
তাকেই চোখে পড়ে আফ্রোদিতি, যার প্রস্ফুটিত
নগ্নতায় সামুদ্রিক ফেনার ফুরফুরে চাদর, চকিতে দুর্গার
সংহারমূর্তি ধারণ করে তেড়ে আসে আমার দিকে।

('চক্ষুবিশেষজ্ঞ বলে দেননি', *সৌন্দর্য আমার ঘরে*)

খ. নিরুত্তর আমি দেখি আমার সমুখে বীণা হাতে
সুস্মিত দাঁড়ালো অর্ফিয়ুস, আফ্রোদিতি
সারা গায় সমুদ্রের ফেনা নিয়ে ভাসমান পদ্ম থেকে নেমে
এলেন বিজন ঘাটে।
('অযৌক্তিক', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*)

'চক্ষুবিশেষজ্ঞ বলে দেননি' কবিতায় আফ্রোদিতির সুন্দর, সুকুমার মূর্তি রূপান্তরিত হয় দুর্গার বিধ্বংসী প্রতিমূর্তিতে। এসব ঘটে কবির দৃষ্টি বিভ্রান্তির জন্য, এসব অসংলগ্ন চিত্র ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ হিসেবে দৃষ্টিপথে উঠে আসার কারণ কবির সত্তা অস্থির, 'ছন্নছাড়া দাবদাহ' তাঁকে পোড়াচ্ছে অহর্নিশ। সত্য যখন কদর্য আক্রমণে পর্যুদস্ত তখন 'কাবিল' কবির দিকে পাথর ছুঁড়ে দেয়, আর 'সক্রেটিস' হাতে তুলে দেয় হেমলক বিষ, সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরাজিত সৈনিক এরা। এছাড়া 'সংবাদপত্রে কোনো একটি ছবি দেখে' কবিতার একই পাত্রে গ্রিক পুরাণের 'ইকারুস' ও ভারতীয় পুরাণের 'চাঁদ সদাগরকে' পরিবেশন করেছেন, দু'জনেই কবির শিল্পিসত্তার প্রতীক। 'একটি দুপুরের উপকথা' (*উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*) কবিতায় 'আফ্রোদিতি', 'ল্যাজারস', 'জতুগৃহ', 'অলকাপুরী' ইত্যাদি শব্দে গ্রিক, বাইবেল ও ভারতীয় পৌরাণিক অনুষঙ্গের সমন্বয় ঘটিয়েছেন কবি; 'বস্তুত গাছপাথর নেই' কবিতায় এসেছে 'হাইড্রা', 'বেদেনী', 'চণ্ডাল' প্রসঙ্গ।

**ঋষি সমাচার**

যোগ-সাধনা, সাধনা-সিদ্ধিতে বর লাভ, তুষ্ট হলে আশীর্বাদ, ক্রোধান্বিত হলে অভিশাপ প্রদান—এরকম নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতীয় পুরাণের মুনি-ঋষিদের চারিত্রিক বিকাশ। শামসুর রাহমানের কবিতার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ঋষি-সমাচার, কবিতার নিহিতার্থ গঠনে, বক্তব্যকে স্বচ্ছকরণে অথবা আলঙ্কারিক প্রয়োজনে এসব চরিত্র এবং চরিত্রকে ঘিরে প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানকে তিনি ব্যবহার করেছেন বহু কবিতায়। তিনি বেশি ব্যবহার করেছেন ভারতীয় পুরাণের সবচেয়ে তেজী এবং কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট দুর্বাসা মুনির অনুষঙ্গ, রাগ অথবা অভিসম্পাতের প্রসঙ্গ এলে তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন দুর্বাসার নাম। দুর্বাসা নানা সময়ে নানাজনকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন, তবে তাঁর অভিসম্পাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যদুবংশ, তাঁর অভিশাপে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব যে মুষল প্রসব করেন তারই প্রত্যাঘাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়। দুর্বাসার ক্রোধ এবং কোপনস্বভাবের পরিচায়ক অনেক পঙ্‌ক্তি শামসুর রাহমান নির্মাণ করেছেন :

ক. ক্রোধান্বিত হলে,
ক্রোধের গরগরে চিহ্নগুলি থাকত ছড়িয়ে
দুর্বাসার মতো জেদী পয়ারের প্রতিটি সারিতে।
('প্রবেশাধিকার নেই', *বন্দিশিবির থেকে*)

খ. ...দুর্বাসার মতো
কমণ্ডলু ছুড়ে তপোবনে অকস্মাৎ
ভীষণ ভয়ার্ত করে তুলেছিল হরিণ শিশুকে
('ঘৃণা, তুই', *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*)

গ. অনিদ্রা কন্বের তপোবনে
রুক্ষ, রুদ্র, কট্টোর দুর্বাসা।
('অনিদ্রা', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

এছাড়া দুর্বাসা প্রসঙ্গ রয়েছে 'অভিশাপ দিচ্ছি' (*ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*) কবিতায়, যেখানে একাত্তরে বর্বরোচিত গণহত্যায় যারা মেতে উঠেছিল তাদের উদ্দেশে কবি দুর্বাসাসুলভ অভিসম্পাতের পঙক্তিমালা রচনা করেছেন। 'সৌন্দর্যের গুণ গেয়ে', (*আমার ক'জন সঙ্গী*) কবিতায় বলেছেন : 'তোমার দুর্নাম/ রটনাকারীকে দুর্বাসার/ ক্রোধে ভস্ম করি পাঁচবার'—যার বিরুদ্ধে রটনা সে কে? দয়িতা নাকি কবিতা? দয়িতা অথবা কবিতা যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন, দুর্নাম রটনাকারীদের প্রতি কবির ক্রোধ দুর্বাসার সমতুল্য। 'একটি গাছ', ( *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*) কবিতায় দূরের গাছের প্রতি মমতায় বিগলিত দয়িতাকে অনুযোগ করে কবি বলেছেন : 'অথচ আমি যে এতো কাছের মানুষ/ তাকে কেন মাঝে মাঝে দুর্বাসা-চৈত্রের ঝাঁঝ দাও।' কোন এক কবির মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে পড়ার পর কবির স্মৃতিকোষে সজীব হয়ে ওঠে তার দিনযাপনের ধরন, কবির স্বভাব ছিল ক্ষিপ্ত, প্রাক্তন এই কবির দুর্বাসা-মেজাজের প্রসঙ্গ এসেছে 'বেলা পড়ে আসে' (*ধুলোয় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*) কবিতায়। এছাড়া 'কফিন, দোলনচাঁপা এবং কোকিল' (*দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*) কবিতায় দুর্বাসা প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

*মহাভারত*সহ আঠারটি পুরাণ ও উপপুরাণ-প্রণেতা মহর্ষি ব্যাসদেব, তাঁর প্রসঙ্গ শামসুর রাহমান 'ক্ষত এবং ধনুক' কবিতায় ব্যবহার করেছেন :

অস্পষ্ট আঘ্রাণ তার স্মৃতিকে জোগাবে আমরণ
নিভৃতে উচ্ছিষ্ট মধু আর আমি দ্বৈপায়ন, রণ—

ছুট আজ, স্বেচ্ছাবন্দি; লোনা জলোচ্ছ্বাসে অবিরত
মেলাই বিষাদ-গাথা।
(*প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

যমুনা নদীর দ্বীপে সত্যবতীর গর্ভ থেকে জন্ম নেন ব্যাসদেব, দ্বীপে জন্ম বলে তাঁর পরিচিতি হয় দ্বৈপায়ন নামে। এছাড়া তাঁর কবিতায় পৌরাণিক চিত্রকল্প হিসেবে এসেছে অষ্টাবক্র মুনির প্রসঙ্গ : 'আমার চিন্তার/ গা বেয়ে ক্রমশ নামে মাকড়সা, অষ্টাবক্র মুণি' ('ঘুমাতে যাবার আগে', *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার*)। *অষ্টাবক্র সংহিতার* প্রণেতা অষ্টাবক্র মুনির বক্র শরীরকে বিভঙ্গ চিন্তার নানা বাঁকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তৈরি হয়েছে মাকড়শার সভঙ্গ শরীরের প্রতিকল্প। পৌরাণিক ভাষ্যমতে, পিতার অভিশাপে জন্মের সময় তার শরীরের অষ্টস্থান বক্র ছিল বলে তাকে অষ্টাবক্র নামে অভিহিত করা হয়। পরশুরামের কুঠার-সংক্রান্ত পুরাণ তিনি ব্যবহার করেছেন 'দরোজার কাছে' (*ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*) কবিতায়, প্রেমের অচরিতার্থতার আশঙ্কায় কবি বেছে নেন পরশুরামের একুশবার পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞাদীপ্ততা। প্রেম প্রসঙ্গেই অগস্ত্য মুনির উল্লেখ, 'আমি ভারি লোভাতুর' (*এক ধরনের অহংকার*) শিরোনামের কবিতায় লোভাতুর প্রেমিক-সত্তার স্বরূপ বোঝাতে অগস্ত্য মুনির অনন্য শোষণ-ক্ষমতাকে উপমা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করেছেন শামসুর রাহমান। শুধু মুনি-ঋষি নন, মুনিবধূ মৈত্রেয়ীকে নিয়ে প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানকে তিনি উপজীব্য করেছেন 'প্রত্যাখ্যান' (*আমার ক'জন সঙ্গী*) কবিতায়, জ্ঞানতৃষ্ণার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে পার্থিব সম্পত্তি লাভের বাসনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মহর্ষি যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী মৈত্রেয়ী, তাঁর সেই 'প্রত্যাখ্যান' শামসুর রাহমানের কবিতার শিরোনাম হয়ে ফিরে এসেছে ।

**বৌদ্ধ পুরাণ**

গ্রিক পুরাণ, ভারতীয় পুরাণ ও পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ শামসুর রাহমানের কবিতাকে করেছে শাণিত, কবিতাকে পৌঁছে দিয়েছে তার নিহিত তাৎপর্যের দ্বারে। তিনি ছিলেন মূলত মানবতাবাদী, এ কারণে তিনি গৌতম বুদ্ধের অহিংসা ও মানবতার আদর্শকে আত্মীকরণ করে কবিতা নির্মাণ করেছেন। 'কালবেলার সংলাপ' (*ধ্বংসের কিনারে বসে*) শিরোনামের কবিতাটি গৌতম বুদ্ধ ও সুজাতার কথোপকথন দিয়ে সাজানো, কবিতার শিরোনাম বহন করছে দুঃসময়ের বীজ, স্বাধীন বাংলাদেশে কবির চোখে নানা মানবিক বিপর্যয় ধরা পড়েছে প্রতিনিয়ত, কবিকে সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নারীর শ্লীলতাহানি, নিরীহ মানুষের দেশত্যাগ। 'কালবেলার সংলাপে'

গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সুজাতা সাম্প্রদায়িক সংকট নিয়ে আলাপরত, বুদ্ধ তাঁর ধ্যানের অভিজ্ঞান থেকে সুজাতাকে শক্তি যুগিয়েছেন, শুনিয়েছেন আশ্বাসের বাণী :

> কিছু আলো আমাদের অস্তিত্বের দিকে ঝুঁকে আছে আজো
> গাঢ় চুম্বনের মতো; আছে সম্প্রীতির চন্দ্রাতপ।

নষ্ট সময়ের অন্ধকার ছেঁকে অবশিষ্ট আলোর সংবাদ তিনি তুলে দেন সুজাতার কানে, অশুভের আগ্রাসনকে অস্বীকার করে শুভবাদী চেতনার প্রতি আস্থা স্থাপন করেন, জীবন দুঃখময়, এই দুঃখময় জীবনের ভেতরে তিনি বপন করতে চেয়েছেন অহিংসা ও মানবতার বীজ। তাঁর আর্যসত্যের সারসত্য হলো : 'এ জগতের সব জিনিসের প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ, ভোগবিলাস, হিংসা, রাগ-দ্বেষ, কামনা-বাসনা ও মোহ প্রভৃতি বর্জন করা এবং অন্যের প্রতি কুমনোভাব বা ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থেকে সব মানুষ ও প্রাণীকে ভালবাসায় দৃঢ়সংকল্প থাকতে হবে' (চাকমা, ১৯৯০ : ২১)। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিশাসিত আধুনিক বিশ্বে মানুষের লোভ-লালসা ও রিরংসাবৃত্তি সীমাহীন। মানবতাবাদী আদর্শের অবক্ষয় আর ক্ষমতার হাতবদলে চারপাশে শুধু ধ্বংসযজ্ঞ। বুদ্ধ তাঁর নিজের কালেই যুদ্ধবিরোধী অবস্থানে ছিলেন, এজন্য রাজপুত্র হয়েও ধ্যানের জ্ঞানমার্গ বেছে নিয়েছিলেন, জীবন কাটিয়েছেন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে, তাঁর পক্ষে এ কালের সহিংস চারিত্র্য সহ্য করা কতটা কঠিন হতো সেটাই শামসুর রাহমানের কলমের মুখে উঠে এসেছে : 'তথাগত দেখলে এমন ধ্বংস হতেন ভয়ার্ত অম্বালিতে' ('হৃদয় কপিলাবস্তু' *অবিরল জলভ্রমি*)। 'হৃদয় কপিলাবস্তু' কবিতার শিরোনামে তিনি ব্যবহার করেছেন বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলাবস্তুর নাম, এছাড়া এখানে তিনি 'সুজাতা' ও 'তণ্ডুল' শব্দের উল্লেখ করেন, বৌদ্ধ পুরাণে গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ-সাধনার সঙ্গে সুজাতা এবং তাঁর প্রদেয় তণ্ডুল বিশেষভাবে স্মরণীয়। সুজাতার তণ্ডুল খেয়ে নিরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যানস্থ হয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম হয়েছিলেন বোধিপ্রাপ্ত, হয়ে উঠেছিলেন বুদ্ধ। কালের প্রবাহে সুজাতা ও তণ্ডুল প্রদানের বিবর্তনকে শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন উইটের রসে সিক্ত করে : 'বয়সিনী ভিখারিনী জানালার ফ্রেমে, ওর শীর্ণ খড়ি ওঠা/ প্রসারিত হাতে তুমি তুলে দিলে স্ন্যাক্স হে সুজাতা' ('আমরা কি যেতে পারি', *আমার ক'জন সঙ্গী*)।

গৌতম বুদ্ধ নানা নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর মূল নাম সিদ্ধার্থ, পারিবারিক উপাধি 'গৌতম', বোধিপ্রাপ্তির পর পরিচিতি 'বুদ্ধ' হিসেবে। এছাড়া তিনি 'তথাগত' নামেও পরিচিত ছিলেন, শামসুর রাহমান বৌদ্ধ পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুদ্ধকে নানা নামে সম্বোধন করেছেন, 'উল্টো দিকে যাচ্ছে ছুটে ট্রেন' (*প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*) কবিতায় 'গৌতম বুদ্ধ', 'এই যে আমি এলাম' (*ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই*)

কবিতায় 'বুদ্ধ', 'হৃদয় কপিলাবস্তু' (*অবিরল জলভ্রমি*) কবিতায় 'তথাগত' নাম ব্যবহার করেছেন। শামসুর রাহমান অহিংসার আদর্শকে চৈতন্যে ধারণ করতে চেয়েছেন, মানবতাবাদী চেতনায় স্নাত ছিলেন তিনি আমৃত্যু। কালের আঘাতে বিপর্যস্ত চৈতন্যে, স্বদেশের নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে দৃষ্টিপথে ধ্যানী-বুদ্ধ প্রশান্তির চিত্রকল্প নিয়ে আসে :

> উদাস দৃষ্টিতে
> তাকাই সম্মুখে, দেখি বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমতলে
> ধ্যানমগ্ন আছেন একাকী বসে।
>
> ('শুধু চাই স্পর্শ সাধনার', *গোরস্থানে কোকিলের করুণ আহ্বান*)

ধর্ম ও জীবনসাধনায় নয়, কবিতার সাধনায় তিনি বুদ্ধের মতো ধ্যানী হয়ে উঠতে চান, শামসুর রাহমান গৃহী ধ্যানী আর গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগী, সামাজিক জীবনের পিছুটানে আটকে থেকে কবিতার ধ্যানে মগ্ন কবি বলেছেন : 'গৌতম বুদ্ধের মতো সংসারত্যাগী হওয়ার/ ভাবনা মনে উঁকি দিল না কখনও, যদিও প্রায়শ নিজস্ব ধরনে বসে যাই শব্দ ও ছন্দের ধ্যানে' ('সকালে ঘুম ভাঙার পর', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)। শামসুর রাহমান *বিধ্বস্ত নীলিমা* কাব্যের 'অপচয়ের স্মৃতি' কবিতায় গৌতম বুদ্ধের প্রসঙ্গ প্রথম ব্যবহার করেন, সর্বশেষ ব্যবহার করেন *গোরস্থানে কোকিলের করুণ আহ্বান* কাব্যে, এ কাব্যের 'শুধু স্পর্শ চাই সাধনার' কবিতাটিতে বৌদ্ধ-পুরাণ ব্যবহারের পর শামসুর রাহমান পরবর্তী কাব্যগুলোর কোথাও আর পুরাণ-প্রসঙ্গ ব্যবহার করে কবিতা নির্মাণ করেননি।

**মৃত্যুচেতনা রূপায়ণে পুরাণ**

ভারতীয় পুরাণে 'রাহু' আলোগ্রাসী, বাঙালি জীবনে পৌরাণিক 'রাহু' অন্ধকারের প্রতীক হিসেবে প্রবাচনিক মূল্য পেয়েছে। জীবনের আলো নিভে যাওয়া গোধূলি প্রান্তরে এসে কবি বার্ধক্যে আক্রান্ত হওয়ার আর্তি প্রকাশে বেছে নেন রাহু-সংক্রান্ত পুরাণ—'পড়েছে রাহুর ছায়া দীর্ঘ হয়ে আমার আয়ুতে ক্রমাগত'। যে কবি যৌবনের পূজারী, বয়সকে ঘৃণা করেন, সে কবির কাছে বার্ধক্য রাহুর মতোই অন্ধকারের আগ্রাসন । শামসুর রাহমান প্রথম মৃত্যুর ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় জীবন নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন কাব্যভুবনে, প্রথম মৃত্যু ছিল প্রতীকী মৃত্যু। পরবর্তীকালে বার্ধক্যে সমর্পিত কবির যাপিত জীবনে মৃত্যুভাবনা হানা দিয়েছে, তাঁর মৃত্যুচেতনা এসেছে পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের 'আজরাইল'কে কেন্দ্র করে। আজরাইল মৃত্যুর দূত, শরীর থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা, এ কারণে মৃত্যু এবং আজরাইল একে-অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শামসুর রাহমান ব্যক্তিগত

মৃত্যুভাবনা রূপায়িত করতে যেমন আজরাইলের ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন, তেমনি মৃত্যুমুখী সময়ের মুঠোয় বন্দি মানুষ ও মানবতার অবক্ষয়িত রূপও চিত্রায়িত করেছেন :

ক. এখন ঘন ঘন আমার চারপাশে আজরাইলের
চিরতরে দু'চোখ-বোজানো কৃষ্ণ ডানা
ঝলসে উঠছে।

('অর্ফিয়ুস হওয়ার জন্যে', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*)

খ. শহরের
আনাচে-কানাচে
আজরাইলের তীক্ষ্ম নখের আঁচড় অবিরত পড়েছে ব্যাপক, এমনকি
শহীদের কবরেও বয়ে গেছে বুলেটের ঝড়।

('এখন তো মৃতেরাই প্রশ্নশীল', *ধুলোয় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*)

গ. আমি তো দেখছি আজরাইল রাশি রাশি ইশতাহার
বিলি করে অলিতে-গলিতে,
চৌরাস্তায়, বাস টার্মিনালে এবং চালান করে কালো চুমো
ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, বেঘোর বস্তিতে।

('অপরাহ্নে একদল মিউজিশিয়ান', *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*)

ঘ. এ শহরে
প্রতিটি ফুলের মুখ থেকে
লালা ঝরে অবিরত কাঁচা মাংসের লালচে আর
আজরাইলের
তুহিন নিঃশ্বাস হয়ে হাওয়া ঘোরে আনাচে-কানাচে।

('এ কোথায় এসে', *ঝরনা আমার আঙুলে*)

উদাহরণ 'ক'-তে কবি আত্মমৃত্যুর আশঙ্কাকে রূপ দান করেছেন। উদাহরণ 'খ' মূলত এক শহীদের চোখে মৃত্যুময় একাত্তরের যুদ্ধস্মৃতি, যেখানে আজরাইলের অবাধ গতি শহীদের কবর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, হানাদার বাহিনী বারবার ভেঙেছে বাঙালির স্মৃতির মিনার, ভাষা শহীদদের আত্মদানের পবিত্র চিহ্নকে। উদাহরণ 'গ'-তে মৃত্যুময় সময়ের ভেতর নিমজ্জিত কবির প্রিয় শহর, স্বাধীনতা বিফলে পর্যবসিত, দুঃসময়ের আর্তি মিশে রয়েছে কবিতাটির অন্তরাবয়বের সঙ্গে; স্বদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে স্বপ্ন ভাঙার হাহাকার, নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা এবং অবিরাম হত্যাকাণ্ড, নিরীহ মানুষের রক্তক্ষরণ

এমন পরাবাস্তবমুখী চিত্র অঙ্কনে কবিকে প্রণোদিত করেছে। শামসুর রাহমানের *ঝরনা আমার আঙুলে* প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে, দেশ তখন স্বৈরতন্ত্রের কবলে, গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়েছে বহু আগে। রুক্ষ কাল ভেতরে ভেতরে ভ্রূণায়িত করেছে নষ্ট-বীজ, শুভচৈতন্যকে গ্রাস করেছে সহিংসতা, জীবনের নানাবিধ অনিশ্চয়তায় ভেতরে মৃত্যু খেলা করেছে 'আজরাইলের তুহিন নিঃশ্বাস হয়ে', উদাহরণ 'ঘ' সেই নষ্ট সময়ের আর্তনাদ।

কালের সংকটে কবির কণ্ঠ সরব হয়ে ওঠে নির্দ্বিধায়, বিশেষ করে নষ্ট সময়ের ভ্রষ্ট শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দায়বদ্ধ কবির সহজাত প্রবণতা। ফলে কবি এবং কবির কণ্ঠ দুটোই অপশাসকের চক্ষুশূল, কবির কণ্ঠ থেকে কবিতাকে 'আজরাইলের ধরনে' ('লড়াই', *ধ্বংসের কিনারে বসে*) উপড়ে নিতে তৎপর অশুভ শক্তি, অর্থাৎ এ শক্তি হয়ে উঠতে চায় কবিকণ্ঠের মৃত্যুদূত। হত্যাকারীর উদ্দেশ্য হত্যা করা, ফলে হত্যার তালিকা থেকে বাদ পড়েনি কবির স্বপ্ন। কবি দেখেছেন তাঁর স্বপ্নের হত্যাকারীদের 'নিঃশ্বাসে বয় আজরাইলের তিমির নিঃশ্বাস' ('স্বপ্নের নাম শ্রীমতি', *অবিরল জলভ্রমি*)।

শামসুর রাহমান মৃত্যুচেতনা দ্বারা তাড়িত হয়েছেন, মৃত্যুর মিছিল দেখে ভীত হয়েছেন, কিন্তু তিনি মূলত জীবনবাদী।[২৮] এ কারণে ক্ষণিকের ভীতিকে অতিক্রম করে জীবনবাদে উত্তরিত হয়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জীবনে ফেরার গল্প দিয়ে নির্মিত 'চলেই যেতাম' (*নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*) কবিতাটি। 'মরণের ফেরেশতা'র 'হিংস্র হিম ডানাকে' অতিক্রম করে জীবনের উজ্জ্বলতায়, কবিতার খাতার প্রশান্তিতে ফিরেছেন কবি, গেয়েছেন জীবনবাদের গান। মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবনবাদে উত্তরণের দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন 'শিরোনাম মনে পড়ে না' এবং 'জলপাইয়ের পল্লবে পল্লবে' (*শিরোনাম মনে পড়ে না*) কবিতাদ্বয়ে। 'শিরোনাম মনে পড়ে না' কবিতাটি বাস্তব-পরাবাস্তবের মিথস্ক্রিয়া, যেখানে কবির স্বপ্নচারী কবিতা 'আজরাইলের সঙ্গে পাশা' খেলে, শেষাবধি মৃত্যুর দূতকে পরাজিত করে কবির কবিতা বেহুলার ভেলার রূপকে গাঙুরের ঢেউয়ে ভেসে খুঁজে নেয় নতুন জীবনের দিশা। 'জলপাইয়ের পল্লবে পল্লবে' কবিতাটি নির্মিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত এক সৈনিকের বয়ানে, যার পাশে গুলিবিদ্ধ সহযোদ্ধার পচনশীল দেহের ভেতর থেকে উঠে আসে 'আজরাইলের ডানার' গন্ধ। সৈনিকের চেতনায় শামসুর রাহমান বুনে দেন নতুন জীবনে জেগে ওঠার স্বপ্ন, তাই মৃত্যুর জঠরে বসেও সৈনিক ভীষণ স্পর্ধায় অস্বীকার করতে চায় 'আজারাইলের ডানা'র দাপট, ছুঁড়ে দেয় মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা। এছাড়া 'আদাব আরজ' (*ধ্বংসের কিনারে বসে*), '২০ নম্বর ওয়ার্ডে' (*খুব বেশি ভাল থাকতে নেই*), 'জীবিতের পাথুরে স্তব্ধতা' (*ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে*) কবিতাসমূহে কবি মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করেছেন আজরাইলের অনুষঙ্গ।

**চরিত্রকেন্দ্রিক পুরাণের প্রয়োগ**

হাজার বছরের পুরনো পুরাণ-উৎসের কাছে কবি হিসেবে শামসুর রাহমানের ঋণ অপরিশোধ্য। কবিতায় রূপক-প্রতীক নির্মাণে, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বয়ানে, ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ চয়নে গ্রিক, ভারতীয়, পশ্চিম এশীয়, বৌদ্ধ পুরাণ তাঁকে দিয়েছিল অবারিত পুরাণ-ভাণ্ডার। ফলে, কবিতার উজ্জ্বল ভূমি নির্মাণ করে বাংলাদেশের কবিতার ধারায় শামসুর রাহমান গড়ে নিয়েছিলেন স্থায়ী আসন। কবিতায় শব্দ নির্বাচনে কবিকে হতে হয় সতর্ক, প্রচলিত জীবনের সাধারণ শব্দে অনেক সময় তিনি ভাব প্রকাশের উপযোগিতা খুঁজে পাননি :

> অনেক কিছু ঘটে গেছে
> এই শহরে। এমন কিছু যেসব শুধু
> শব্দ দিয়ে যায় না বলা। বলতে গেলে
> শব্দ যেন বোকা-সোকা
> লোকের মতোই থতোমতো।
> শব্দ তখন রুগ্ন খোঁড়া হাঁসের মতো
> হোঁচট খেয়ে বিড়ম্বিত।
>
> ('বস্তুর আড়ালে', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

বস্তুর আড়ালে যে বাস্তবসত্য থাকে সেটি প্রকাশের জন্য সাধারণ শব্দ যথেষ্ট নয়, এজন্য যে শক্তিসম্পন্ন শব্দের প্রয়োজন তা অনেক সময় পুরাণ থেকে আহরণ করা যায়, কবিকে সতর্কতার সাথে বেছে বেছে প্রতিনিধিত্বশীল শব্দ খুঁজে বের করতে হয়, শব্দের চতুরালিতে পুরাণ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

শামসুর রাহমান খণ্ড খণ্ড পৌরাণিক অনুষঙ্গ দিয়ে যেমন কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি তাঁর বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ কবিতা রয়েছে, যে কবিতাগুলোর শিরোনাম নির্বাচন করেছেন পুরাণ থেকে : 'আন্তিগোনে', 'টেলেমেকাস', 'স্যামসন', 'ইলেকট্রার গান', 'ইকারুসের আকাশ', 'চাঁদ সদাগর', 'ডেডেলাস', 'রুস্তম' ইত্যাদি কবিতার শিরোনাম নির্মিত হয়েছে পৌরাণিক চরিত্রের নামানুসারে। কোন কোন কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে ব্যবহার করেছেন পুরাণ, যেমন : 'ইকারুসের আকাশ', 'হোমারের স্বপ্নময় হাত', 'মাতাল ঋত্বিক'। শামসুর রাহমানের কবিতায় পৌরাণিক ভাষ্য নির্মাণের ধরন : প্রথমত—চরিত্রকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়ত—ঘটনাকেন্দ্রিক, তৃতীয়ত—শব্দানুষঙ্গকেন্দ্রিক। পুরাণের যেসব চরিত্র শামসুর রাহমানের কবিতায় বিশেষ স্থান দখল করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ইকারুস, নূহ,

যিশু, অর্ফিয়ুস, স্যামসন, চাঁদ সদাগর, বেহুলা-লখিন্দর, ইলেকট্রা, টেলেমেকাস প্রমুখ। গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক ঘটনা কুরুক্ষেত্র, খাণ্ডবদাহন, বস্ত্রহরণ, পাশাখেলা, মহররম। তবে শামসুর রাহমানের কবিতায় চরিত্রকেন্দ্রিক পুরাণ ব্যবহারের যে ব্যাপকতা দেখা যায়, সে তুলনায় পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ কম। কবিতায় অনেক সময় তিনি পৌরাণিক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা বিশেষ কোন তাৎপর্য বহন করে না, সাধারণ শব্দের মতো পঙ্‌ক্তি নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি এসব শব্দানুষঙ্গ কবিতার প্রাঙ্গণে টেনে এনেছেন। শব্দ কবিতা নির্মাণের ক্ষুদ্রতম একক, কবিতার প্রাণ, কবির সাধনা মূলত শব্দের সাধনা, কবিতায় শব্দের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শামসুর রাহমান 'বুদ্ধদেব বসুর প্রতি' কবিতায় বলেছিলেন : 'শব্দেই আমরা বাঁচি এবং শব্দের মৃগয়ায় /আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে অবিরাম' (*এক ধরনের অহংকার*)। তিরিশের ভাষা ও প্রকরণ-পরিচর্যার উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন 'এক শব্দ শিকারি প্রেমিক' ('অরূপ রতন', *স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*) হিসেবে। তাঁর শব্দ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা পুরাণ- অভিজ্ঞতা স্নাত হয়ে কবিতায় প্রবেশ করতে চায় : 'শব্দ হতে চায় বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক আর/ কোরান শরিফ' ('শব্দের আকাঙ্ক্ষা', *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*)। সেইসঙ্গে শব্দ প্রেমের জগতের উজ্জ্বল প্রতিমা এবং দয়িতার সঙ্গে একীভূত হয়ে কবিতায় স্থান পেতে চায় :

> শব্দ হতে চায়
> রাধিকা, লায়লা, শিঁরি, বেহুলা এবং
> আপন দয়িতার মধুর বচন।
>
> ('শব্দের আকাঙ্ক্ষা', *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*)

আমেরিকান কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের শব্দ-ব্যবহারের কুশলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন শামসুর রাহমান, শব্দের খেলায় তিনি বাজিমাত করেছিলেন, তাঁরই শোকার্ত স্মরণের সময় কবি তাঁর শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা নির্দেশে বেছে নেন ভারতীয় পুরাণের শিবকে : 'শব্দ নিয়ে তুমি শৈব নৃত্যে মেতেছ, অ্যালেন' ('অ্যালেনের জন্য এলিজি', সৌন্দর্য আমার ঘরে)।

পুরাণ থেকে শব্দঋণ গ্রহণের পাশাপাশি যেসব চরিত্র শামসুর রাহমান সংগ্রহ করেছেন, যুগধর্ম অনুযায়ী কবিতায় তাদের নবীভবন ঘটেছে। তাঁর চরিত্রকেন্দ্রিক পুরাণ নির্মাণের মূল প্রবণতা ব্যক্তিগত প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, সমস্যা-সংকটের সমীকরণ, তবে অনেক সময় ব্যক্তি-সমাচারের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সমকাল ও সমষ্টির সংকটের সঙ্গে গভীর যোগ। নূহ, যিশু, অর্ফিয়ুস, স্যামসন, চাঁদ সদাগর, ইলেকট্রা, টেলেমেকাস চরিত্রগুলো এজন্য তাঁর কবিতায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কোন কোন চরিত্র

কবির শিল্পিসত্তার প্রতীক, কোন চরিত্র পিতৃসত্তার প্রতীক আবার কোন কোন চরিত্রের ব্যক্তিক সংকটের ভেতরে উদ্ভাসিত সমকালীন সংকটের প্রতীকী রূপ। পৌরাণিক এসব চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিশেষ কিছু প্রবণতার সাহায্যে চিহ্নিত করা যায় :

ক. কবিসত্তার প্রতীক : ইকারুস, অর্ফিয়ুস, যিশু, চাঁদ সদাগর।

খ. পিতৃপ্রতিমা : ডেডেলাস, রুস্তম, অডিসিয়ুস, আগামেমনন।

গ. ত্রাতা : নূহ, স্যামসন, আন্তিগোনে।

এছাড়াও একিলিস, কর্ণ, একলব্য, লখিন্দর, বাসুকি – চরিত্র প্রসঙ্গক্রমে শামসুর রাহমানের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে।

**ক. কবিসত্তার প্রতীক**

**ইকারুস**

শামসুর রাহমান নিজেকে 'আকাশ-মাতাল' ('একজন পাইলট', *বিধ্বস্ত নীলিমা*) তকমা দিয়েছিলেন, কঠিন বস্তুজগতে বৃত্তাবদ্ধ জীবনের ভেতরে কবির আকাশগামী হওয়ার স্বপ্ন-বুনন, আকাশ হলো মুক্তির প্রান্তর, তাই 'নীলিমাকে' করেছিলেন 'সৃহৃদ'। তাঁর এই আকাশ-বিহারী সত্তা ইকারুসের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করেছিল, ইকারুস তাঁর কবিতায় মুক্ত শিল্পচৈতন্যের প্রতীক। ইকারুস ছাড়াও অর্ফিয়ুস তাঁর নন্দনচিন্তার, চাঁদ সদাগর তাঁর দ্রোহ-চেতনা ও টিকে থাকার শক্তির এবং যিশু তাঁর আর্ত চিত্তের প্রতিনিধি। এসব চরিত্র প্রতীক এবং অলঙ্কার হিসেবে তাঁর কবিতায় বহুবার বহুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রিক পুরাণের ইকারুস শামসুর রাহমানের শিল্পিসত্তার প্রতিরূপ, প্রকৃত শিল্পী মাত্রই ইকারুস-উপসর্গ আক্রান্ত। কারণ, শিল্পীর মুক্তির ভেতরে জন্ম নেয় যথার্থ শিল্পচৈতন্য, মুক্তির সেই পিচ্ছিল পথে যে-কোন শিল্পী ইকারুসের মতই পতনপ্রবণ, তবে মৃত্যুতে পাওয়া যায় অমরত্ব, চিরমৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে কাল থেকে কালান্তরে ব্যাপ্তি পায় শিল্পীর কর্ম। সৃষ্টির জন্য যন্ত্রণাভোগ, সাফল্য ও সার্থকতার প্রশ্নে ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা এবং শিল্পের অমরাবতীতে আসনলাভের আকাঙ্ক্ষা শামসুর রাহমানের কবিসত্তায় শুরু থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল, এ কারণে কবিতায় দগ্ধ উচ্চারণে ও প্রশ্নবানে নিজেকে বিক্ষত করেছেন প্রতিনিয়ত। ইকারুস যেমন জানতেন নির্ধারিত পথে উড়ে গেলে সুনিশ্চিত সুখময় জীবন, তবু নিয়মভাঙ্গার ক্ষণিক স্বাধীনতা ও অমরত্বের অমৃতনেশা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সূর্যের সান্নিধ্যে; শিল্পীও প্রচলিত সুখী জীবনের হিসেব-নিকেশ থেকে বেরিয়ে শুরু করেন শিল্পের বেহিসেবী জীবন। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে কবির সেই রুদ্র-রুক্ষ পথে চলা শুরু : 'শব্দের মোহন সুরে ঘর

ছেড়ে নির্দয় সূর্যের/ তৃণহীন প্রান্তরে হারাই পথ' ('নক্ষত্র-বিন্দুর জন্যে'), অথচ চারপাশে ছড়ানো প্রচলিত সুখের সংজ্ঞাঘেরা জীবন : 'স্বগৃহে বহু বিবেকী মানুষ/ সুখ-পরিমল পান করে কাটায় প্রহর কত/ উজ্জ্বল রেশম যব আর তিসির হিসেবে।' তবু সৃজনের অনিকেত পথে কবি হাঁটলেন প্রচলিত জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে, দ্বিতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার শ্রম-সাধনা সঙ্গী করে। ইকারুস হৃদয়ে ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বা তিরিশের কবিকুলের কাব্যবন্ধন থেকে বেরিয়ে কবিতার নিজস্ব আকাশ নির্মাণের স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন, যে স্পর্ধার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল পতনের আশঙ্কা। শামসুর রাহমান পতন-স্খলনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন অমরত্বের, আত্মসিদ্ধির কঠিন পথ পরিভ্রমণে ব্রতী ছিলেন আমৃত্যু। কবিতার বিষয় হিসেবে ইকারুস-পুরাণকে গ্রহণ ও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে বিশ্লেষণের কারণ—'এটাই কবির যাচনা, তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ, সূর্যদহন, সবকিছুই মোমের মতো গলে গিয়ে জ্বালাবে শিল্প-অমরাবতীর হাজারো বাতি। রাহমানের অমরত্ব লাভের নিভৃত ইচ্ছাটিই তাঁর ডানা-মেলা আর মৃত্যুবরণের প্যারাডাইমকে গ্রহণ করে' (কামাল, ২০১৪ : ১৪২)। শিল্পের ভুবনে অমরত্ব লাভের প্রত্যাশা তিনি বুনে দিয়েছেন 'সহজে ফোটাতে গিয়ে' কবিতায় :

> অমরতা সকল সময়
> কুহকের মতো ডাকে, একজন গহন মেস্তরি
> স্বপ্নে আসে বাঁশি হাতে; নিমেষে হৃদয় হয় রাধা।
>
> ('সহজে ফোটাতে গিয়ে', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

শিল্পের অমরাবতীতে ঠাঁই হবে কি হবে না প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সেই দ্বিধাচলতা ভেঙে বারবার কবি বেরিয়ে এসেছেন কবিতার অসীম প্রান্তরে, নির্মাণ করেছেন কাব্যের এক বিশাল ভুবন, যার ফলে বাংলা কবিতা তাঁর হাতে পেয়েছিল নতুন দিক-নির্দেশনা। শিল্পের এই দীর্ঘ পথ তাঁর কাছে ক্রিটের গোলকধাঁধার মতোই আদি-অন্ত অনির্দেশিত, অনতিক্রান্ত—'ভীষণ গোলকধাঁধা মিনোটারী নিশ্বাসে জটিল' ('তুমি বড় অসতর্ক', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)। ক্রিটের গোলকধাঁধা থেকে পালিয়ে মুক্ত আকাশে উড়ে যাওয়া ইকারুস তাই হয়ে ওঠে কবির মানসপ্রতিনিধি। শিল্পের আকাশে অবাধ উড়ালের বাসনা তাঁর প্রিয়তম ইচ্ছের একটি, যে অভিলাষের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে ইকারুস-পুরাণ :

> ক. যদি মোমগন্ধী ইকারুস হয়ে যাই ফুল-চন্দন দেবে সে
> গোধূলিতে। কিন্তু ইকারুস বড় পতনপ্রবণ। আকাশের
> সুনীল বন্ধন তাকে পারে না রাখতে।
>
> ('পার্ক থেকে যাওয়া যায়', *নিজ বাসভূমে*)

খ. আমার সত্তার চেয়ে ঢের বেশি ভারী
একজোড়া ডানা শৈশবের মতো খুব
উড্ডয়নপ্রিয়,
আমার স্বপ্নের ভেতরেও নীলিমাকে স্পর্শ করে,
('তবু হলো না', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)

গ. ঔদাস্য তোমার সঙ্গী, তবু আশৈশব চেয়েছো আকাশ ছুঁতে
এবং চেয়েছো ছুটে যেতে দূরে আরো দূরে আরো,
পর্বত চূড়ায় পা রাখবে বলে উঠেছো উঁচুতে
অনেক, অথচ পিঠে বাঁধোনি জরুরি সরঞ্জাম।
('তুমি বড় অসতর্ক', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)

কবির অনন্ত ইচ্ছের নাম ইকারুস, ইকারুস স্বাধীনতার আকাশ। উড়বার এই বাসনার অপর নাম শিল্পের অন্বেষা, যে অন্বেষাপ্রবণ মন আবার ভীতিগ্রস্ত, এ কারণে 'ইকারুস বড় পতনপ্রবণ' অথবা 'পিঠে বাঁধোনি জরুরী সরঞ্জাম' ধরনের সংশয়বিদ্ধ বাক্যের জন্ম হয়েছে কবিতায়। তিনি শিল্পের জটিল পথে ঢুকে পড়েছেন অন্তর্গত সাধনার শক্তিতে, কিন্তু সেখান থেকে বের হবার মন্ত্র শেখা হয়নি : 'তুমি তো অক্ষত বেরুনোর মন্ত্র এখনো শেখাওনি' ('তুমি বড় অসতর্ক', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)। কবির অবস্থা অভিমন্যুর মতো, যে ভেদ করতে পারে, কিন্তু সংকটকালে বেরিয়ে আসতে পারে না। অবশ্য বেরিয়ে আসা কবির উদ্দেশ্যও নয়, বরং ইকারুসের মতো আত্মোৎসর্গের ভেতরে তিনি দেখতে পান জীবনের সার্থকতা, যদিও তিনি জানেন ইকারুসের আত্মোৎসর্গ মহৎ কিন্তু বস্তুজাগতিক বিচারে মূল্যহীন, সে কেবল 'অভীপ্সার ক্ষণিকের গান'। ইকারুস তাঁর কবিতায় শিল্প ও শিল্পীর সাধনা, মুক্তি ও প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে প্রতীক হয়ে ফিরে এসেছে বারবার :

আর আমি তো চেয়েছি
মোহন মোমের ডানা মেলে নীল, বিশাল আকাশে
গর্বিত পাখির মতো অন্ধ করে দিতে
সূর্যের অনল-চোখ, কিন্তু সেই ডানা
তরল জ্যোৎস্নার মতো গেল শুধু গ'লে
অগ্রজের বিস্মিত দৃষ্টির নিচে শোচনীয় সৌন্দর্যের মতো।
('মর্মর প্রাসাদ শুধু', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

ইকারুস যেমন অগ্রজের অনুশাসন উপেক্ষা করে পেয়েছিল মুক্তির অবাধ আকাশ, সেই আকাশ শামসুর রাহমানেরও আরাধনা, 'ইকারুসরূপী কবি নিজেই উক্তি করেছেন যে, তাঁর স্বভাব ও নিয়তি শিল্পীর নিয়তি, তা তো প্রথাগত পিতৃসংস্কারের ছায়াপাতে বসবাসের জন্য আগ্রহী হতে পারে না' (কামাল, ২০১৪ : ১৪১)। 'পুরাণ' শিরোনামের কবিতায় শামসুর রাহমান অগ্রজদের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন।

ইকারুস বন্দি হয় পিতা ডেডেলাসের সাথে গোলোকধাঁধায়, স্থল এবং জল উভয় পথে মুক্তির পথ রুদ্ধ, কিন্তু তবুও ইকারুসকে নিয়ে ডেডেলাস খুঁজেছিলেন মুক্তির বিকল্প সম্ভাবনাময় পথ। তিনি বলেছিলেন: 'Escape may be checked by water and land, but the air and the sky are free' (Hamilton, 1953 : 139)। মুক্তি যেখানে অসম্ভব সেখানেও মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন ডেডেলাস, বেছে নিয়েছিলেন আকাশ ও বাতাসের সীমানাকে, মানুষের জন্য যে পথ দূরতিক্রম্য; শর্ত ছিল সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। সূর্যের তাপে পাখার মোম গলে যায় সত্যি, কিন্তু সূর্য তো একাধারে তাপ এবং আলোর উৎস, মুক্তিকামী প্রাণ উত্তাপের ভয়ে আলো থেকে দূরে থাকতে পারে না, ইকারুসও তাই করেছে; ডেডেলাসের মতো ছকবাঁধা পথে গন্তব্যে উড়ে গেলে ইকারুস কি পেত 'এই অমরত্বময় শিহরণ?' ('ইকারুসের আকাশ', *ইকারুসের আকাশ*)—এই উচ্চারণের ভেতর দিয়ে 'ইকারুসের আকাশ পৃথিবীর যে কোনো সৃজনশীল মানুষের আকাশ হয়ে যায়। এই আকাশ ব্যক্তিগত বোধ-ঐশ্বর্যে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন। ইকারুসের এই বলিদান সমস্ত শিল্পীর জন্য নিজস্ব আকাশ নির্মাণের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে' (রেজা, ২০১০ : ২৩৯)। এছাড়া আরও কিছু কবিতায় শামসুর রাহমান ইকারুসের প্রতীক দিয়ে বক্তব্য নির্মাণ করেছেন :

ক. তোমার নীরবতার কাছে আমার কবিতা বড়
অসহায়, কী দারুণ পতনপ্রবণ ইকারুস।
('তোমার নীরবতার কাছে', *শূন্যতায় তুমি শোকসভা*)

খ. কেউ কেউ দৌড়ে যায়, উড়ে যায়, যেন ইকারুস নীলিমায়।
('সিঁড়িতে ভীষণ ভিড়', *নায়কের ছায়া*)

গ. সেই মুহূর্তে আমার চোখ
ইকারুসের চোখ, আমার বাহুমূলে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডানা।
('ইকারুসের জন্য', *শিরোনাম মনে পড়ে না*)

## অর্ফিয়ুস

'আজ শিল্পীই হলেন পুরাণের বাহক। কিন্তু তাঁকে এমন শিল্পী হতে হবে যিনি পুরাণ এবং মানবতা বোঝেন এবং যিনি আপনার জন্য একেবারে তৈরি কোন কর্মসূচি নিয়ে হাজির কোন সমাজতাত্ত্বিক নন' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ১৬১)। সমাজের গণ্ডীতে বাস করেও বস্তুজাগতিক লাভ-ক্ষতির পরিবর্তে শিল্পীর আরাধ্য শিল্পের অমরতা, সৃষ্টির মোহন মন্ত্রজালে চৈতন্যকে অভিভূত করার শক্তির ভেতরে শিল্পের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত থাকে। গ্রিক পুরাণে অর্ফিয়ুস বাঁশির ইন্দ্রজাল তৈরি করে ত্রিলোককে বশীভূত করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, শামসুর রাহমানের কাব্যজগতে সিদ্ধিলাভের প্রশ্নে তাই প্রতীক হয়ে ফিরে এসেছে অর্ফিয়ুস :

> ব্যর্থ হোক সব নিন্দুকের বাক্যঝড়
> উপেক্ষায়, প্রশংসায় নির্বিকার আঁকবে সে ছবি,
> অর্ফিয়ুস-এর ছিন্ন মস্তকের গান হবে ভাষা।
>
> ('কবির জীবন', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

অর্ফিয়ুসের সঙ্গে শামসুর রাহমান একাত্ম হতে চেয়েছেন নিবিড় আন্তরিকতায় : 'এ কালের অর্ফিয়ুস হওয়ার/ সাধনা আমার চেতনায় দেদীপ্যমান।' ('অর্ফিয়ুস হওয়ার জন্যে', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*) বাঁশের মৃত্যু থেকে হয় বাঁশি, তাই দিয়ে সুরের সৃষ্টি : 'দায়ের ঘায়ে মুলী বাঁশের কান্না ঝরে/ বাঁশের মৃত্যু না হলে কি বাঁশির সুরে/ পুষ্প জন্মে চরাচরে' ('বাঁশি', *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*)। সৃজনপ্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত এরকম জীবন-মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনাস্নাত : 'জীবন এবং মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই মিথের জন্ম। জন্ম মানে জীবন ও সৃষ্টি, মৃত্যু মানে ধ্বংস। ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা দিনরাত্রির মতো নিয়ত উঠছে নামছে, ঋতুচক্রে ও মানুষের জীবনে এ দুয়ের লীলাই সুস্পষ্ট' (রায়, ১৯৯৪ : ৫৩)। জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকে মৃত্যুর বীজ, বাঁশের মৃত্যুতে বাঁশির জন্ম, যার উদ্দেশ্য সুরের মোহনীয়তা সৃষ্টি। মৃত্যু জাগতিক হতে পারে, হতে পারে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক, মৃত্যু যেমনই হোক—পৌরাণিক চরিত্রের মৃত্যুর ভেতরে শামসুর রাহমান অধিকাংশ সময় অনুসন্ধান করেছেন নতুন করে বেঁচে ওঠার প্রেরণা; যেসব জায়গায় তিনি পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখেছেন পুরাণের সেইসব আখ্যান এবং চরিত্র হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার প্রিয় অনুষঙ্গ। নজরুল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে ধ্বংস-প্রত্যাশী ছিলেন, ধ্বংস ছাড়া নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে তিনি স্তব করেছিলেন ছিন্নমস্তা চণ্ডী ও রুদ্র নটরাজের। অবশ্য নজরুলের মতো প্রতিরোধের শ্লোগান-মুখরিত বক্তব্য নির্মাণের প্রবণতা শামসুর রাহমানের কবিতায় তুলনামূলকভাবে কম। নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় অর্ফিয়ুসের

বাঁশির চকিত উল্লেখ করেছিলেন, অন্যদিকে শামসুর রাহমানের কবিতায় অর্ফিয়ুস ও তার বাঁশির নানামাত্রিক ব্যবহার দেখা যায়। অর্ফিয়ুস ও তার বাঁশির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন কালের সংকট মোচনে, ব্যক্তিসত্তার উদ্বোধনে।

গ্রিক পুরাণের উল্লেখযোগ্য চরিত্র অর্ফিয়ুস, তার বাঁশিতে বহুবার বেজে উঠেছে মানবকল্যাণী সুর, যে সুরের আধিপত্যে স্বর্ণলোমসন্ধানী গ্রিকেরা বেঁচে গিয়েছিল সাইরেনদের ফাঁদ থেকে, তার বাঁশি ক্লান্ত নাবিকদের উদ্দীপিত করেছে নতুন কর্মশক্তিতে। অর্ফিয়ুসের নিষ্করুণ মৃত্যু এবং নাইটিঙ্গেল পাখির ভেতরে তার সুরের অস্তিত্বের পুনঃসৃষ্টি ধ্বংস-প্রতিরোধী শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে রাহমানের কবিতায় :

> সুকুমার বৃত্তি সমুদয় তার নখরের ঘায়ে
> ভীষণ জখম হয় সময়ের প্রতি পর্বে, তবু তাণ্ডবেও
> জন্ম নেয় অর্ফিয়ুস যুগে যুগে, বংশীধ্বনি জাগে।
>
> ('তবু তাণ্ডবে', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

যুগসংকট কাটাতে শুধু নয়, কবির ব্যক্তিচৈতন্যেকে দুঃসময়ের চক্র থেকে, সত্তার বৈকল্য থেকে মুক্ত করে এই বাঁশিই : 'অর্ফিয়ুসী বংশী শুনি,/ আমার সিক্ত ক্ষতগুলো হয় মোহিনী ফুলের কুঁড়ি' ('মেটামরফসিস', *হৃৎপদ্মে জ্যোস্না দোলে*)।

শামসুর রাহমান প্রথম অর্ফিয়ুস নামটি ব্যবহার করেন *এক ধরনের অহংকার* কাব্যে, কবিতার শিরোনাম ছিল 'যেন অর্ফিয়ুস'। মৃত্যুর ভেতর থেকে জন্ম নেয়া জীবনসন্ধানী কবিসত্তা বিশ্ব ও বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক সময়ের তলে বাস করেও দেখেন নতুন জীবনের স্বপ্ন। কারণ, ধ্বংস শেষ কথা নয়, ধ্বংসের ভেতরে নতুন সৃষ্টির বার্তা আছে বলেই যে মাটিতে মিশেছিল অর্ফিয়ুসের দেহাবশেষ সেই মাটির উর্বরতা থেকে সৃষ্ট অরণ্যে বাসরত নাইটিঙ্গেল পাখির গলাতে সৃষ্টি হয়েছিল অমর্ত্য সুর। নেতিবাচক সময়ের গর্ভে ইতিবাচকতা ও জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারে কবি বেছে নেন অর্ফিয়ুস প্রতীক, গেয়ে ওঠেন জীবনের গান : 'এবং নতুন জীবন ওঠে নেচে বাঁশি হাতে ভস্মের আড়াল থেকে/ নতুন গোলাপ নিয়ে যেন অর্ফিয়ুস' ('যেন অর্ফিয়ুস', *এক ধরনের অহংকার*)।

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কবিতায় নগর পুলিশ ও অর্ফিয়ুসকে একই আবর্তে রাখেন শামসুর রাহমান। অর্ফিয়ুসের বাঁশির সুরে জড় এবং জীব উভয়েই প্রভাবিত হত, নগরের পুলিশের বাঁশি, যে বাঁশির

শব্দের নির্দেশনায় নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষ ও যন্ত্রের গতি—আধুনিক সভ্যতার পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ট্রাফিক কন্ট্রোল', সেই বাঁশিময় 'কন্ট্রোল' আর অর্ফিয়ুসের মোহন বাঁশির নিয়ন্ত্রণ চকিত কটাক্ষে একই রকম বলে প্রতীয়মান হয় বটে, তবে নগর-পুলিশের বাঁশির বস্তুজাগতিক প্রয়োজনীয়তা আর অর্ফির বাঁশির অতিলৌকিক প্রভাবের সাদৃশ্যচিন্তা কতটা যৌক্তিক সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই কবি কৌশলে 'নাকি' শব্দের দ্বিধা জুড়ে দেন বক্তব্যের শরীরে : 'নগর পুলিশ অর্ফিয়ুস নাকি বলে কেউ কেউ/ করোটিতে তবলা বাজায়'('বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*)।[২৯] 'অর্ফিয়ুস, ১৯৭৮' কবিতায় অর্ফিয়ুসের অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের উন্মোচন ঘটেছে : 'ইউরিদিকের চেয়ে বেশি ভালোবেসে/ মৃত্যুরই গেয়েছি গান। নইলে কেন তাকালাম ফিরে?' ('অর্ফিয়ুস, ১৯৭৮', *মাতাল ঋত্বিক*) ইউরিদিকে না পাওয়ার ব্যর্থতাই ছিল অর্ফিয়ুসের মৃত্যুর নেপথ্য কারণ। ইউরিদিকে হারিয়ে অতৃপ্ত প্রেমের বেদনায় গহীন অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো অর্ফিয়ুসকে নৃশংসভাবে হত্যা করে দেবতা দিউনিসাসের অর্ধোন্মত্ত অনুগামীরা। পাখির কণ্ঠের অমৃত-সুর অর্ফিয়ুসের স্মৃতিকে জাগ্রত করে তোলে, তাই পাখি প্রসঙ্গে কবির মনে পড়ে যায় বাঁশির কথা :

> তবু মাঝে মাঝে
> একটি কি দু'টি পাখি রেলিঙে নিশ্চিন্ত বসে দোল
> খেতে-খেতে আমাকে শুনিয়ে যায় গান। কী আশ্চর্য,
> জানি না কোত্থেকে ভেসে আসে বাঁশির অমর্ত্য সুর
> অন্তর্লোকে।
>
> ('বিপন্ন বিশ্বে নতুন সভ্যতার জন্যে', *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*)

মৃত্যুর পর অর্ফিয়ুসের দেহাবশেষ থেকে যে অরণ্য পেয়েছিল পুষ্টি, সেই অরণ্যের পাখির গানও পৃথিবীশ্রেষ্ঠ। পাখির 'গান' এবং 'বাঁশির অমর্ত্য' সুরের দ্যোতনায় নাইটিঙ্গেল পাখি ও অর্ফিয়ুসের বাঁশির পৌরাণিক যৌগপত্য তৈরি হয়। বিপন্ন বিশ্ব থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশা ঘনিয়ে ওঠে পাখির গান ও বাঁশির সুরকে কেন্দ্র করে। বাঁশির সুরের দোলাতে 'নতুন জীবন নেচে ওঠে', ফলে দৃশ্যগোচর হয় ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি।[৩০] অর্ফিয়ুস প্রসঙ্গ ব্যবহার করে তিনি *এক ধরনের অহংকার* কাব্যের 'যেন অর্ফিয়ুস' কবিতায় নতুন জীবনের যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'বিপন্ন বিশ্বে নতুন সভ্যতার জন্যে' কবিতায় সেই পুরনো পুরাণরসের জারক দিয়ে আবার নির্মাণ করলেন বক্তব্য। অর্ফিয়ুস-পুরাণ নিয়ে কবি যেখান থেকে শুরু করেছিলেন চক্রাকারে সেখানেই এসে থামেন, বহু বছরের কাব্যসাধনায় তাঁর অন্তর্লোকের শুভচেতনা, শিল্পশুদ্ধতার প্রতীকরূপে অর্ফিয়ুসকে গ্রহণ করেছিলেন, শুরু এবং শেষ

বৃত্তাকারে এসে একই বিন্দুতে মিলেছে—যেখানে অটুট রয়েছে ধ্বংসের ভেতরে থেকে জীবনবাদী চেতনায় উজ্জীবনের আস্থা।

আরও অনেক কবিতায় চকিতে এসেছে অর্ফিয়ুস প্রসঙ্গ, যেমন : 'তোমার জন্মদিনের তীরে' ও 'কবির কুকুর' কবিতায় (*মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*)। 'কবির কুকুর' কবিতায় অর্ফিয়ুস কবির কুকুরের নাম। 'অযৌক্তিক' ও 'তোরঙ্গ' (*রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*) কবিতায় অর্ফিয়ুস ও তাঁর বাঁশির প্রসঙ্গ এসেছে, 'তোরঙ্গ' কবিতায় নামটি ব্যবহৃত হয়েছে অলঙ্কার হিসেবে। ভাষা আন্দোলন সচেতন বাঙালির চেতনায় প্রতিনিয়ত তরঙ্গিত হয়, মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ অর্ফিয়ুসের বাঁশির সুরের মতো মিশে থাকে, অনুরণন তোলে কবিসত্তায়। এ আন্দোলন অতিক্রান্ত হবার বহু বছর পরেও অর্ফিয়ুসের বাঁশির সঙ্গে মাতৃভাষা ও বর্ণমালার সাদৃশ্য খুঁজে পান কবি, বর্ণ কেবল ভাবই প্রকাশ করে না, তার রয়েছে ছান্দসিক অস্তিত্ব, সেই সুরের সঙ্গে কবির চেতনাগত চিরায়ত বন্ধন :

> শুধু তুমি হে আমার বর্ণবোধ,
> মাতৃভাষা ক্রমশ আমার আরো কাছে এসে যাও,
> অস্তিত্বের গ্রন্থিমূলে অর্ফির বাঁশির মতো বাজো।
>
> ('অর্ফির বাঁশির মতো', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

শামসুর রাহমানের কবিতায় অর্ফিয়ুসের বাঁশির পাশাপাশি বীণাপাণির বীণা, অ্যাপোলোর বীণা, কৃষ্ণের বাঁশি, ইস্রাফিলের বাঁশির[৩১] রূপকল্প নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে অর্ফিয়ুস ও তাঁর বাঁশি শামসুর রাহমানের কবিতায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

**যিশু**

অন্তর্জাগতিক অনুভূতিকে বহির্জগতের কোলাহলে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনে কবি ত্রিকাল-অনুসন্ধানী হয়ে ওঠেন, বর্তমান কালের অনুভূতিকে সুস্পষ্টকরণে ব্যবহার করেন অতীতের অভিজ্ঞতা, অন্তরের নির্জনতম উপলব্ধিকে বাইরে প্রকাশের প্রয়োজন প্রতীক-সন্ধানী কবিকে বহির্জগত-বিহারী করে তোলে, মূলত ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে অন্যের চেতনায় সঞ্চারিত করার প্রয়োজনে কবিকে অনিবার্যভাবে হতে হয় প্রতীকাশ্রয়ী। যেসব উপাদান-উপকরণের ভিত্তিতে কবি তাঁর প্রতীকী-বীক্ষণ গড়ে তোলেন সেখানে পুরাণ এক সর্বজনীন প্রতীক-উৎস হিসেবে চিহ্নিত। শিকড়-সন্ধানী, ঐতিহ্যমুখী কবির কবিতায় পুরাণ প্রতীকাকারে পুনরায় নির্মিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে বলেই পুরাণ তার আভিধানিক

অর্থকে পেছনে ফেলে সজীব রূপ নিয়ে কালের করতলে স্থান করে নেয়। কবি এক আত্মপীড়িত সত্তা, কবিসত্তা সময়-সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বন্দ্ব-জটিলতায় বিদ্ধ, সেই ক্ষত-বিক্ষত-রক্তাক্ত কবিচিত্তকে উন্মোচনের জন্য প্রতীক হিসেবে শামসুর রাহমান *বাইবেল* থেকে বেছে নিয়েছিলেন 'যিশু' চরিত্রটিকে। পুনঃসৃষ্টি বা পুনরুজ্জীবনের প্রতি শামসুর রাহমানের বিশেষ দৌর্বল্য কাব্যচর্চার শুরু থেকেই গোচরে আসে, তাঁর নিজের সৃজনশীল সত্তাও পুনর্জাগরিত এক সত্তা বলে তিনি বিশ্বাস করেন—সেই প্রণোদনা থেকে তিনি যিশুর প্রসঙ্গ টেনে আনেন প্রায় প্রতিটি কাব্যে, যে যিশু নিজে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং ল্যাজারাসকে পুনর্জীবিত করেছেন। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে তিনি 'সত্তাসূর্যে' যেসাসের মানবীয় ক্ষমাকে ধারণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেন যিশুর রূপকল্পের সঙ্গে একীভূত করে : 'আমি বিশ শতকের যিশু' ('স্বগত ভাষণ')। ফলে যিশু হয়ে উঠল যন্ত্রণাকাতর শিল্পচৈতন্যের প্রতীক, 'ক্রুশবিদ্ধ চেতনায় নিজেকে মেলাতে চাই' ('মর্মর প্রাসাদ শুধু', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*) উচ্চারণে কবি হতে চাইলেন যিশুর সঙ্গে একাত্ম।

শামসুর রাহমানের কবিচৈতন্য ল্যাজারসের মতো পুনরুত্থিত হয়েছে নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনায়, কিন্তু সেই চৈতন্য যিশুর মতো ক্রুশবিদ্ধ, যন্ত্রণাকাতর। যন্ত্রণার সাথে সৃজনশীলতার সম্পর্ক নিবিড়, আদি কবিতার জন্ম বেদনা থেকে, এজন্য শামসুর রাহমান কবিতায় বাল্মিকীর যে প্রতিকৃতি তৈরি করেন তার চোখ বেদনাকাতর।[৩২] যারা আলোকিত পথের সন্ধানে মানবসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের সেই স্পর্ধাকে অনেক সময় দণ্ডিত করে সমাজ ও সময়, তারপরও 'স্পর্ধিত, দণ্ডিতরাই মানবীয় সত্তার হাজার বছরের পথ হাঁটাকে স্থানান্তরে-কালান্তরে নিয়ে যায়' (কামাল, ২০১৪ : ১৪২)। কবিতার জন্য পুরাণের নানা উৎসের দ্বারস্থ হয়েছেন শামসুর রাহমান; সঙ্গীত, প্রজ্ঞা ও আলোর উৎস হিসেবে অ্যাপোলোকে বেছে নিয়েছিলেন 'অ্যাপোলোর জন্যে' (*প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*) কবিতায়। পরবর্তীকালে কবির যন্ত্রণাকাতর মনের প্রতীক হয়ে ওঠে যিশু—নূহের সঙ্গে যেমন পায়রার প্রসঙ্গ, তেমনি যিশুর পুরাণের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ক্রুশ প্রসঙ্গ। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ অসহায় ঝুলে থাকার চিত্র মানবহৃদয়ে সহমর্মিতার জন্ম দেয়, মানবতাবাদী মন একাত্ম হয়ে মিশে যেতে চায় যিশুর বেদনার সঙ্গে। যিশুর রূপকল্পের সঙ্গে ক্রুশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, ফলে যিশু এবং ক্রুশ প্রসঙ্গ শামসুর রাহমানের কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে বারবার :

> একটি আলোকিত দেহকে বিনাশ করবে বলে যারা
> ক্রুশকাঠে পেরেক ঠুকেছিল, তাদের

উৎসব, ব্যভিচার কিংবা যারা বালিতে, অন্ধকার
গুহার দেয়ালে মাছের চিত্র এঁকে
ক্রুশবিদ্ধ অস্তিত্বের মহাপ্রয়াণে চোখ মুছেছিল,
তাদের ঘরকন্না, প্রেমের ব্যাপ্ত বলয়, তা-ও কি
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় প্রতারক ইতিহাসের?
('ইতিহাস, তোমাকে', *রৌদ্র করোটিতে*)

*অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই* কাব্যগ্রন্থে আরও একবার নিজেকে যিশুর রূপকল্পে প্রতিষ্ঠা করেন শামসুর রাহমান। এ কাব্যের 'মা তার ছেলের প্রতি' কবিতাটি আত্মজৈবনিক, শহীদ কাদরীর 'অগ্রজের উত্তর' (*উত্তরাধিকার*) কবিতার নির্মাণপদ্ধতি একইরকম, অগ্রজ শাহেদ কাদরীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে আত্মসমীক্ষাপ্রবণ হয়ে ওঠেন কাদরী। শামসুর রাহমানের কবিতায় তাঁর ডাকনাম 'বাচ্চু' ব্যবহার করে মা তাকে সম্বোধন করেছেন, কবিতাটি নির্মিত হয়েছে মায়ের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে। কবি-সন্তানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মা বলেছেন :

তোর এখনকার কথা ভাবলে
হজরত ঈসা আর বিবি মরিয়মের কথা মনে পড়ে যায়।
যখন ওরা তাঁকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে
কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল ক্রুশকাঠ,
কালো পেরেকে বিদ্ধ করেছিল সারা শরীর
তখন তাঁর কাছে ছিলেন না মাতা মরিয়ম।

*বাইবেলের* 'মা মেরি' পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যে বিবি মরিয়ম, যিশু এবং ঈসা অভিন্ন, 'মা তার ছেলের প্রতি' কবিতায় শামসুর রাহমান *বাইবেল* ও পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের প্রয়োগ-সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শামসুর রাহমানের জগৎ ছিল অক্ষরের বলয়ঘেরা, তাঁর সাধনা শব্দের সাধনা, সাধনার কঠিন পথ উত্তরণের ক্ষেত্রে কবিসত্তা ক্ষত-বিক্ষত যেসাসের মতোই। বাস্তবতার কর্দম, দেশ ও বিশ্বরাজনীতির কূটচাল, বন্দি মানবতা—সব মিলিয়ে এক অন্ধকার কালের হাহাকার কবিকে বিদ্ধ করে যেন ক্রুশ, সুতরাং কাল অতিক্রমণের বাস্তবতায় কবি এবং যিশু দুজনের পথ অভিন্ন :

যে যাই বলুক আজ
এমন কণ্টকময় পথে সোজা শিরদাঁড়া আর
যিশুর চোখের মতো গৌরবের আভাই সম্বল
আমার এবং দ্রুত শ্মশানের আগুন নেভাই।
('অত্যন্ত স্পষ্ট থেকে যায়', *ইকারুসের আকাশ*)

'খ্রিস্টান ঐতিহ্যে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর অর্থ যিশু অমর জীবনের বৃক্ষে ঝুলে আছেন। এবং তিনি সেই গাছের ফলও বটেন' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ১৬৩)। একইভাবে শামসুর রাহমানের বেদনা-বাহিত বিক্ষত চৈতন্যের ভেতরে জন্ম নেয় কবিতার পঙক্তি : 'আমিও ফিরিনি শূন্য হাতে, আমার হৃদয়ে দ্যাখো/ ক্ষতের গোলাপ ফোটে, যন্ত্রণাই আমার ফসল' ('আমার ফসল', *আমার ক'জন সঙ্গী*)। দেশ-কাল-মানবতার বিপন্ন রূপ যে কবির অন্তর্গত সত্তাকে করেছে রক্তাক্ত, চৈতন্যকে করেছে উর্ণনাভের চক্রজালে বন্দি, সেই আহত কবি-সত্তার জন্য বাইরের আঘাত অথবা আঘাতের স্মারক নিষ্প্রয়োজন, প্রস্থানের প্রশ্নে কবি নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন :

> আমাকে যেতে হবে যদি, তবে আমি
> যিশুর মতন নগ্ন পদে চলে যেতে চাই। কাঁধে
> ক্রুশকাঠ থাকতেই হবে কিংবা কাঁটার মুকুট
> মাথায় পরতে হবে, এটা কোন কাজের কথা না।
> এসব মহান
> অলংকার আমার দরকার নেই।
>
> ('নো এক্সিট', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

যদিও শামসুর রাহমান ভেতরের সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বাইরের আড়ম্বর পরিহার করতে চান, কিন্তু তাঁর কবিতা জৈবসত্তার রূপ ধরে মূর্ত হয় দুই বিপরীত অবস্থানে—একদিকে কল্পনার সুদূর প্রান্তরাভিলাষী রোমান্টিক কবিতার নির্দ্বান্দ্বিক কোমল-স্বভাব, অনুযোগহীনতা, অন্যদিকে বস্তুবিশ্বের আঘাতে বিদ্ধ সংহারী কবিতার বিক্ষোভ : 'তুমিও আপনার শরীরে পেরেক ঠুকে দ্যাখো/ যিশুর যন্ত্রণা/ সইতে পারো কি না' ('কবিতা দ্বিরূপিণী', *আমি অনাহারী*)। কালের প্রেক্ষাপটে নির্দ্বান্দ্বিক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সাংঘর্ষিক সময়ের নিষ্পেষণে যন্ত্রণাবিদ্ধ কবিতা চায় ভেতরের ক্ষতের বাহ্যিক প্রতিফলন।

শামসুর রাহমান তাঁর জীবদ্দশায় মানবতার কঠিনতম বিপর্যয় দেখেছিলেন একাত্তরে, ক্রূর সময় ক্রুশের মতো বিদ্ধ করেছে মানবতাকে : 'এ ব্যাপক কাঁটাতারে/ জীবন ঝুলছে যেন ক্রুশকাঠ।' ('কাঁটাতার', *বন্দি শিবির থেকে*) সেই দুঃসময়ের গর্ভে সমষ্টির রক্তঝরা-কালের সাক্ষী তিনি, সাক্ষ্য তাঁর কবিতাবলি, যারা মানুষের মৃত্যু দেখেছিল—মৃত্যু এত সহজ ছিল যেন 'ঝরছে পঁচা ফল।' এছাড়া শামসুর রাহমান 'ভ্রমণে আমরা' (*ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*), 'কে তোমরা' (*আমি অনাহারী*),

'অপচয়ের স্মৃতি' (*বিধ্বস্ত নীলিমা*), 'শয্যায়' (*দুঃসময়ে মুখোমুখি*) কবিতাসমূহে যিশু এবং ক্রুশ-সংক্রান্ত পুরাণ অবলম্বণে বক্তব্য নির্মাণ করেছেন। ক্রুসেডের চূড়ান্ত বলি, ক্রুশকাঠে শরীর ঠুকে দেয়া যিশুর প্রতীকে উঠে আসে কবির রক্তাক্ত মনোভূমি। কবিরা ক্রুশবিদ্ধ সত্তা, কবিকে প্রতিনিয়ত ক্রুশবিদ্ধ করে সময়, সমাজ, রাষ্ট্র। চেতনার আলোড়নকে মূর্ত করার অভিপ্রায়ে শামসুর রাহমান হয়ে ওঠেন প্রতীকাশ্রয়ী কবি, তাঁর বিক্ষুব্ধ মনোভূমির বিপন্ন অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছে যিশুর পুরাণ। যিশু তাঁর কবিতায় এক রূপান্তরিত পৌরাণিক চরিত্র, মাইকেল যেমন রাবণকে রূপান্তরিত করেছিলেন মানবিক সত্তায়, তেমনি পুরাণের খোলস ভেঙ্গে শামসুর রাহমানের কলমে যিশু ঈশ্বর থেকে হয়ে ওঠেন যন্ত্রণাবিদ্ধ শিল্পিসত্তার প্রতীক : 'প্রতীকমাত্রেই খুব সম্ভব সার্বজনীন বলে, মনোবিনিময় কবির সাধ্যে না-কুলাক, তার বেদনা পাঠকের গোচরে আসে।' (দত্ত, ২০০২ : ৯২) শিল্পীর বেদনা-বিক্ষত চৈতন্যকে যিশুর প্রতীকে পাঠকের গোচরে এনেছেন শামসুর রাহমান।

**চাঁদ সদাগর**

'চাঁদ সদাগর' (*উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*) কবিতাটি ভারতীয় পুরাণ অবলম্বনে রচিত দীর্ঘ কবিতা, এ কবিতাতে চাঁদ সদাগর পিতৃ-প্রতিমা, মনসার কূটচালে সন্তান-হারা পিতৃ-হৃদয়; তবে শামসুর রাহমান চাঁদের পিতৃহৃদয়ের বেদনাঘনতার পরিবর্তে মনসার নিষ্করুণ ছোবলে অসহায় অথচ দ্রোহে প্রোজ্জ্বল চাঁদকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আলো ফেলেছেন তার ব্যক্তিগত বিপর্যয় এবং প্রবল প্রতিকূলতায় টিকে থাকার শক্তিমত্তার ওপরে। বিষয় এককেন্দ্রিক, ব্যক্তিক অনুভূতি-আশ্রিত, তবে কবিতার বহিরাবরণের আড়ালে অন্তর্কথনে শামসুর রাহমান চাঁদ সদাগর ও চম্পক নগরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা ও অবস্থান এবং সমকালীন স্বদেশকে—'শামসুর রাহমানের মূল্যবোধ প্রধানত শিল্প ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু এর সঙ্গে অন্তরঙ্গসূত্রে জড়িত হয়েছে পরিপার্শ্ব, সমাজ ও সময়সজ্ঞানতা' (রহমান, ২০০০ : ১৮৩)।

পুরাণ অনুযায়ী চাঁদ সদাগর একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অনমনীয় ছিল, মনসার পুনঃপুনঃ আঘাতে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, প্রিয় সন্তানদের হারিয়ে হয়েছিল নিঃস্ব। রিক্ত চাঁদ সনকার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে মনসাকে পূজা অর্পণ করে, কিন্তু বাম হাতে বেলপাতা প্রদানের ঘটনা প্রমাণ করে যে চাঁদ সদাগর পুরোপুরি সমর্পিত ছিল না, তার জেদী মনোবল ছিল অক্ষুণ্ন। শামসুর রাহমান অবশ্য তাঁর কবিতায় চাঁদকে এতটুকু নমনীয় করেও দেখতে চান না, কারণ চাঁদ এ কবিতায় তাঁর প্রতিবাদী শিল্পিসত্তার প্রতীক, বিরুদ্ধস্রোতে দাঁড়ানোর প্রতিরোধশক্তি, অন্যদিকে মনসা স্বৈরাচারের প্রতীক। এখানে তিনি

চাঁদ ও মনসার প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানকে গ্রহণ করেছেন, প্রথা ভেঙ্গে নতুন চেতন-প্রতীকে মনসা বা চাঁদ চরিত্র অঙ্কনে অগ্রসর হননি : 'ব্যতিক্রমী নয়, প্রথাসম্মত রাস্তাই শামসুর রাহমানের রাস্তা, ...তাঁর সাফল্য প্রথা-উত্তরণে' (আজাদ, ১৯৮৩ : ১২৮)। সেই প্রথা-উত্তরণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটি। শামসুর রাহমান কবিতার বক্তব্যে প্রথাগত পুরাণের অনুসারী হলেও কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে তিনি রেখেছেন ভিন্ন সমাচার, ধারণ করেছেন নতুন প্রতীকী তাৎপর্য। তিনি মধ্যযুগের সামন্তশাসনের সঙ্গে আশির দশকের স্বৈরাচারী শাসনকে একই সুতোয় বেঁধেছেন পৌরাণিক আড়াল ব্যবহার করে। আশির দশকের স্বৈরাচার-কবলিত কালের প্রেক্ষাপটে চাঁদ ও মনসা যথার্থ প্রতীক, যখন কবি দেখেছেন 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে দেশ তার নির্ধারিত গন্তব্য থেকে বিপরীত আদর্শ ও নীতির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং চাঁদ-কাহিনিতে অলক্ষ্যে মিশে যায় সমকাল, গভীর অভিনিবেশে তা উপলব্ধি করা যায় :

> নগ্ন ক্ষমতার লড়াই চৌদিকে
> উন্মুখের ভয়ংকর উৎসবের মতো আর দ্বৈত
> শাসনের খাড়া ঝোলে দিনরাত মাথার ওপরে।

অথবা যখন বলেন, 'বিদ্বানেরা ক্লিন্ন ভিক্ষাজীবী,/ অতিশয় কৃপালোভী প্রতাপশালীর' ইত্যাকার বক্তব্য কেবল মধ্যযুগ এবং মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, চৈতন্যকে উৎসুক করে তোলে আরও কোন গুঢ় তাৎপর্যের রস-সন্ধানে। স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তির ব্রত ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মৌল উদ্দেশ্য, সে লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল চারটি সুচিন্তিত মূলনীতির ওপরে। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই গণতন্ত্রের পতন, স্বৈরতন্ত্রের পুনরাবর্তন এবং ধর্মান্ধতার অন্ধকার নেমে আসে বাংলাদেশ নামক স্বপ্নের রাষ্ট্রের ওপরে। সে সময় স্তাবকেরা পেয়েছে প্রসিদ্ধি, প্রতিবাদীরা হয়েছে অবদমিত, কণ্ঠ খুলে সত্য বলার মতো পরিস্থিতি ছিল না বলেই শামসুর রাহমান বেছে নিয়েছিলেন মধ্যযুগের সবচেয়ে কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র চাঁদ সদাগরকে, আর চম্পক নগরের অন্তরালে রেখেছিলেন প্রিয় ভূমি বাংলাদেশকে। শামসুর রাহমান নিজে স্বৈরাচারী অবদমনের প্রত্যক্ষ শিকার ছিলেন, 'আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জেনারেল এরশাদের রোষানলে পড়ে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত হয়ে ক্ষমতাহীন প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পান' (শাহরিয়ার, ২০০১ : ৪৪)। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শামসুর রাহমান স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন, 'সামরিকজান্তার প্রশাসনযন্ত্রে তখন নীতির বালাই ছিল না, উদারতা কিংবা মহত্ত্বের মতো মানবিক মূল্যবোধ ছিল অদৃশ্য-অর্থহীন-অকার্যকর' (রেজা, ২০১০ : ২৪৩)। এজন্যই শামসুর

রাহমান চাঁদ সদাগরের মুখে তুলে দেন কালের সত্য উন্মোচনের দায় : 'নীতির বালাই নেই, ঔদার্য, মহত্ত্ব ইত্যাদির/ কানাকড়ি মূল্য নেই আর। আদর্শ বিনষ্ট ফল/ যেন, নর্দমায় যাচ্ছে ভেসে।' এ সময়ে তিনি দেখেছিলেন ধর্মান্ধতার চূড়ান্ত রূপ,[৩৩] মনসার স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড ও স্বেচ্ছাচারে কালীদহে ডুবেছে চাঁদের একাধিক বাণিজ্যবহর, সেইসঙ্গে ছয়পুত্র, লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর বাঁচেনি মনসার ছোবল থেকে। শুধু তাই নয়, এমনকি চাঁদের 'দিনান্তের কষ্টার্জিত অন্ন'[৩৪] পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে মনসা, এমন সর্বগ্রাসী অনাচারের মুখে অটল দাঁড়িয়ে থাকা চাঁদ সদাগরে শামসুর রাহমান খুঁজে পেয়েছিলেন আপন ব্যক্তিসত্তার প্রচ্ছায়া। তাই সব সংকটকে তুচ্ছ করে চাঁদের কণ্ঠে পরিয়েছেন বিজয়মাল্য, কণ্ঠ মিলিয়েছেন রুদ্র-কঠোর উচ্চারণে, দেখিয়েছেন ক্ষমতাশালীর বশ্যতা অস্বীকারের স্পর্ধা :

> যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ,
> ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায়
> ডিঙার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার,
> গাঙ্গুরের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।

'চাঁদ সদাগর' চরিত্রটিকে আরেকবার শামসুর রাহমান ব্যবহার করেছেন তাঁর 'এক মহিলার ভাবনা' (*দুঃসময়ে মুখোমুখি*) শিরোনামের কবিতায়।

শামসুর রাহমান তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* এসে বলেছিলেন : 'পিতৃপুরুষেরা/ ধারণার যে ক'বিঘে জমিতে লাঙল চষে কিছু/ শাক-সবজি, সাধের আনাজ/ তুলেছেন ঘরে, সেগুলো রোচেনি মুখে' ('বামনের দেশে')। ফলে পূর্বজদের ছায়া থেকে, সীমারেখা থেকে বেরিয়ে নিজের জন্য নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল স্বাধীন আকাশ, অর্ফিয়ুসের বাঁশির মোহনীয় শিল্পকৌশল আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল অগ্রজের আগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্তি, কিন্তু মুক্তির পথ ছিল ইকারুসের আকাশযাত্রার মতোই অনিকেত। শিল্পের অমরাবতী-সন্ধানী কবি বস্তুজগতের নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে রক্তাক্ত হন যিশুর মতো, যন্ত্রণায় দগ্ধ কবির সত্তা তবু 'চিরউন্নত শির', হয়ে ওঠে, প্রতিকূল প্রতিবেশে চৈতন্যের দৃঢ়তায় হয়ে ওঠে চাঁদ সদাগরের সমতুল্য। একজন কবি ক্রমাগত উত্থান-পতন, যন্ত্রণা-সংক্ষুব্ধতার যে পথ অতিক্রম করেন সেই পথের মানচিত্র শামসুর রাহমান তৈরি করেছেন ইকারুস, অর্ফিয়ুস, যিশু এবং চাঁদ সদাগর চরিত্রকে কেন্দ্র করে। পুরাণ ব্যবহারে তিনি অবাধ এবং উদার, প্রতীকী এ চরিত্রগুলো সংগৃহীত হয়েছে পুরাণের নানা উৎস থেকে।

খ. পিতৃ-প্রতিমা

**ডেডেলাস ও রুস্তম**

শামসুর রাহমানের কবিতায় ডেডেলাস ও রুস্তম পিতৃ-প্রতিমা, দুজনেই ট্র্যাজিক পিতা, সন্তান হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। পারস্য অর্থাৎ ইরানের কবি ফেরদৌসি *শাহনামা বা রাজাদের মহাকাব্য* লিখেছিলেন পারস্য-পুরাণ ও ইতিহাসকে উপজীব্য করে, এ গ্রন্থে পুত্রহারা রুস্তমের চরিত্রকে তিনি চিত্রিত করেন। ফেরদৌসির জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র মৃত্যুবরণ করে, ফলে রুস্তমের পুত্রবিয়োগ-বেদনা মূলত তাঁর নিজের বেদনাকাতর পিতৃহৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। শামসুর রাহমানের 'রুস্তমের স্বগতোক্তি' কবিতা কিংবদন্তি রুস্তমের আর্ত ভাষ্য, যে পিতা পুত্রের হন্তারক, তারই আক্ষেপ ফুটে উঠেছে ছত্রে ছত্রে :

> হায়,
> যে অন্ধ কৃষক তীক্ষ্ণ কাস্তের আঘাতে স্বপ্নময়,
> সাধের ফসল তার কেটে ফেলে অকালে, আমিও
> তারই মতো বিভ্রমের মনহুশ উর্ণাজালে বন্দি
> হয়ে নিজ হাতে ক্ষিপ্র করেছি বিরানা এই বুক,
> আমার বয়েসী বুক।
>
> ('রুস্তমের স্বগতোক্তি', *ইকারুসের আকাশ*)

তিনি নিজেও কী নিভৃতে লালন করেননি রক্তাক্ত এক পিতৃসত্তাকে? মতিনের মৃত্যু তাঁকেও করেছিল শোকাহত পিতা ডেডেলাস অথবা রুস্তম। ডেডেলাস এবং রুস্তম চরিত্রটিকে পিতৃ-প্রতিমা হিসেবে অঙ্কনের ক্ষেত্রে ফেরদৌসির মতো শামসুর রাহমানও ব্যক্তিগত দহন-তাড়িত হয়েছিলেন, মতিনকে নিয়ে পিতৃহৃদয়ের শোক :

> যখন এখানে ছিলি, ছিল এক ঝাঁক চিলের ক্রন্দন ঘরে,
> ছিল তীক্ষ্ণ কলরব সকল সময়, মনে পড়ে।
> এখন আমার ঘর অত্যন্ত নীরব, যেন শ্লেট, মূক, ভারী।
> কখনো চাইনি আমি এমন নিশ্চুপ ঘরবাড়ি।
>
> ('তোর কাছ থেকে দূরে', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*)

মানসিক ভারসাম্যহীন মতিনকে ঢাকা থেকে গ্রামে পাঠিয়ে দেন কবি আরোগ্যের প্রত্যাশায়, পরবর্তীকালে পুকুরে ডুবে মতিনের মৃত্যুর পর কবি অনুতাপদগ্ধ হয়েছেন, যার ফলে জন্ম নিয়েছে

পিতৃসত্তার হাহাকার ঘেরা কবিতা 'তোর কাছ থেকে দূরে'। অন্যদিকে ডেডেলাস পুরাণের ভাষ্যে ধীমান কারিগর, শামসুর রাহমানের চোখে বিক্ষত পিতৃহৃদয়, তাঁর চোখে শামসুর রাহমান দেখেছিলেন পুত্র-হারানোর শোক। অবশ্য ডেডেলাস নিজে শিল্পী ছিলেন বলে শিল্পসত্তার শাশ্বত প্রতীক ইকারুসের স্বাধীন উড়াল এবং মৃত্যুকে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ওঠার পাথেয় হিসেবে দেখেছেন : 'শিল্পী আমি, তাই তরুণের সাহসের ভস্ম আজ/মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয় আমার' ('ডেডেলাস', *ইকারুসের আকাশ*)।

**অডিসিয়ুস ও আগামেমনন**

টেলেমেকাস গ্রিক পুরাণের চরিত্র, বীর অডিসিয়ুসের পুত্র , ট্রয় যুদ্ধ শেষ করে ফেরার পথে নিরুদ্দেশ পিতার জন্য অপেক্ষমাণ। মা পেনিলোপির দুর্দশা, মুক্তিদাতারূপে অডিসিয়ুসের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশার ভেতর দিয়ে শামসুর রাহমান স্বদেশ ও সমকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন। শামসুর রাহমান ব্যক্তিগত পুরাণ বেশি ব্যবহার করেছেন কবিতায়, তবে সেই ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধিকে কেন্দ্রে রেখে অনেক সময় স্পর্শ করেছেন সমষ্টির চেতনাকে, তেমনই একটি কবিতা 'টেলেমেকাস'। এ কবিতায় পাওয়া যায় আরেক পিতৃ-প্রতিমা—ব্যক্তি হিসেবে টেলেমেকাসের চোখে অডিসিয়ুসের পিতৃসত্তা মূর্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে কবিতার নিহিতার্থের ভেতর থেকে আরেক পিতৃ-প্রতিমা হিসেবে সমষ্টির চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে ব্যক্তিপুরাণ গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে সমষ্টিচেতনার সঙ্গে, শামসুর রাহমানের পুরাণ-প্রয়োগের গুণে। এজন্য টেলেমেকাস যে ভূমির বর্ণনা উপস্থিত করে তার সঙ্গে ইথাকা নয় বাংলাদেশের অবয়বগত সাদৃশ্য বেশি চোখে পড়ে :

> নয়কো নগণ্য দ্বীপ সুজলা সুফলা শস্যশ্যাম
> ইথাকার আমার ধনধান্যে পুষ্পেভরা। পিতা, তুমি
> যেদিন স্বদেশ ছেড়ে হলে পরবাসী, ভ্রাম্যমাণ,
> সেদিন থেকেই জানি ইথাকা নিষ্পত্র, যেন এক
> বিবর্ণ গোলাপ।
>
> ('*টেলেমেকাস*', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

বঙ্গবন্ধু বন্দি হবার পর এ কবিতাটির জন্ম, কবিতাটির জন্মকথা সম্পর্কে শামসুর রাহমান লিখেছিলেন *কালের ধুলোয় লেখাতে*।[৩৫] *হরিণের হাড়* কাব্যের 'তোমারই পদধ্বনি' কবিতাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে লেখা।[৩৬] সেখানে আবারও পিতৃ-প্রতিমা হিসেবে অডিসিয়ুসের নামোল্লেখ করেছেন :

এই তো তুমি
ওডিসিউসের মতো বেরিয়ে পড়েছো নব অভিযানে।
কসাইখানাকে ফুলের বাগান বানানো যার সাধনা,
তুমি সেই সাধনার অকম্পিত শিখা।

'বাগান' শামসুর রাহমানের কবিতা প্রত্যাশিত স্বদেশের প্রতীক, এ কারণে 'টেলেমেকাস' কবিতাতেও 'বাগানের আগাছা' প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে স্বদেশের নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বর্ণনায়। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় ছিল অডিসিয়ুসের ফিরে আসা, কিন্তু সেই ফিরে আসার পথ ছিল কণ্টকময়। 'টেলেমেকাস' কবিতায় পথের সেই সংকটের কথা স্মরণ করে টেলেমেকাস বলেছে : 'শুনি, তুমি নাকি মৃত, তুমি/ সার্সির সবুজ চুলে বাঁধা পড়ে আছো, বলে কেউ।' সার্সি গ্রিক পুরাণের কুহকিনী নারী চরিত্র।[৩৭] শামসুর রাহমানের আরেকটি কবিতায় অডিসিয়ুস প্রসঙ্গে গ্রিক পুরাণের সাইরেনদের কথা এসেছে, তবে তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন, সেখানে কবি লিখেছেন : 'সাইরেনদের চোখও কি এরকম নিবদ্ধ ছিল অডিসিয়ুসের দিকে?' ('অ্যাকোরিয়াম, কয়েকটি মুখ', *মেঘলোকে মনোজ নিবাস*) তাদের 'চোখ ফসফরাসের মতো উজ্জ্বল' এবং 'চুল সামুদ্রিক শ্যাওলার মতো সবুজ', তাদের কবি আখ্যায়িত করেছেন 'কুহকিনী' নামে। সার্সি এবং সাইরেনদের পেতে রাখা প্রতারণাময়, বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে স্বদেশে ফেরার কথা ছিল ওডিসিউসের।

শামসুর রাহমানের কবিতায় পিতৃ-প্রতিমা নির্মিত হয়েছে দুভাবে—প্রথমত, পিতার দৃষ্টিকোণ থেকে পুত্রের জন্য শোকগাথা, দ্বিতীয়ত, পুত্র বা কন্যার দৃষ্টিকোণ থেকে পিতার জন্য হার্দিক উপলব্ধি। 'ইলেকট্রার গান' কবিতায় ইলেকট্রার চোখে অ্যাগামেমনন আরেক পিতৃ-প্রতিমা, পুরাণ-ভাষ্যের আড়ালে বাংলাদেশের রাজনীতির এক কালো অধ্যায়কে বাণীবদ্ধ করেন শামসুর রাহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা এবং তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার দহন ও প্রতিরোধ-প্রত্যাশার সঙ্গে ইলেকট্রা চরিত্রটির বেদনা সঘনতা ও প্রতিশোধস্পৃহার নান্দনিক সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছেন কবি। পুরাণ ও বাস্তবকে একসূত্রে গেঁথে তোলেন কবি, কবিতায় শৈল্পিক আড়াল নির্মাণে পুরাণ পালন করে উজ্জ্বল ভূমিকা, সেইসঙ্গে সময়সীমা ভেঙ্গে নতুন ও পুরনোর যোগসূত্রও তৈরি হয় : 'ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ কাল-পরিসরে অনন্ত মানবজীবন প্রবাহের বোধ ও প্রজ্ঞার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এই পুরাণের মাধ্যমেই' (সাদিক, ২০০৬ : ১০৫)। ফলে, ইলেকট্রার আর্ত-হাহাকার সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নির্মমতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, অ্যাগামেমননের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের হিসেব মিলিয়ে দেন কবিতার শৈল্পিক শুদ্ধতায় :

সেইদিন আজও জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তির দূত।
নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

(*ইকারুসের আকাশ*)

কবিতাটির শুরু শ্রাবণের মেঘঘন আকাশ ও দুর্যোগময় আবহাওয়ার বর্ণনা দিয়ে, শিল্প-সাহিত্যে কোনো ঘটনার প্রেক্ষাপটে থাকা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দুঃসময়ের ইঙ্গিতবাহী, শামসুর রাহমান সেই পুরনো কৌশলকে আবার নতুন করে ব্যবহার করেছেন এ কবিতায়। অ্যাগামেমননের হত্যাকাণ্ড যেমন পরিবর্তিত করেছিল রাজনৈতিক পট, তেমনি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুও বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। এ কারণে 'ইলেকট্রার গান' যেমন ইলেকট্রার একার শোকগাথা নয়, তেমনি এ কবিতার নিহিতার্থের সঙ্গে মিশে থাকা আরেক বাঙালি দুহিতার কান্নাও কেবল তাঁর একার ছিল না, এ শোক ছিল বাঙালির জাতীয় জীবনের অংশ।

**গ. ত্রাতা চরিত্র**

**নূহ**

ভারতীয় পুরাণে মনুর আখ্যানে মহাপ্লাবনের সংবাদ পাওয়া যায়, গ্রিক মিথে মহাপ্লাবন থেকে মানবসভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিল প্রমিথিউসের পুত্র ডিউক্যালিয়ন। জিউস প্রেরিত মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেতে নৌকা তৈরি করে ডিউক্যালিয়ন, প্লাবনের পর তার স্ত্রী এবং সে মিলে নতুন করে মানবসভ্যতার পত্তন করে, তাদের সৃষ্ট মানবগোষ্ঠী হেলেনিক নামে পরিচিতি পায়। ইহুদি পুরাণ ও *বাইবেলে* মহাপ্লাবন এবং 'নোয়াহ' ও তার 'আর্কের' বিবরণ রয়েছে। পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যে সেই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নূহ নবী; শামসুর রাহমানের কবিতায় নূহ এসেছে ত্রাতার প্রতীকে। কবিতায় তাঁর পুরাণের ব্যবহার মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তবে এই ব্যক্তিচৈতন্যের অভিজ্ঞানের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে থাকে সমষ্টির ইতিহাস, মুক্তির সংকল্প, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সংবেদনা। তাঁর কবিতায় যিশু ও ক্রুশ, অর্ফিয়ুস ও তাঁর বাঁশির মতো নূহ নবী ও মহাপ্লাবন প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে সংকটমুক্তির প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করে। পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যে নূহ নবী সেই নবী যার হাত ধরে মানবসভ্যতা ধ্বংসের ভেতর থেকে পুনরায় সৃষ্ট হয়েছে। নূহ নবীর জীবন ও আখ্যানের সাথে মহাপ্লাবন ও পায়রা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, ঐতিহ্য-পরম্পরা সূত্রে কবি জানতেন 'প্রতিটি প্লাবনের

জলজ হাহাকারে রয়েছে নিজস্ব পায়রা' ('দু' এক দশকের', *নিরালোকে দিব্যরথ*)। তাই যখনই নূহ ও মহাপ্লাবন প্রসঙ্গ এসেছে কবিতায়, শামসুর রাহমান পায়রার উল্লেখ করতে ভোলেননি :

ক. প্রতিটি প্লাবনের জলজ হাহাকারে রয়েছে নিজস্ব পায়রা।
অথচ হা কপাল! কারুর হাতে আজ তেমন শুভবাদী পায়রা নেই!
('দু' এক দশকের', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

খ. তখন পিতাকে ঠিক নূহের মতোই হয়েছিল
মনে, যেন অতিদূর দিগন্তের বুড়ি ছুঁয়ে ফের
সপ্তম পায়রা তাঁর প্রতীক্ষা-কাতর হাতে এসে
বসবে সবুজ ঠোঁটে, চোখ তাঁর নির্মেঘ দুপুর।
('সেই কবে থেকে', *নিরালোকে দিব্যরথ*)

গ. ...কিংবা নূহের কপোত, যার ঠোঁটে
সুবাতাসে স্পন্দমান সবুজ আশ্বাস। জেনে গেছি
চরাচরব্যাপী মহাপ্লাবনের পরেও ভূভাগ
স্নিগ্ধ জেগে থাকে কিছু; তুমিই আমার সেই ভূমি।
('মহাপ্লাবনের পরেও', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

ঘ. একদা আমার স্বপ্ন সুপ্রাজ্ঞ নূহের করতল
থেকে উড়ে-যাওয়া কপোতের মতো ছিল যার ঠোঁটে
পুষ্পল জলজ কণা সদ্য জাগা পল্লবের ঘ্রাণ।
('তৃণে খুঁজি তীর', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

উপরিউক্ত উদাহরণের 'ক' সংখ্যক পঙক্তিমালায় 'পায়রা' হয়ে উঠেছে শুভবাদী চেতনার প্রতীক, নিমজ্জমান সময়ের গর্ভে আশার বাণীবাহী পায়রার অভাবজনিত বেদনা মুখ্য হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক প্রতীতি অনুযায়ী পায়রা বা কবুতর অথবা কপোত পবিত্র পাখি, আধ্যাত্মিকতার প্রতীক—'কবুতর অর্থাৎ উড়ন্ত এক পাখি। মোটামুটি বলতে পারেন আত্মার এক সর্বকালীন প্রতীক, খ্রিস্ট ধর্মে যেমন পুণ্যাত্মার।' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ২৫৬) প্রাচীনকাল থেকেই পায়রা মেসেঞ্জার অর্থাৎ বাহকের ভূমিকা পালন করেছে দক্ষতার সাথে। মহাপ্লাবনের পর নূহ পায়রাকে পাঠিয়েছিলেন নতুন ভূমির অনুসন্ধানে, পুরাণ অনুযায়ী পায়রা ফিরে এসেছিল ঠোঁটে নিয়ে সবুজ জলপাই পাতা। উদাহরণ খ'র 'সবুজ ঠোঁটে', উদাহরণ গ'র 'সবুজ আশ্বাস', উদাহরণ ঘ'র 'পল্লবের ঘ্রাণ' মূলত সেই সবুজ পাতারই

ইঙ্গিতবাহী, যে পাতা জানান দিয়েছিল পৃথিবীতে নতুন করে জেগে ওঠা ভূমির অস্তিত্ব, পুনরায় মানবসভ্যতা পত্তনের আশ্বাস। এই আশ্বাসবাণীর বাহক ছিল নূহ প্রেরিত পায়রা, এজন্য নূহের আখ্যানে পায়রার প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। উপরিউক্ত উদাহরণের 'গ' সংখ্যক পঙক্তিমালায় নূহ ও পায়রার পৌরাণিক চেতনাকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করেছেন শামসুর রাহমান। ছকবদ্ধতা ভেঙ্গে পৌরাণিক জ্ঞানকে তিনি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন প্রেমের প্রসঙ্গে, যে কোন পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্রকে বিষয়ব্যঞ্জনার সঙ্গে ঘনবদ্ধকরনের মুন্সিয়ানাই প্রকৃত কবির স্বভাব। নূহ তাঁর কবিতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক পুরাণ হিসেবে স্থান পেয়েছে, ব্যক্তি-চেতনার সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে কখনও কখনও সমষ্টির প্রতিরোধ-চেতনার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে নূহের পুরাণ।[৩৮] এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, দেশবিভাগোত্তর ও স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে দেশ একাধিকবার সমরতন্ত্রের অধিগত হয়, সেই অপশাসনের করতল থেকে দেশকে মুক্ত করতে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে কবিতা। শামসুর রাহমান দুভাবে এই প্রতিরুদ্ধতা তৈরি করেছিলেন, প্রথমত নিজে কবিতা লিখে, দ্বিতীয়ত কবিতা পরিষদের প্লাটফর্মে সারা দেশের কবি সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে।

যখন স্রষ্টা সংকল্প করেছিলেন মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে পুনঃসৃষ্টির, সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল নূহের হাতে। নূহ ছিলেন মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ত্রাতার ভূমিকায়, সমকালের আরেক প্লাবন ও ঝড়ে বিপন্ন মানবতার পাশে শামসুর রাহমান মওলানা ভাসানীকে আবিষ্কার করেছিলেন নূহের মতো ত্রাতার ভূমিকায়। সত্তরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতার মুখে অসহায় বাঙালির পাশে নূহের মতো নিবিড় মমতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভাসানী : 'যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ' ('সফেদ পাঞ্জাবি', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)। এভাবেই শামসুর রাহমানের ব্যক্তি-পুরাণের ভেতর অনুপ্রবেশ করে সমষ্টিচেতনা : 'নিজ আত্মভুবনের সঙ্গে স্বদেশ-সমকালের যে উত্থান-সংঘাত, দুঃখ-বিষাদ, জয়-পরাজয়ের বিজড়ন, তারও শোভাভূমি হয়ে ওঠে মিথপট' (কামাল, ১৯৯৯ : ৪৩)। এছাড়া 'আমি কী করে কাজ পাবো' (*নিরালোকে দিব্যরথ*), 'এই রক্তধারা যায়' (*হোমারের স্বপ্নময় হাত*), 'নূহের জনৈক প্রতিবেশী' (*কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*), 'মঞ্চের মাঝখানে' (*মঞ্চের মাঝখানে*) কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে নূহের আখ্যান ব্যবহার করেছেন।

**স্যামসন**

শামসুর রাহমান পুনরুজ্জীবনবাদে আস্থাশীল, ফলে তিনি বিশ্ব খুঁজে এমন সব পুরাণ-অনুষঙ্গ উপস্থাপন করেন যার সঙ্গে পুনরুজ্জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। *বাইবেল* ও ইহুদি পুরাণে স্যামসন

অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী ধর্মীয় নেতা এবং ফিলিস্তিনের মুক্তিদাতা। প্রতিপক্ষ ইসরায়েলের হাতে বন্দিত্ব, অন্ধত্ব, দাসত্ব—সবই তার কৃতকর্মের ফল। চুলহীন হৃতশক্তি স্যামসনের এক ধরনের মানসিক মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল। সেই যন্ত্রণাকাতর, নিঃসীম হতাশা থেকে নতুন শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠা এবং শত্রুশিবিরে আত্মঘাতী ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর দিয়ে স্যামসনের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিষ্ঠা। মিলটন স্যামসনকে উপজীব্য করে ক্লোজেট ড্রামা লিখেছিলেন ১৬৭১ সালে, শামসুর রাহমান বিংশ শতাব্দীতে কেন স্যামসনকে কবিতার বিষয়ে টেনে আনলেন? মূলত 'কবি তাঁর সময়ের মুখপত্র নন, মুখপাত্র। তাই, যিনি কবি তাঁর, একমাত্র তাঁরই, কোনো বধিরতা নেই—নেই বলে তিনিই পারেন সাড়া দিতে সময়ের উঁচুনিচু, সর্বজনীন-ব্যক্তিগত, সকল প্রকারের স্পন্দনে। তাঁর সময়ের পটে তিনিই সব চেয়ে জীবন্ত, সব চেয়ে সজাগ' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ২৫০)। কবি হিসেবে শামসুর রাহমান সজাগ বলেই যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে জাতীয়তা চেতনাকে শাণিতকরণের লক্ষ্যে স্যামসনের শক্তিমত্তাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। স্যামসন ট্র্যাজিক হিরোতে পরিণত হয়, প্রেয়সী দালিলাহর কাছে তার অলৌকিক শক্তির রহস্যোন্মোচন তার জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। মিলটন যেমন ইসরায়েলে বন্দি স্যামসনের অন্তর্গত দহন দেখেছিলেন, শামসুর রাহমানের কবিতাতেও স্যামসনের কৃতকর্মের অনুশোচনা ও যন্ত্রণাকাতর ফলভোগের বিবরণ মেলে :

নিজ দোষে আজ
চক্ষুহীন, হৃতশক্তি, দুঃস্বপ্নপীড়িত। এখন আমার কাজ
ঘানি ঠেলা, শুধু ভার বওয়া শৃঙ্খলের।
('স্যামসন', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

প্রাচীন ফিলিস্তিনের দ্বাদশতম এবং সর্বশেষ কাজি ছিলেন তিনি। তার শক্তি-উৎস ছিল তার না কামানো চুল, যা পরবর্তীকালে দালিলাহর বিশ্বাসঘাতকতায় কাটা পড়ে। কিন্তু চুলের ধর্ম বেড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা চুলের মতোই স্যামসনের মহাশক্তিও পুনরুত্থিত হয়েছিল তার সত্তায়। ইসরায়েলিদের হাতে অন্ধত্ব বরণ করা স্যামসন ভোলেনি কর্তব্যকর্ম, স্বজাতির প্রতি নিপীড়ণ তার অন্ধ সত্তাকেও করেছিল আন্দোলিত, বহু বছর পরে গণতন্ত্র-প্রত্যাশী স্বদেশবাসীর প্রতি অনাচার দেখে আবারও শামসুর রাহমান শক্তিমত্ত, সাজাত্যবোধে অনড় স্যামসন-প্রসঙ্গের অবতারণা করেন :

কিন্তু বোঝে না দেশের জনগণ
শক্তিমান স্যামসন, অন্ধ করে রাখলেও টের
পায় অনাচার, অবিচার আর প্রবল হুঙ্কারে

কেশর দুলিয়ে ত্বরান্বিত করে শত্রুর পতন।

('জ্বলছে স্বদেশ', *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি*)

স্যামসনের শক্তির উৎস যে চুল, তাকে নিজের চুলের সঙ্গে সমার্থক করে তিনি কি নিজের অসহায় অক্ষমতার ইঙ্গিত প্রদান করেন কবিতায়?—'খুব/ছোট হয়ে গেছে আমার স্যামসনী চুল কাঁচির দাপটে' ('চুল', *উজাড় বাগানে*)। কারণ শক্তির উদ্বোধন মানেই স্যামসনের চুলের কারিশমা, চুলের বেড়ে ওঠা। কবি তাঁর নিজস্ব সত্তায় শক্তির মহা উদ্বোধনের প্রকাশ ঘটাতে আবার আশ্রয় নেন স্যামসনী পুরাণের :

আমার সত্তার ঘটে রূপান্তর, আমার নমিত
কেশগুচ্ছ হয়ে ওঠে স্যামসনের কেশর এক লহমায়—

('দাঁড়ালে টলতে থাকি', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*)

স্যামসনের চুলকে তিনি দেখেছেন বিপুল বিদ্রোহী শক্তির উৎস হিসেবে। এছাড়া *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো* কাব্যের 'অপ্রেমের কবিতা' আরও একবার তুলে এনেছেন স্যামসন প্রসঙ্গ।

### আন্তিগোনে

শামসুর রাহমানের পুরাণাশ্রিত আরেকটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা 'আন্তিগোনে', কবিতাটি স্থান পেয়েছে *বন্দি শিবির থেকে* কাব্যগ্রন্থে। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত, 'আন্তিগোনে' কবিতাটি সেই দুঃসময়কে পশ্চাদভূমিতে রেখে রচিত। আন্তিগোনে ব্যক্তিচরিত্রকেন্দ্রিক পুরাণ, একাত্তরের প্রেক্ষাপটে এই চরিত্রটিকে প্রতিস্থাপন করে শামসুর রাহমান বাঙালির এক চূড়ান্ত সংকটের কাল ও মানবতার চরম বিপর্যয়কে চিত্রায়িত করেছেন :

আন্তিগোনে দ্যাখো চেয়ে—
একটি দুটি নয়কো মোটে,
হাজার হাজার মৃতদেহ
পথের ধুলায় ভীষণ লোটে।

সফোক্লিসের আন্তিগোনের সামনে একটি লাশের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ ছিল, একাত্তরে হাজার হাজার সৎকারবিহীন মৃতদেহের দুর্দশায় শামসুর রাহমান আন্তিগোনের শরণ গ্রহণ করেন। তিনি মানবতাবাদী কবি ছিলেন, একাত্তরের প্রেক্ষাপটে তাঁকে আমরা প্রবল জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবেও

চিহ্নিত করতে পারি, এ দুটো বোধের সমন্বিত তাড়নায় কবি আন্তিগোনেকে সফোক্লিসের প্রাচীন গ্রিসের বাস্তবতা থেকে টেনে আনেন বাংলাদেশের বিশ শতকীয় বাস্তবতায়। একাত্তরে নিহত অগণিত মানুষের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের জন্য আন্তিগোনের মতো মানবতাবাদী এবং সাহসী চরিত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছেন তিনি, তাই আন্তিগোনেকে তাঁর আকুল আহ্বান : 'আন্তিগোনে, আন্তিগোনে/ রুক্ষ পথে ব্যাকুল ডাকি।'

শামসুর রাহমান আন্তিগোনে চরিত্র অবলম্বনে এই একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন, পুরাণের অন্যান্য চরিত্রকে নিয়ে একাধিক কবিতা প্রনয়ণের প্রয়াস দেখা যায়, তেমনটি আন্তিগোনের ক্ষেত্রে ঘটেনি, একমাত্র হলেও কবিতাটি দীর্ঘ এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীর। তিনি পুরাণের নানা উৎস থেকে চরিত্র সংগ্রহ করে এনে তাঁর কবিতায় প্রতীক নির্মাণ করেছেন, বক্তব্যকে করেছেন আরও পরিশীলিত এবং হৃদয়গ্রাহী। তাঁর কবিতায় সবচেয়ে বেশি পুনরাবৃত্ত হয়েছে যেসব পৌরাণিক চরিত্র, তার মধ্যে অর্ফিয়ুস, নূহ এবং যিশু উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরও অনেক চরিত্র একাধিক কবিতায় উপস্থিত হয়েছে পৌরাণিক ঐতিহ্য এবং প্রতীকী প্রত্যয় নিয়ে—ভারতীয় পুরাণের কর্ণ, একলব্য, বাসুকি, লোকপুরাণের বেহুলা-লখিন্দর, গ্রিক পুরাণের একিলিস, টাইরেসিয়াস, সোলেমান বাদশাহ প্রমুখ পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব।

**অন্যান্য পৌরাণিক চরিত্র**

**একিলিস ও কর্ণ**

শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিচ্ছিন্ন পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রের চিত্রায়ণ করেছেন; 'এ্যাকিলিসের গোড়ালি' (*ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই*) কবিতায় তিনি ট্রয়-যুদ্ধের নায়ক, অরক্ষিত গোড়ালির অধিকারী এ্যাকিলিসের জীবনের ট্র্যাজেডির সঙ্গে ব্যক্তিগত আয়রনিকে মেলাতে চেয়েছেন। ভারতীয় পুরাণে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ শরীর দুর্বাসার বরে অভেদ্য হয়েছিল শুধু পায়ের তালু ব্যতিত, একইভাবে পাতালপুরীর পবিত্র নদীতে শরীর ডোবানোর ফলে এ্যাকিলিসের শরীর হয়ে ওঠে অভেদ্য শুধু গোড়ালি ব্যতিত। কৃষ্ণ পায়ের তালুতে বাণবিদ্ধ এবং এ্যাকিলিস গোড়ালিতে তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর দেবতা সুযোগ-সন্ধানী, এ্যাকিলিসের গোড়ালির মতোই কোন এক অরক্ষিত স্থানে আঘাত করে ভেদ করতে চায় কবির জীবন : 'যম অসৌজন্যমূলক ভ্রুকুটি হেনে...ঈগলদৃষ্টিতে খোঁজে খালি/আমার অস্তিত্বের এ্যাকিলিসের গোড়ালি' ('এ্যাকিলিসের গোড়ালি', *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই*)। মহাভারতে কর্ণ সাহসী যোদ্ধা, তাঁকে উপজীব্য করে শামসুর রাহমান একাধিক কবিতা রচনা করেছেন :

ক. ...এবং চাকা নাছোড় কাদায়
দেবে যাবে নিশ্চিত জেনেও আজও তূণে খুঁজি তীর।
('তূণে খুঁজি তীর', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)

খ. আমার রথের চাকা শোচনীয়ভাবে দেবে গেছে
আঠালো কাদায়
('নীল কুয়াশায়', *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)

গ. একজন কাঠুরেকে স্বপ্নাদ্য একটি গাছ টানে
এবড়োথেবড়ো জমিনের সীমানায়,
যেখানে গাছটি অনাদরে উপেক্ষায় বেড়ে ওঠে
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
যেন বীর কর্ণ, যার রথের ভাস্বর চাকাদ্বয়
দেবে যাবে মাটিতে।
('গাছ, কফিন এবং নৌকা', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*)

পুরাণের আরেক ট্র্যাজিক হিরো কর্ণ, এ প্রসঙ্গে তিনি আলোকপাত করেছেন তার জীবনের সেই একটি মুহূর্তের প্রতি, যে মুহূর্তটি মহাবীর কর্ণের পতনের কারণ। ব্রাহ্মণের হোমধেনুকে হত্যা করায় তিনি কর্ণকে অভিসম্পাত দেন : 'যুদ্ধকালে তাঁর মহাভয় উপস্থিত হবে এবং পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করবে', রথের চাকা কাদায় আটকে পড়ার কারণে অর্জুনের হাতে তার মৃত্যু সংঘটিত হয়, কর্ণ প্রসঙ্গে তিনি বারবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এই মুহূর্তটির ওপর আলো ফেলেছেন।

**একলব্য**

একলব্যের একনিষ্ঠতার গুণকীর্তন করে শামসুর রাহমান 'খণ্ডিত গৌরব' এবং 'মিহিরের উদ্দেশে' শিরোনামে দুটি কবিতা লিখেছেন :

ক. আমার হাতে একলব্যের রিক্ততার হাহাকার;
কে আমাকে বলে দেবে
কোন দ্রোণাচার্যের পায়ের তলায়
লুটোচ্ছে আমার খণ্ডিত গৌরব?
('খণ্ডিত গৌরব', *খণ্ডিত গৌরব*)

খ. আমি একলব্যের মতো
আজো দূর থেকে অনুসরণ করে চলেছি তার নীতি। মিহির,

তোমাকে কোনদিন বলিনি এ কথা।

('মিহিরের উদ্দেশে', *উজাড় বাগানে*)

'একলব্যের রিক্ততার হাহাকার' দ্রোণাচার্যের দান, অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব-রক্ষায় দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা হিসেবে সুকৌশলে চেয়ে নিয়েছিলেন একলব্যের আঙ্গুল, সে ছিল আর্যের চাতুরি এবং এক অনার্য বীরের পতনের আখ্যান। ১৯৮৭ সালে *ঝরনা আমার আঙুলে* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাঁর বিশ্বাস ছিল সৃজনের জগতে তিনি চাইলেই ঝরনার মতো স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্রবণ ঘটাতে সক্ষম, কিন্তু অতৃপ্ত কবিসত্তা সেই বিশ্বাসে আস্থা হারায়। একলব্যের বীরত্ব যেমন বিনাশ করেছিল দ্রোণাচার্য, তেমনি কোন বিনাশী শক্তির প্রভাবে যেন কবি তাঁর পূর্ব-শক্তি থেকে বিচ্যুত, রিক্ত কবি হৃদয় একলব্যের পুরাণের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছে—উদাহরণ 'ক' সেই রিক্ততার হাহাকারের ভেতর দিয়ে কার্যকারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী কবি। উদাহরণ 'খ'তে একলব্য এসেছে একনিষ্ঠতার প্রতীক হিসেবে, দ্রোণাচার্যের প্রত্যাখ্যানের পর গুরুর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিস্থাপন করে নিগূঢ় সাধনায় সে হয়ে উঠেছিল অর্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। একলব্যের সেই একনিষ্ঠতা কবির ভেতরে দেখা যায় মিহিরের বাবাকে অনুসরণের ক্ষেত্রে। মিহির এবং জামিল আখতার নামক দুই 'মানিকজোড়' বন্ধুর আখ্যান দিয়ে সাজানো 'মিহিরের উদ্দেশে' কবিতাটি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার মিহিরের পরিবার দেশান্তরী হলেও যে মানবতাবোধ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা জামিল পেয়েছিল মিহিরের বাবার কাছ থেকে, দৃষ্টির আড়াল থেকে সেই আদর্শকে একলব্যের একনিষ্ঠতায় লালন করেছে জামিল।

**বেহুলা-লখিন্দর**

মনসামঙ্গল কাব্য মূলত আর্য দেবতা শিব ও অনার্য দেবী মনসার বিরোধের আখ্যান, তৎকালীন সমাজের শ্রেণিচেতনাও কাব্যটির অন্তস্থলে প্রবহমান, শামসুর রাহমান এ কাব্য-আখ্যানের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তে বেহুলা-লখিন্দর উপাখ্যানের দিকে অধিকতর মনোযোগী, বিশেষ করে বেহুলা চরিত্রের দিকে। লখিন্দরকে কেন্দ্র করে আখ্যান গতি লাভ করলেও লখিন্দর নিষ্ক্রিয়, এ অংশের সক্রিয় চরিত্র বেহুলা। কবি যখন মৃত্যুমুখী দুঃসময়ের মুখোমুখি, তখন বেহুলার মতো জীবন-পথের সাহসী অভিযাত্রিক প্রয়োজন ছিল। বেহুলা তাঁর কবিতায় চালিকাশক্তির প্রতীক, চালিকাশক্তিহীন মৃত লখিন্দর যেমন এক চেতনাহীন-প্রাণহীন শরীর কেবল, নতুন প্রত্যয়ে জেগে ওঠার সম্ভাবনাহীন, ব্যর্থ স্বাধীনতাকে তিনি তেমনি 'বেহুলাবিহীন' মৃত লখিন্দর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন :

মনে হয়, স্বাধীনতা লখিন্দর যেন,
বেহুলাবিহীন,
জলেরই ভেলায় ভাসমান।

('স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী কবিতার মতো', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

'জলের এমনই রীতি' কবিতাতেও বেহুলাকে চালিকাশক্তি হিসেবে কল্পনা করে কবি বলেছেন : 'ভেলায় থাকি পড়ে লখিন্দর, একা, বেহুলাবিহীন' (*আমি অনাহারী*)। এছাড়া আরও অনেক কবিতায় বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন শামসুর রাহমান : 'গৌণ শিল্প' (*আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*), 'জনৈক লেখকের কথা', (*রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*), 'তার চোখে আমি' (এক ধরনের অহংকার), 'কবির ডায়েরি' (প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে), 'এক মহিলার ভাবনা' (দুঃসময়ে মুখোমুখি) কবিতায় বেহুলার উল্লেখ রয়েছে। 'গৌরী ধোপানীর ঘাটে'র উল্লেখ করেছেন *অবিরল জলভ্রমি* কাব্যের 'মশারির ঘেরাটোপে' ও 'যখন চণ্ডীদাস' কবিতায়।

**বাসুকি**

বাসুকি নাগরাজ, ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্যমতে ব্রহ্মার আদেশে বাসুকি পাতালপুরীতে নেমে পৃথিবীর ভার কাঁধে তুলে নেয়, পুরাণানুযায়ী বাসুকির ফণার দোলায় কম্পিত হয় পৃথিবী, সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। ভারতীয় পুরাণের বিশ্বাসকে স্পর্শ করে ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শামসুর রাহমান বলেছেন : 'কী যে ভয়/ পেয়েছিল লোকজন বাসুকির ফণার দোলায়' ('গ্রামীণ', *বন্দি শিবির থেকে*)। 'খবরে প্রকাশ' (*খুব বেশি ভাল থাকতে নেই*) এবং 'ভূমিকম্প' (*সে এক পরবাসে*) কবিতাতেও ভূমিকম্প প্রসঙ্গে বাসুকি-পুরাণকে স্মরণ করেছেন। *আমার ক'জন সঙ্গী* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কোথায় দাঁড়াবে' কবিতায় 'বাসুকি কখন ফণা তুলে' বাক্যবন্ধে প্রতিহিংসা-প্রজ্জ্বলিত সময়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন কবি। তবে 'দ্রুত মুছে দেব' কবিতায় বাসুকি-পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্নমুখী তাৎপর্য নিয়ে : 'বাসুকির মতো ফণা তুলে ঢেউগুলি/ করুক আঘাত, পাবো না কখনো ভয়।' (*হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*) প্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জমান কবি, সে সমুদ্রের বাসুকির ফণাসম ঢেউয়ের মুখেও কম্পিত নয় প্রেমিক-সত্তা, দুঃসাহসী প্রেমিক-চারিত্র্য রূপায়ণে বাসুকি-পুরাণ উপমা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

**পুরাণের আলঙ্কারিক প্রয়োগ**

কবিতার বিষয়নির্মাণে এবং ভাবের গভীরতা দানের ক্ষেত্রে যেমন পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্র-পাত্রকে নানা উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন শামসুর রাহমান, তেমনি কাব্যভাষার সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রত্যয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন পৌরাণিক নানা অনুষঙ্গ। পুরাণের আলঙ্কারিক প্রয়োগের কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. ধৃতরাষ্ট্রের মতো চেয়ে থাকি
('একটি কান্না', *আমি অনাহারী*)

খ. তাহলে কী হিল্লে হবে
আমাদের অহল্যা কাব্যের
('বন্ধুকে প্রস্তাব', *ইকারুসের আকাশ*)

গ. বস্তুত সত্তার মৌন তটে
অপরূপ সখ্যে জেগে ওঠে দুলিয়ে চিত্রিত মাথা
মনসার গৌরবের মতো এক অনার্য সভ্যতা।
('এক দশক পরে', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)

ঘ. দুলিয়ে স্বপ্নিল পাখা মেঘ চিরে সফেদ বোররাক
সপ্ত আসমান থেকে আসে নেমে এই সমাধিতে
('কবির কবর', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)

ঙ. অপেক্ষায় আছি নিত্যদিন
যেমন প্রকৃত মোমিন থাকেন প্রতীক্ষায় ঈদের চাঁদের জন্য রমজানে।
('মর্মমূল ছিঁড়ে যেতে চায়', *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*)

চ. আলিফের
মতো পড়ে আছে মলিন শয্যায়
('একা শুয়ে আছে', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)

ছ. আমার ঘর তোমার ঘ্রাণ সেই কখন থেকে
বুকে চেপে রেখেছে যক্ষের মতো
('চিরকেলে প্রশ্ন', *আকাশ আসবে নেমে*)

জ. নড়ে ওঠে সুপ্রাচীন

ডাইনোসরের মাথা, হিংস্র দাঁতগুলো

নিমেষে আমাকে গেঁথে ফেলে, যেন আমি মহিমাবিহীন যিশু!

('কৃষ্ণপক্ষে অসহায় পঙ্‌ক্তিমালা মহিমাবিহীন যিশু', *ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে*)

উদাহরণ 'ক'-তে মহাভারতের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগে দৃষ্টিহীনতাকে নির্দেশ করেছেন কবি, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের পেছনে রয়েছে এক বিশাল পৌরাণিক প্রেক্ষাপট, তবে কবির মনোযোগ কেবল তার অন্ধত্বের প্রতি। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বকে কেন্দ্র করে শামসুর রাহমান আরও কিছু কবিতায় অলঙ্কার সৃষ্টি করেছেন – 'কোথাও সোনালি ঘণ্টা' (*প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*) ও 'আমি এক ভদ্রলোককে' (*ধুলোয় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*)। উদাহরণ 'খ'-তে বাংলা কাব্যধারাকে অহল্যা-রূপকে দেখেছেন কবি, অহল্যা ঊষার প্রতীক, এখানে ঊষাকালের বাংলা কাব্যের অবস্থাকে নির্দেশ করেছেন তিনি। আবার চেতনাহীন, নিদ্রিতা, অভিশপ্ত এবং নতুন চেতনা লাভের জন্য প্রতীক্ষমান অহল্যা বাংলা কাব্যের মুক্তির প্রতীক। লোকপুরাণের দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছেন চিত্রকল্প উদাহরণ 'গ'-তে। 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় মনসার স্বৈরাচারী প্রবণতাকে বড় করে তুলেছিলেন, এখানে অনার্য সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে মনসাকে গৌরবান্বিত করেছেন। উদাহরণ 'ঘ' 'বোররাক' নামক ডানাওয়ালা ঘোড়ার পৌরাণিক অনুষঙ্গ নিয়ে নির্মিত, ঘোড়া শামসুর রাহমানের একটি প্রিয় অনুষঙ্গ, ছোটবেলায় মহররমের শোককাহিনি তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল,[৩৯] তাছাড়া পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বাহনও ছিল ঘোড়া। পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যে বোররাকের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে মহানবীর 'মেরাজে'র ক্ষেত্রে। কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে তিনি বোররাক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। 'চাঁদ' শামসুর রাহমানের কবিতায় আলো ও শুভচৈতন্যের প্রতীক, চাঁদকে নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অলঙ্কারের জন্ম দিয়েছেন। উদাহরণ 'ঙ' তে চাঁদকে মিলিয়েছেন পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, রমজানে একমাসের জন্য ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে উপবাসের যে সাধনা, সেখানে ঈদের চাঁদ বহু প্রতীক্ষিত, আনন্দের প্রতীক; কবি তেমন করে প্রতীক্ষারত দয়িতার জন্য। 'কাল এবং আগামীকাল' কবিতায় ঈদের চাঁদকে উপমা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করেছেন দয়িতার দৈহিক-সৌন্দর্য নির্দেশে : 'ঈদের চাঁদের মতো তোমার ভুরু' (*ধ্বংসের কিনারে বসে*)। কবিতায় অলঙ্কার নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি অনেক সময় চাঁদের প্রসঙ্গকে যুক্ত করেছেন ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে।[৪০] উদাহরণ 'চ' নির্মিত হয়েছে আরবি বর্ণমালার প্রথম হরফ 'আলিফ' দিয়ে, তিনি আলিফের সঙ্গে শয্যাশায়ী ব্যক্তির আকারগত সাদৃশ্য নির্মাণ করেছেন। যক্ষ যেমন সম্পদের প্রহরায় একনিষ্ঠ, তেমনি কবির ঘর একনিষ্ঠতার সঙ্গে দয়িতার শরীরের ঘ্রাণ ধরে রেখেছে, উদাহরণ 'ছ'-তে

উপমা অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় পুরাণের যক্ষকে কেন্দ্র করে। যিশু এবং ক্রুশ শামসুর রাহমানের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত পৌরাণিক অনুষঙ্গ : 'শামসুর রাহমান খ্রিস্টীয় চিত্রকল্পের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন : জেসাস, ক্রুশ, গলগোথা, কণ্টকমুকুট, পেরেক বহুব্যবহৃত তাঁর কবিতায়। যিশু ও ঈশ্বর সাম্প্রতিক অপ্রধান কবিদের নিকট পরম প্রিয় দুটি চিত্রকল্প' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২০০)। 'উদাহরণ 'ঙ' খ্রিষ্টধর্মের কর্ণধার, *বাইবেলের* যিশু, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই যিশুকে নিয়ে তৈরি করেছেন উৎপ্রেক্ষা, কবি তাঁর মনোলোকে যেভাবে বিদ্ধ হন, রক্তাক্ত হন সেটি অনেকটা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মতই যন্ত্রণাময়। ভারতীয় পুরাণের 'লঙ্কাকাণ্ড' শব্দটি পুরাণের পাতা থেকে বাঙালির জনজীবনে বহু পূর্ব থেকে প্রবচন আকারে প্রবেশ করেছিল, শামসুর রাহমানের অনেক কবিতায়[৪১] রামায়ণের 'লঙ্কাকাণ্ড' প্রবাচনিক ভাবমূর্তি নিয়ে চিত্রিত হয়েছে।

ভারতীয় পুরাণ, পাশ্চাত্য পুরাণ, পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য, বৌদ্ধ পুরাণ—পুরাণের এসব ভৌগোলিক বিভাজনের ভেতরে রয়েছে আরও অনেক ছোট ছোট উপবিভাগ। ভারতীয় পুরাণের তালিকায় *রামায়ন*, *মহাভারত*, *উপনিষদ* ছাড়াও লোকপুরাণ অন্তর্ভুক্ত, পাশ্চাত্য পুরাণের ভেতরে সঞ্চিত রয়েছে নানা দেশের পুরাণ-অভিজ্ঞান। শামসুর রাহমান পুরাণ ব্যবহারে গ্রিক পুরাণের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন, তবে পুরাণের অন্যান্য উৎস সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন না, ফলে তাঁর কাব্যের এক ব্যাপক পরিসর জুড়ে রয়েছে পৌরাণিক অনুষঙ্গের নানামাত্রিক ব্যবহার। তিনি পুরাণ ব্যবহার করতে গিয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন ব্যক্তিগত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বেদনা ও সংকটকে, সমষ্টির জীবন ও সংকট রূপায়ণে তিনি কখনও কখনও দ্বারস্থ হয়েছেন পুরাণ-অভিজ্ঞতার, তবে এ অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিসত্তা নির্দেশে যত ব্যাপক ও বিস্তৃত, সমষ্টির স্বার্থের ব্যাপারে ততটা সজাগ নয়; পৌরাণিক ঘটনা বা অন্যান্য অনুষঙ্গ ব্যবহারের তুলনায় ব্যক্তি-চরিত্র নিয়ে কবিতানির্মাণে তিনি বেশি আগ্রহী, সেদিক বিচারে বলা যায়, 'শামসুর রাহমান পুরাণ ব্যবহার করেন ব্যক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যেই; পুরাণের আলোকে সমগ্র জাতির ভাষ্য রচনা সাধারণত তাঁর লক্ষ নয়' (আজাদ, ১৯৮৩ : ১২৩)। শামসুর রাহমানের কাব্য-যাত্রা শুরু হয়েছিল পুরাণ-অভিজ্ঞানকে আশ্রয় করে, শিল্পের অঙ্গীকার নিয়ে তিনি প্রচলিত জীবনকে মৃত ঘোষণা করে দ্বিতীয় জীবনে প্রবেশ করেন, দ্বিতীয় জীবনে প্রবেশের পর তিনি কবিতা নির্মাণ করেছিলেন, যে কবিতা 'সর্বাত্মক ক্ষয়ের মুখে ফুল ফোটানোর প্রেরণা যোগায়' (রহমান, ২০০০ : ১৮৩)। প্রবহমান বিরূপ কালের বিরুদ্ধে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন মৃতুঞ্জয়ী চেতনা নিয়ে, তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী কবি-আত্মার প্রতীক ল্যাজারস, পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনায় স্নাত হয়ে তিনি কবিতায় পুরাণের নানা উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন প্রতীক। সংগৃহীত প্রতীকসমূহ তাঁকে ঐতিহ্যনিষ্ঠ, শিকড়সন্ধানী কবি

হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তবে তিনি প্রতীকসর্বস্ব কবি নন। অতীতের পুরনো ঐতিহ্য, আদি ইতিহাস ও পুরাণ অনুসন্ধান করে নির্মিত প্রতীকেরা তাঁর বক্তব্যকে বর্তমানকাল সংলগ্ন করার ক্ষেত্রে পালন করেছে সংযোগ-সুতোর ভূমিকা। শামসুর রাহমান মানবতাবাদী, প্রগতিশীল এবং সময়-সচেতন কবি, শিল্পের সাধনা ছিল তাঁর জীবনের প্রধানতম ব্রত, সেই ব্রত-সাধনায় পুরাণের অসীম সম্ভাবনাকে তিনি দু'হাতে ব্যবহার করেছেন কবিতায়, ফলে পুরাণকে তাঁর কবিতার বিষয় ও কাঠামো নির্মাণের মৌল উপাদান হিসেবে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি দান করা যেতে পারে।

## টীকা

১. 'The Burial of the Dead', Eliot, 1969 : 61

২. 'অ্যাপোলো তোমার মেধাবী হাসির সোনালি ঝরনা/ শিশু পৃথিবীর ধূসর পাহাড়ে এখনও কি রবে লুপ্ত?/ আমরা এখানে পাইনি কখনো বন্ধু তোমার/ সোনালি রুপালি গানের গভীর ঝংকার'

৩. কবিতার এরকম আগ্রাসন আমরা দেখতে পাই শামসুর রাহমানের শরীর ও মনের প্রতিটি অংশে : 'ত্বরিত বলক আসা দুধের মতন/ কবিতা ফুটছে হাড়ে, মজ্জায়, চাঁদিতে/ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, প্রতি রোমকূপে, নখে।' ('ঘুমোতে যাবার আগে', স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার)

৪. *মাতাল ঋত্বিক* কাব্যগ্রন্থের নামকরণে পৌরাণিক প্রভাব রয়েছে, এছাড়া এ কাব্যের 'ফিনিক্সের গান', 'অর্ফিয়ুস, ১৯৭৮', 'সহসা যিশুর হাত' কবিতাসমূহের শিরোনাম কবি নির্বাচন করেছেন পুরাণ-অনুসরণে।

৫. '২২ শে জুন' কবিতায় আত্মসমালোচনা করে সমর সেন নিজেকে মার্কসিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এলিয়ট আত্মমূল্যায়ণ করতে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন : 'I am royalist in politics, classicist in literature, anglo-catholic in religion.' (হোসেন, ২০১১ : ১৬৫)

৬. এছাড়া 'মর্মমূল ছিঁড়ে যেতে চায়' (*হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*) কবিতায় প্রেমের ভুবনের আরও দুই উজ্জ্বল পুরুষ 'কায়েস' এবং 'ফরহাদের' নামোল্লেখ করেছেন কবি। তুমি নিঃশ্বাস তুমিই হৃদস্পন্দন কাব্যের 'ভালোবাসা কারে কয়' কবিতায় প্রেমের আসর জমিয়েছে কায়েস-লায়লা, ফরহাদ-শিরি প্রমুখ। এ কাব্যের 'মেঘদূত' শিরোনামের কবিতায় আধুনিক অথচ নিরুপায় প্রেমিকসত্তা যক্ষের মতো দয়িতার কাছে হৃদয়বার্তা পাঠানোর ব্যাকুলতা অনুভব করেছেন।

৭. 'দুর্লভ মনির মতো স্তন/ ঘন হলো বাসনার তাপে, যেমন গ্রীষ্মের ফল/ গাঢ় হয় সূর্যের চুম্বনে।' ('সুন্দরের গাথা', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*।

৮. 'প্রগাঢ় যযাতি রাত্রি মাথায় লাগায় চুপিসারে/ স্বপ্নের কলপ'।

৯. 'এই মাতোয়ালা রাইত' কবিতা নিয়ে শামসুর রাহমানের প্রতি অভিযোগ করে এক যুবক, এ বিষয়ে *কালের ধুলোয় লেখা*তে বলেছেন : 'ঢাকা ক্লাবের সেই যুবকের কথা, লুকাব না, আমাকে বিব্রত, মর্মাহত করেছিল। তারপর বহু বছর কেটে গেছে, আজ অব্দি খাস ঢাকাইয়া ভাষায় আর একটি কবিতাও লিখিনি' (রাহমান, ২০০৪ : ১৯৮)।

১০. শামসুর রাহমানের কবিতায় একাধিকবার এসেছে আদিম শক্তিধর টাইটানদের প্রসঙ্গ। 'মহাপৃথিবীর রাগমালা' (*গৃহযুদ্ধের আগে*) এবং 'গর্জে ওঠো স্বাধীনতা' (*শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*) কবিতায় 'টাইটান' আলঙ্কারিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'মহাপৃথিবীর রাগমালা'য় সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় দায়বদ্ধ কবি টাইটানের মহাশক্তিকে আত্মসত্তায় ধারণ করেন, তাঁর এ রূপান্তর আকাঙ্ক্ষা মানবতার শত্রু এবং ধর্মান্ধ মৌলবাদী কর্মকাণ্ড বিনাশের প্রয়োজনে। সংহার-প্রবণ সময়ের কোলে লালিত কবি চিরকাল মানবতার চর্চা করেছেন, মানবতাকে রক্ষার প্রয়োজনেই কেবল তিনি বিনাশী শক্তির আবাহন করেন। অন্যদিকে 'গর্জে ওঠো স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতাকে 'ক্রুদ্ধ টাইটানের' মতো মহাশক্তি নিয়ে পুনরাবির্ভাবের আহ্বান করেছেন, কারণ স্বাধীনতার মৌন-মূক রূপের অন্তরালে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত বিনষ্টির দিকে।

১১. 'স্বপ্নের নাম শ্রীমতি' (*অবিরল জলভ্রমি*) কবিতায় ফিনিক্স-পুরাণকে স্পর্শ করে কবি বলেছেন : 'কোনো কোনো স্বপ্ন ফের ফিনিক্সের মতো/ জন্মান্তরলোভী'।

১২. 'ভূমিকা', *সমর সেনের নির্বাচিত কবিতা*, (সৈয়দ, ১৯৮৯)। শামসুর রাহমান নিজেও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সমন্বয়-প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন, *কালের ধুলোয় লেখা*তে বলেছিলেন : 'হৃদয়বত্তা এবং বুদ্ধির মিলনেই উত্তম শিল্পের জন্ম হয়' (রাহমান, ২০০৪ : ২২৩)।

১৩. 'তোমার পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতায় বলেছেন খাণ্ডবদাহন প্রসঙ্গে: 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,/ তোমাকে পাওয়ার জন্যে/ আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?/ আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?' (*বন্দি শিবির থেকে*) তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতাটি শুরু হয়েছে ইতিহাস ও পুরাণের মর্মান্তিক চেতনাকে স্পর্শ করে।

১৪. 'চক্ষুবিশেষজ্ঞ বলে দেননি' (*সৌন্দর্য আমার ঘরে*) কবিতায় 'কাবিল' প্রসঙ্গ চকিতে আরও একবার ব্যবহার করেছেন কবি।

১৫. 'আমার লড়াইয়ের রীতি/ নদীর ফেরীর মতো; ফুল আর সুরের মতো/ পবিত্র' ('অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। শামসুর রাহমান তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছিলেন 'অস্ত্রের প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি ভালো করেই জানি, আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিলেও আমি সেটি কোনও প্রাণীর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে পারব না' (রাহমান, ২০০৪ : ২১০)।

১৬. শামসুর রাহমানের কবিতায় ভারতীয় পুরাণের এই ঋষি দুর্বাসার উপস্থিতি ঘটেছে বারবার। ব্যক্তিগত অনুভূতি, সমাজ-রাষ্ট্র এমনকি প্রেমের কবিতাতেও তিনি প্রাসঙ্গিক—'অনিদ্রা' (*দুঃসময়ে মুখোমুখি*), 'বেলা পড়ে আসে' (*ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ*), কবিতাসমূহে দুর্বাসা চরিত্রের যে চিত্রায়ণ, সেখানে কবি তাঁর উষ্ণ ও উত্তপ্ত মেজাজকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৭. হাইড্রার মতো গ্রিক পুরাণের আরেক দানবী মেডুসা, গর্গন মেডুসার মুণ্ড নিয়েও পৌরাণিক আখ্যান প্রচলিত রয়েছে, শামসুর রাহমান 'উন্মত্ততা বয়স্য আমার' (*আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*) কবিতায় মেডুসা-পুরাণ ব্যবহার করে বলেছেন : 'মেডুসার মুণ্ড চতুর্ধারে নেচে ওঠে বারংবার।'

১৮. খ্রিস্টান বাইবেলের মাতা মেরি পশ্চিম এশীয় পুরাণ-ঐতিহ্যের বিবি মরিয়ম, যিনি ঈসা নবীর জন্মদাত্রী। 'মা তার ছেলের প্রতি' (*অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*) শিরোনামের আত্মজৈবনিক কবিতায় বিবি মরিয়মের ভূমিকায় কবি-মাতা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর বয়ানে নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণ কবিতাটি।

১৯. প্রমিথিউস শামসুর রাহমানের আরও অনেক কবিতায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন, 'তোমাদের মুখ' কবিতায় প্রমিথিউস কবির স্বদেশের শৃঙ্খলিত রূপের প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন : 'বাংলাদেশ প্রমিথিউসের চোখের মতো/ ঝরিয়েছে আগুন' (*হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)। মানবতার জন্য সহমর্মী প্রমিথিউসের বন্দিদশার প্রসঙ্গ এসছে 'বিষাদ আমার পাশে নেই' কবিতায় : 'শেকলে সম্প্রতি বন্দি নতুন প্রমিথিউস' (*রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*)। এছাড়া প্রমিথিউস প্রসঙ্গ পাওয়া যায় 'বাকবাকুম বাকবাকুম', (*নায়কের ছায়া*), 'আমার একজন প্রতিবেশি' (আমার কোনো তাড়া নেই), 'কিছু সামাজিক কিছু বিদগ্ধ', (যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে), 'সারা জীবনই গোধূলি-আকাশ' (*মেঘলোকে মনোজ নিবাস*), 'সোনার মূর্তির কাহিনী' (*শিরোনাম মনে পড়ে না*) কবিতাসমূহে।

২০. পুঁজিবাদের দাপট চিত্রায়িত হয়েছে 'ভালোবাসা তুমি' শিরোনামের কবিতায় : 'সমৃদ্ধির মায়মারীচের/ সংজ্ঞা হরণ দারুণ আকর্ষণে/ ধনিক যুগের গোধূলিতে ভাসি,/ যূথছুট ম্লান, নরমুণ্ডের বনে' (*নিরালোকে দিব্যরথ*)।

২১. পৌরাণিক অভিজ্ঞান থেকে আহরিত 'অর্ধপশু অর্ধমানব' চেতনানুষঙ্গটি 'শব্দ' (*হরিণের হাড়*), 'তবু মানব' (*সৌন্দর্য আমার ঘরে*) কবিতায় ব্যবহার করেছেন শামসুর রাহমান।

২২. 'যুবরাজ' 'শাহজাদি' 'ঘুটে কুঁড়ানি' ('ওই মৌন আকাশের', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*), 'পাষাণপুরীর রাজকন্যা' ('হরতাল', *নিজ বাসভূমে*), 'তেপান্তর', 'পক্ষীরাজ' ('বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*), 'দানো', 'লালকমল-নীলকমল' ('স্মৃতিতে ধারণযোগ্য কিছু নয়', হোমারের স্বপ্নময় হাত), 'রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী' ('তোমার ঘুম', *অবিরল জলভ্রমি*), 'পরীগ্রস্ত, 'একা-একা সাত সওয়ালের জবাবের/ উদ্দেশে সফররত' ('সিতমের ঘরে', *ধ্বংসের কিনারে বসে*), 'ডানা-অলা ঘোড়া', 'মৎস্যকন্যা', 'পরী' ('অযৌক্তিক', *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে*), 'আরব্য রজনী' ('দুই প্রান্ত', *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি*)।

২৩. লোকপুরাণ বলতে কোন বিশেষ শ্রেণি-অবস্থানকে নির্দেশ করা হয়নি, পুরাণের প্রকৃতিকে চিহ্নিত করার সুবিধার্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

২৪. 'বস্তুত সত্তার মৌন তটে/ অপরূপ সখ্যে জেগে ওঠে দুলিয়ে চিত্রিত মাথা/ মনসার গৌরবের মতো এক অনার্য সভ্যতা' ('এক দশক পরে', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)।

২৫. 'বিরোধী কালের জতুগৃহে করে বাস/ সত্তা আমার ভস্মে গিয়েছে ঢেকে;' ('প্রলয়ান্তে, *আমার কোনো তাড়া নেই*)। এ কবিতায় 'জতুগৃহ' বিরূপ কালের প্রতিনিধি, অন্যদিকে 'গৃহদাহ' (*দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*) কবিতায় 'জতুগৃহ' শব্দটি এসেছে প্রেমের অনুষঙ্গে।

২৬. 'প্রতীক কখনো অভিজ্ঞতা অর্জন করায় না, ইঙ্গিত করে মাত্র' (ইলিয়াস, ২০০৭ : ১০১)।

২৭. গ্রিক পুরাণের দেবীদের মধ্যে আফ্রোদিতির প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন। 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি', ও 'রেস্তোরার একটি টেবিলে' (*বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*), 'জাতিসংঘে অবিরল তুষার ঝরলে' (*উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*) কবিতায় আফ্রোদিতির প্রসঙ্গ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য গ্রিক দেবী – প্রসার্পিনা ('অমাবস্যার চাঁদ', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*), ভেনাস ('সিঁড়িতে ভীষণ ভিড়, *নায়কের ছায়া*, 'কবির ডায়েরি', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*) ও আর্টেমিসের ('তবু হয়, এরকম হয়', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*) পুরাণ-আখ্যান ব্যবহৃত হয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতায়।

২৮. 'আমি জীবনবাদী মানুষ' (রাহমান, ২০০৪ : ২৪৬)।

২৯. নগর পুলিশকে অর্ফিয়ুসের সমান্তরালে রেখে প্রতিমা নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায় 'পারিপার্শ্বিকের আড়ালে' কবিতায়: 'এবং টহলদার পুলিশ কখন অর্ফিয়ুস বনে যায় চমৎকার।'

৩০. *এক ধরনের অহংকার কাব্যে* তিনি বলেছিলেন: 'এবং নতুন জীবন ওঠে নেচে বাঁশি হাতে ভস্মের আড়াল থেকে/ নতুন গোলাপ নিয়ে যেন অর্ফিয়ুস' (যেন অর্ফিয়ুস)।

৩১. ভারতীয় পুরাণের কৃষ্ণের বাঁশি প্রেম ও পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যে ইস্রাফিলের বাঁশি ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে এসেছে।

৩২. 'শোকাহত বাল্মীকির চোখের মতো' ('কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*)।

৩৩. 'যে বছর কুরবানীর ঈদে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রথম উট আসে বাঙলাদেশে, সে-বছরই ঐ বইয়ের কবিতাগুলো লিখেছিলাম আমি। আশির দশকের কথা। কিছু ধর্মান্ধ মানুষকে খুব শ্রদ্ধাভরে ঐসব উটের প্রস্রাব পান করতে দেখেছিলাম, এরই নাম ধর্মান্ধতা' (শাহরিয়ার, ২০১১ : ১০৬)।

৩৪. এ কবিতায় বিশেষ করে চাঁদের রুটি-রুজির ওপরে আঘাত যেন নির্দেশ করে শামসুর রাহমানের সে সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার অসহায়ত্ব, এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : 'এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের চরম ক্ষণে ১৯৮৭ সালে দৈনিক বাংলার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করার পরে তিন বছর আমি বেকার ছিলাম।...এরশাদ যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন, তখন আমি পদত্যাগপত্র দাখিল করলাম। এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ ছিল না, কেননা এদেশে বেকারত্বের অভিশাপ যে কী, তা আমি জানতাম' (আলী, ২০০৬ : ১৩১)।

৩৫. 'শেখ মুজিবুর যখন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাননি, তখনই সম্ভবত ১৯৬৬ কিংবা ১৯৬৭ সালে তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লিখি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে। কবিতাটির নাম 'টেলেমেকাস' (রাহমান, ২০০৪ : ২২২)।

৩৬. 'যার মাথায় ইতিহাসের জ্যোতিবলয়' (*হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*) কবিতায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছেন কারবালার যুদ্ধকে। ফোরাত নদীর কূলের সেই হত্যাকাণ্ড, ইমাম হোসেনের অসহায়ত্ব, সীমারের সীমাহীন নির্দয়তার সঙ্গে পঁচাত্তরের নির্মমতার সংযোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কবি জাতির পিতাকে হারানোর পর দেখেন : 'বাংলাদেশ ধারণ করল মহররমের সিয়া বেশ'।

৩৭. সার্সির জাদুতে মানুষ পরিণত হতো নানা জীবজন্তুতে। ওডিসিউস ঈয়া দ্বীপে সার্সির জাদুর প্রভাব এড়াতে সক্ষম হন দেবতা হার্মিসের সহায়তায়। সার্সির সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন ওডিসিউস, তার ঔরসে, সার্সির গর্ভে টেলেগোনাস নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

৩৮. 'আমার কবিতা গণঅভ্যুত্থানের চূড়ায় নূহের/ দীপ্তিমান জলযান' ('শুচি হয়', *মঞ্চের মাঝখানে*)।

৩৯. শৈশবে স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রথম তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন 'রক্তাক্ত দুলদুলে'র চিত্র দেখে, দুলদুল ছিল ইমাম হোসেনের ঘোড়া। 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের কল্যাণে তিনি ইমাম হোসেন এবং মহররমের কাহিনি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, স্কুলের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে তিনি চার আনা দিয়ে তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত দুলদুলের ছবিটি কিনেছিলেন পুরনো ঢাকার বাবুর বাজারের একটি ছবির দোকান থেকে।

৪০. ক. 'অপ্সরার ভুরুর মতো চাঁদ/ আমার বড় দরকার' ('এই আমার সাধনা', *হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল*)।

খ. 'দেবদূতী মুখ নিয়ে চাঁদ/ উঁকি দেয় জানালায়' ('নিভৃতে আমার অগোচরে', *গৃহযুদ্ধের আগে*)।

৪১. 'কবির নির্বাসন' (*অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*) এবং 'দরজার কাছে' কবিতায় (*ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*) লঙ্কাকাণ্ড প্রসঙ্গ এসেছে।

# উপসংহার

পরমার্থের প্রতি অনাস্থা, পারলৌকিকতায় অবিশ্বাস, পার্থিবতাকে অবিচলিত চিত্তে ধ্রুব জ্ঞান—এসব অনুষঙ্গ আধুনিক কবিতার বেদনানিঃস্ব, যুগসচেতন, নৈঃসঙ্গ্যঘন জীবনবোধকে নিবিড় করে তুলেছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ, পরলোকে বা জন্মান্তরে প্রাপ্য পুরস্কারের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে বস্তুগজগৎ তীব্রতম রূপ নিয়ে বিকশিত হয়েছে আধুনিক কবির চৈতন্যে, আধুনিক কবিতায়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত মানবতা আঙুল তুলে নির্দেশ করেছে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব অথবা নিষ্ক্রিয়তা, এ দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বকবিতাজাত হলেও নিষ্ঠা ও সাধনার ফলে অর্জিত নিজস্বতাও মিশে গিয়েছিল বাঙালি কবিদের মনন-চৈতন্যে। ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থাকে ধারণ করে তিরিশের আধুনিক বাঙালি কবিরা শুধু রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-শাসিত চৈতন্য বলয়কে ভাঙলেন তাই নয়, সম্ভব হলো যন্ত্রণাকাতর, সমকালশাসিত জীবনবোধের সঙ্গে সংযুক্তি। প্রচলিত মূল্যবোধে অবিশ্বাসজাত যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য যেমন ছিল, তেমনি বিজ্ঞানের শিখরস্পর্শী সাফল্য, সমাজ-কাঠামো পরিবর্তন ও শ্রেণিবৈষম্য নিরসনে মার্কস-লেনিনের যুগান্তকারী তত্ত্ব, মানুষের মনোজগৎ ও তার প্রবৃত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণবাদ—প্রভৃতি তত্ত্ব ও অনুষঙ্গের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপট। আধুনিক কবিতার চারিত্র্য সংগঠনে এসব তত্ত্ব-উপাত্ত কম-বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। আধুনিকতা স্বয়ম্ভূ নয়, ক্রমশ সম্প্রসারণের ভেতর দিয়ে কাল অতিক্রান্ত হয়, বিভিন্ন কালের ভেতরে সক্রিয় থাকে বিভিন্ন রকমের অনু সংঘটক, এই অনু সংঘটকসমূহ খণ্ড খণ্ড কালকে সংযুক্ত করে অবিচ্ছিন্ন রূপ দান করে, প্রক্রিয়াগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে চিহ্নিত হয় যুগসীমা। পুরোনো কালের গর্ভ থেকে, একই উপকরণের নবায়নের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে নতুন কাল, যার চারিত্র্য পুরোনো কালের চেয়ে আলাদা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরোনো ভিত্তিমূলের ওপর গড়ে উঠেছে আধুনিক যুগের মনন-চৈতন্যের ইমারত, যেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতির যোগ তাকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। দেশ-কাল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন ও ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগতের ক্রম-রূপান্তরশীল অবস্থার অভিজ্ঞান-স্নাত আধুনিক কবির সত্তা। ফলে, আত্ম-উন্মোচনে তাঁরা উদার-অকপট, জীবন-যৌনতা-প্রেমের ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত। তাঁরা সৌন্দর্য ও কল্যাণ-প্রত্যাশী, তবে অসুন্দর ও অকল্যাণকেও জীবনের অংশ হিসেবে স্বীকার করা এবং কবিতায় তার উপস্থাপন আধুনিক কবির সংকল্প, এই সংকল্প তাঁদের দেখিয়েছিল স্বতন্ত্র পথের আলো।

তিরিশের কবিতার লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রপ্রভাবের গহ্বর থেকে নিজের অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখা, নতুনতর কাব্যপথ নির্মাণের ভেতর দিয়ে টিকে থাকা, রবীন্দ্র-বিরোধিতা ব্যতীত তিরিশের কবিতা আর কোন বিষয়ে একাত্ম নয়, স্বতন্ত্র মত-পথ, ভাব-রূপ ও আদর্শ নিয়ে বিকশিত এ ধারা।

তিরিশের আধুনিক কবিতাধারার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিতাধারা, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কবিরা পূর্বানুবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন নির্দ্বিধায়, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সূত্রে। তিরিশের কাব্যপ্রবণতার সঙ্গে সমাজ-সচেতনতা, যুগযন্ত্রণাকে অতিক্রমের আশাবাদী চেতনাকে তাঁরা নতুন করে সংযুক্ত করেছে কবিতাধারায়, পঞ্চাশের কবিরা তিরিশ ও চল্লিশের দশকের অনুগামী হয়েও রেখেছেন নতুন নির্মাণের সম্ভাবনা। সমকালের ভাষা-সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার প্রশ্নে সৃষ্ট কালিক অস্থিরতা তাঁদের দিয়েছিল নতুন পথ-নির্মাণের প্রেরণা, অন্ধ অনুকরণের অনিবার্য সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেশবিভাগোত্তর বাংলা কবিতা এক উজ্জ্বল ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল। শামসুর রাহমান কবিতার এই কালপর্বে আত্মপ্রকাশ করেন পূর্বজ রোমান্টিক চেতনার পুনরাবর্তন চৈতন্যে ধারণ করে। চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর সমকালের আঘাতে তাঁর চৈতন্য নিজস্বতা নিয়ে নতুন আলোকদীপ্ত পথের সন্ধান পেয়েছিল, যেখানে তাঁর পাথেয় হয়েছিল স্বদেশ ও পুরাণ।

শামসুর রাহমান ত্রিকালদর্শী কবি, অখণ্ড ভারতবর্ষ, দেশবিভাগ-পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান, এবং একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের সুবিস্তৃত কালপর্বে তাঁর জন্ম, কবিচৈতন্যের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি। দুই শতাব্দীকালকে স্পর্শ করে তিনি যাপন করেছেন ব্যক্তিজীবন, উদযাপন করেছেন কবিজীবন। শামসুর রাহমানের কবিগুরুর তালিকায় ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, তিরিশের পঞ্চপাণ্ডব এবং বিশ্বকবিতার দিকপাল এলিয়ট। ঘন ঘন কাব্যগুরু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর কাব্যাদর্শ, সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে নতুনতর পথ-নির্মাণের। শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* ছিল রোমান্টিক চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ, রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বসুর মতো তিনি বস্তু-পৃথিবীর সংক্রমণ থেকে কবিতাকে রক্ষা করেছিলেন সচেতন প্রচেষ্টায়, এই প্রচেষ্টা সক্রিয় ছিল তাঁর প্রথম চারটি কাব্যগ্রন্থে। পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ *নিজ বাসভূমে* থেকে তিনি তাঁর কাব্যাদর্শ পরিবর্তন করে স্বদেশ-সমকাল সংলগ্ন হতে শুরু করেন, এই বস্তু-পৃথিবীতে যাত্রায় তাঁর প্রধান পাথেয় হয়েছিল সমকালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। এতসব ঘটনার প্রতিঘাতে তাঁর কবিতায় এসেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, রোমান্টিক কল্পনা-বিহ্বলতা, সুদূরের স্বপ্নময় হাতছানি, আবেগের উচ্ছ্বাস পেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন স্বদেশের একনিষ্ঠ রূপকার, সেইসঙ্গে কবিতায় বিষয়-নির্মাণে তিনি হয়েছিলেন পুরাণের অনুগামী। পঞ্চাশের দশকে তাঁর সতীর্থ অনেক কবির কাব্যপ্রেরণার উৎস ছিল সমকালীন স্বদেশ, কিন্তু শামসুর রাহমানের মতো এত ব্যাপক-বিস্তৃত পরিসর নিয়ে তাঁদের কবিতায় স্বদেশভাবনা বিকশিত হয়নি।

শামসুর রাহমানের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ঢাকা শহরের নাগরিক জীবন-প্রেক্ষাপটে। নাগরিক জীবনের ভেতরে তিনি দেখেছেন স্থান-কালের প্রভাবে জীবনযাপন-পদ্ধতির ক্রমবিবর্তন, পুরনো নাগরিক জীবনের প্রতি নস্টালজিয়া ও নির্মীয়মান নতুন নাগরিক জীবনের সঙ্গে সংঘাতের সূত্রে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে কালের আবর্তন-চিত্র। পুঁজিবাদ-শাসিত যুগের ভেতরে যন্ত্রসভ্যতা ও পণ্যের দাপট তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে অনেক সময় কবিতায় উঠে এসেছে এদেশের অধিকার-বঞ্চিত মানুষের কথা, স্বপ্ন দেখেছেন বৈষম্য-বঞ্চনাহীন সমাজের। শামসুর রাহমান কোন রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না, তিনি মানসিকভাবে সমর্থন করেছে সেইসব দল-মতকে যারা দেশের কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত। নগরে বসবাস এবং নাগরিক জীবনবোধ প্রকাশের সূত্রে শামসুর রাহমানকে 'নাগরিক কবি' অভিধা প্রদান করা হলেও তিনি পৈতৃকগ্রাম পাড়াতলীর সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে বাঁধা ছিলেন। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবি পাড়াতলীর প্রতি আমৃত্যু অনুভব করেছেন পিছুটান।

শামসুর রাহমান আদর্শগতভাবে মানবতাবাদী কবি, স্বদেশের যে কোন বিপর্যয়ে আক্রান্ত-মানবতার নিরাময়-অভিপ্রায়ে তিনি কলম তুলে নিয়েছেন অস্ত্রের মতো। তিনি কলমের শক্তিতে একাত্তরে সম্মুখ সমরে অংশ না নিয়েও ছিলেন শব্দসৈনিক কবি, তাঁর কলমের মুখে উঠে আসা যুদ্ধকালের অভিজ্ঞতাকে তিনি ক্লান্তিহীনভাবে কবিতায় শিল্পিত করে গেছেন। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে স্বদেশে গণতন্ত্রের পতন, স্বৈরতন্ত্রের উত্থান—কবির কলমকে সক্রিয় রেখেছে। তিনি গোলাপ ও ফণিমনসা, কাক ও কোকিল, আলো ও অন্ধকারের প্রতীকে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন শুভ ও অশুভ শক্তিকে। অশুভের তৎপরতা প্রতিনিয়ত শুভচৈতন্য বিনাশে প্রবলভাবে তৎপর হলেও তিনি শেষাবধি আশাবাদী কবি, দুঃসময়ের অতলে বাস করেও দেখেছেন শুভ শক্তির বিজয়-স্বপ্ন, সেই বিজয়গাথা কবিতার উজ্জ্বল রূপ নিয়ে নির্মিত হয়েছে।

স্বদেশভাবনাকে একনিষ্ঠভাবে যেমন তিনি কবিতায় রূপান্তর করেছেন, একইভাবে পুরাণ-অভিজ্ঞান ব্যবহার করে নির্মাণ করেছেন উজ্জ্বল কবিতা। বিষয় নির্মাণে ও আঙ্গিক বিবর্ধনে তিনি পুরাণের অনুগামী হয়েছেন। তাঁর পৌরাণিক জগতে বিচরণের পরিধি ব্যাপক, তাঁর কবিতা গ্রিক পুরাণ, ভারতীয় পুরাণ, বৌদ্ধ পুরাণ, পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য এবং রূপকথা-কিংবদন্তির বর্ণচ্ছটায় আলোকিত। শামসুর রাহমানের কবিতায় ব্যক্তি ও সমষ্টির মিথস্ক্রিয়ার ভেতরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে পুরাণ। সমকালের অস্থির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিসত্তার সংকটকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, এইসব সংকটের স্বরূপ রূপায়ণে তিনি পুরাণ-ঐতিহ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন ব্যক্তিচরিত্র, অনেক সময় পুরাণ

ব্যক্তিচরিত্রের সংকটকে অতিক্রম করে সংলগ্ন হয়েছে জাতীয় সংকটের সঙ্গে। বক্তব্যকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠা দানের প্রয়োজনে তিনি পুরাণকে ব্যবহার করেছেন অলঙ্কাররূপে। শামসুর রাহমান দীর্ঘ সময় ধরে কবির দায় নিষ্পন্ন করেছেন কবিতাচর্চা করে, কবি হিসেবে তিনি অক্লান্ত, পরিশ্রমী। স্বদেশভাবনা ও পুরাণচেতনা কখনো আলাদাভাবে কখনও সম্পূরক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক নির্মাণ-প্রক্রিয়াকে দান করেছে পরিপূর্ণতা। সবশেষে বলা যায়, শামসুর রাহমান তাঁর কালের অতন্দ্র প্রহরী, কাল-সচেতনতা গুণে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে স্বদেশ ও পুরাণের নানা অনুষঙ্গ, তিনি সমকালের সঙ্গে পুরোনো কালের সংযোগ ঘটিয়ে ফুটিয়েছেন কবিতার সজীব কুসুম বাংলা কাব্যের প্রান্তরে।

# গ্রন্থপঞ্জি

## মূল-গ্রন্থ


শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র-১ (২০০৫)। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র-২ (২০০৬)। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র-৩ (২০০৭)। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র-৪ (২০০৭)। অনন্যা, ঢাকা।


## সহায়ক-গ্রন্থ


অমিয়কুমার বাগচী (১৯৮৮)। *অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা*, সম্পাদক পুলক চন্দ, কলকাতা।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) (২০১১)। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১)

অশোককুমার মিশ্র (২০০২)। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০৮), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৬)। *বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৬।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) (১৯৮৯)। *সমর সেনের নির্বাচিত কবিতা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০০১)। *আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম*, ভাষাচিত্র, ঢাকা।

আবদুল হাকিম (১৯৮৯)। *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, সম্পাদক : ডক্টর রাজিয়া সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা।

আহসান হাবীব (২০০৭)। *কবিতাসমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা।

ঈশ্বর গুপ্ত (১৯৬৯)। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ, সম্পাদক : মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৬৬)। *নজরুল রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, সম্পাদক আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (অনূদিত) (২০০৭)। *জোসেফ ক্যাম্পবেল : মিথের শক্তি (বিল ময়ার্সের সঙ্গে কথোপকথন)*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০১০)। *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা, ঢাকা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০১৪)। *শামসুর রাহমান ও বঙ্গবন্ধু*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৪)। কবিতাসমগ্র, অবসর, ঢাকা।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (২০১৩)। *শহীদ কাদরী : লেখা না লেখার গল্প*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

দীপ্তি ত্রিপাঠি (১৯৫৮)। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নীরুকুমার চাকমা (২০০৭)। *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা।

ফররুখ আহমেদ (২০০৯)। *কবিতাসমগ্র*, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদনা), অনন্যা, ঢাকা।

ফরহাদ খান (১৯৮৪)। *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা।

বার্ণিক রায় (১৯৯৪)। *কবিতায় মিথ*, পুস্তকবিপণি (২য় সংস্করণ), কলকাতা।

বিষ্ণু দে (১৯৮৯)। *বিষ্ণু দে কবিতাসমগ্র-১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭)। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু (২০০৩)। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, আজকাল, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮২)। *প্রবন্ধ সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু (২০১৫)। *সাহিত্যচর্চা*, মাটিগন্ধা (পরিবেশক বিভাস), ঢাকা।

বেগম আক্তার কামাল (১৯৯২)। *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*,

বেগম আক্তার কামাল, (১৯৯৯)। *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খণ্ড*, সুবর্ণ, ঢাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯৯৫)। *মধুসূদন কাব্যসমগ্র*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), বালাা একাডেমি, ঢাকা।

মাহবুব সাদিক (১৯৯৩)। *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত (১৯৯৩)। *আবহমান বাংলা*, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৩)। *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ২, পূর্বোক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ৩, পূর্বোক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ৪, পূর্বোক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ৬, পূর্বোক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র*, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত

শহীদ ইকবাল (২০০৮)। *বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা*, চিহ্ন, রাজশাহী।

শামসুর রাহমান (২০০২)। কবিতা এক ধরনের আশ্রয়, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৪)। *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান (সম্পাদিত) (২০০৪)। শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শিশির কর (১৯৮৩)। *নিষিদ্ধ নজরুল*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সমর সেন (১৯৭৮)। *বাবু বৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সমর সেন (১৩৭৬)। *সমর সেনের কবিতা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১)। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, সম্পাদনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৬২)। *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (২০০২)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

সুধীরচন্দ্র সরকার (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)। *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯৬)। *আধুনিক কবিতার চালচিত্র*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

সুহৃদ শহীদুল্লাহ (অনুবাদক) (২০১১)। তরুণ কবির প্রতি চিঠি, (মূল : রাইনার মারিয়া রিলকে) শিরদাঁড়া, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (২০০০)। আধুনিক কবি ও কবিতা, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

হুমায়ূন আজাদ (১৯৮৩)। শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Edith Hamilton, (1953)। *Mythology,* The new American Library, New York।

Manju Jain (1991) *A Critical Reading of the Selected Poems of T.S. Eliot,* Oxford Univesity Press.

T. S. Eliot (1969). *The Complete Poems and Plays,* Faber and Faber Limited, London.

## প্রবন্ধপঞ্জি

অনু হোসেন (২০১০)। 'বাংলাদেশের কবিতার নির্মিতি : রূপ ও রূপান্তর' *নান্দীপাঠ*, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত, সংখ্যা : চার।

অমিয়কুমার বাগচী (১৯৮৮)। 'সমর সেন ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সমস্যা', *অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা* (১৯৮৮), সম্পাদক পুলক চন্দ, কলকাতা।

আবুল আহসান চৌধুরী (২০১০)। 'শামসুর রাহমান : অন্তরঙ্গ আলাপ', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

আবু বকর সিদ্দিক (২০১০)। 'শামসুর রাহমানের মুখোমুখি', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১১)। 'প্রশ্নশীল শামসুর রাহমান', *আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম*, ভাষাচিত্র, ঢাকা।

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১১)। 'কাশশাদা চুলে তার শতাব্দীর ভ্রমণকাহিনী', *আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম*, পূর্বোক্ত।

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১১)। 'শামসুর রাহমানের সঙ্গে কথোপকথন' *আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম*, পূর্বোক্ত।

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১১)। 'চায়ে-চায়ে আলাপচারিতা', *আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম*, পূর্বোক্ত।

আবুল হোসেন (২০১০)। 'কিছু স্মৃতি অল্প কথা', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

এস এম আলী (২০০৬)। 'শামসুর রাহমানের সঙ্গে কথোপকথন', *কালি ও কলম*, শামসুর রাহমান স্মরণ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ : নবম সংখ্যা, অক্টোবর, ঢাকা।

কায়সুল হক (২০০৬)। 'শামসুর রাহমান : কবিতার দিকে, জীবনের দিকে', *কালি ও কলম* পূর্বোক্ত।

জাকারিয়া শিরাজী (২০১০)। 'শামসুর রাহমানের কবিতায় নগর-চেতনা', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০১৪)। 'শামসুর রাহমান : জীবন ও কবিতা', *শামসুর রাহমান ও বন্ধুত্ব*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (২০১৩)। 'কবির মুখোমুখি', *শহীদ কাদরী : লেখা না লেখার গল্প*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

তারেক রেজা (২০১০)। 'শামসুর রাহমানের কবিতা : প্রসঙ্গ পুরাণ', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮২)। 'নজরুল', *প্রবন্ধ সংকলন*, পূর্বোক্ত।

ভূঁইয়া ইকবাল (২০১০)। 'কবিস্মৃতি', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

মাহবুব সাদিক (১৯৯৩)। 'মিথ-ঐতিহ্যচেতনা এবং নজরুলের কবিতা', *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পূর্বোক্ত।

মাহবুব সাদিক (১৯৯৩)। 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা : প্রসঙ্গ পুরাণ', *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পূর্বোক্ত।

মাহবুব সাদিক (২০০৬)। 'শামসুর রাহমানের কবিতা : প্রসঙ্গ পুরাণ', *কালি ও কলম*, পূর্বোক্ত।

মুর্তজা বশীর (২০০৬)। 'ব্যক্তিগত দর্পণে শামসুর রাহমান', *কালি ও কলম*, পূর্বোক্ত।

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। 'কবিতার নতুন মানচিত্র : বাংলাদেশের কবিতার পটভূমি', *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পূর্বোক্ত।

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। 'আহসান হাবীব', *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, পূর্বোক্ত।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৬)। 'রাহমানের মাইকেল-নজরুল ও রবীন্দ্র ঠাকুর', *কালি ও কলম*, শামসুর রাহমান স্মরণ সংখ্যা, সম্পাদক আবুল হাসনাত, ঢাকা।

বেগম আক্তার কামাল (১৯৯৯)। 'কবির চেতনায় মিথ', *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। 'ইকারুসের আকাশ : কবির ডানা', *শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মাহবুব সাদিক (২০০৬)। 'শামসুর রাহমানের কবিতা : প্রসঙ্গ পুরাণ', *কালি ও কলম*, পূর্বোক্ত।

মিনার মনসুর (১৯৯৩)। 'বাংলাদেশ (১৯৪৭-৮২) : সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি', *আবহমান বাংলা*, সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ঢাকা।

শহীদ ইকবাল (২০০৮)। 'আহসান হাবীবের কবিতা : রক্তবীজের বংশধর', *বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা*, পূর্বোক্ত।

শহীদ ইকবাল (২০০৮)। 'শামসুর রাহমান : কাব্যপাঠের সূত্র', *বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা*, চিহ্ন, রাজশাহী।

শহীদ ইকবাল (২০১০)। 'শামসুর রাহমানের কবিতায় নগর-চেতনা', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

শহীদ কাদরী (২০১০)। 'শামসুর রাহমান : শিল্পে শহীদ', *কালি ও কলম*, পূর্বোক্ত।

শামসুর রাহমান (২০০২)। কবিতায় সমাজচিন্তা ও কাব্য-ভাবনা', *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়*, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০২)। 'তাঁদের অবদানের অসম্মান যেন না করি', *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়*, পূর্বোক্ত।

শামসুর রাহমান (২০০২)। 'প্রেম এবং কবিতা', *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়*, পূর্বোক্ত।

শামসুর রাহমান (২০০২)। 'বিদেশে কয়েকটি দিন এবং কবিতাস্মৃতি', *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়*, পূর্বোক্ত।

শামসুর রাহমান (২০০২)। 'এলোমেলো কিছু স্মৃতি এবং কবিতাস্মৃতি', *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়*, পূর্বোক্ত।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১)। 'ভাষায় মুদ্রা—আধুনিক কাব্য', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, সম্পাদনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যো, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৭)। 'একাত্তরের যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের পরীক্ষা', *নান্দীপাঠ*, সম্পাদক সাজ্জাদ আরেফিন, সংখ্যা : সাত, অক্টোবর, ঢাকা।

সুমন সাজ্জাদ (২০১০)। 'রাজসিক কবিত্বের একটি পাঠ', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

সুরেশ রঞ্জন বসাক (২০০৬)। ঔপনিবেশিকতার বৃত্তায়ন ও কবির কথকতা : পরিপ্রেক্ষিত শামসুর রাহমান, *কালি ও কলম*, পূর্বোক্ত।

সৈয়দ শামসুল হক (২০০০)। 'একুশের বক্তৃতা', *একুশের প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ূন আজাদ (১৯৮৩)। 'দু-চোখে দুর্গম শিখর : সমকালের সভাকবি', *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

## পত্র-পত্রিকা ও সাক্ষাৎকার

*অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা* (১৯৮৮)। সম্পাদক পুলক চন্দ, কলকাতা।

আবুবকর সিদ্দিক (২০১০)। 'শামসুর রাহমানের মুখোমুখি', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

আবুল আহসান চৌধুরী (২০১০)। 'শামসুর রাহমান : অন্তরঙ্গ আলাপ', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত।

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১১)। 'শামসুর রাহমানের সঙ্গে কথোপকথন', *আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম*, পূর্বোক্ত।

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১১)। 'চায়ে-চায়ে আলাপচারিতা' *আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম*, পূর্বোক্ত।

*একুশের প্রবন্ধ* (২০০০), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

*কালি ও কলম* (২০০৬)। সম্পাদক আবুল হাসনাত, শামসুর রাহমান স্মরণ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ : নবম সংখ্যা, অক্টোবর, ঢাকা।

*নান্দীপাঠ* (২০১০)। সম্পাদক সাজ্জাদ আরেফিন, সংখ্যা : চার, ঢাকা।

নান্দীপাঠ (২০১৭)। সম্পাদক সাজ্জাদ আরেফিন, সংখ্যা : সাত, ঢাকা।

*নৃ* (১৯৯২)। সম্পাদক নূরুল আলম আতিক, ২য় সংকলন, মিথ সংখ্যা, মে, ঢাকা।

*শালুক* (২০১১)। সম্পাদক ওবায়েদ আকাশ, বর্ষ ১২, সংখ্যা ১৩, ফেব্রুয়ারি, ঢাকা।